অরণ্য পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী

সুবোধকুমার চক্রবর্তী



এ, মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

RAMYANI BEEKSHYA
Aranya Parva
(A Bengali Travelogue)
By Subodh Kumar Chakravarti

প্রকাশক :
রাজীব নিয়োগী
এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

তৃতীয় সংস্করণ :
আশ্বিন ১৩৬৭

দিল্লী অফিস
কমিউনিকেশন সেন্টার
এম-৭০ গ্রেটার কৈলাশ ২
কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
নিউ দিল্লী ১১০ ০৪৮

মুদ্রাকর :
হরাইজন প্রিন্টার্স
১৪৮৬ পতৌদি হাউস
দরিয়াগঞ্জ, নিউ দিল্লী

আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাম্।
প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানিমশংসিষম্॥

ঋগ্বেদ ১০।১৪৬।৬

মৃগনাভির ন্যায় কত সৌরভ অরণ্যানীর,
কৃষক নেই, তবু আছে আহার্য।
অরণ্য বুঝি হরিণের জননী,
এই ভাবেই আমি বর্ণনা করি অরণ্যের।

উৎসর্গ

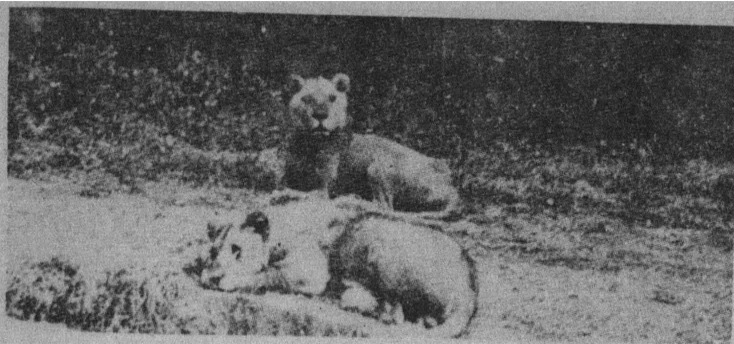
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

শ্রদ্ধাস্পদেষু



নীলগিরি পাহাড়ের টোডা গ্রামে

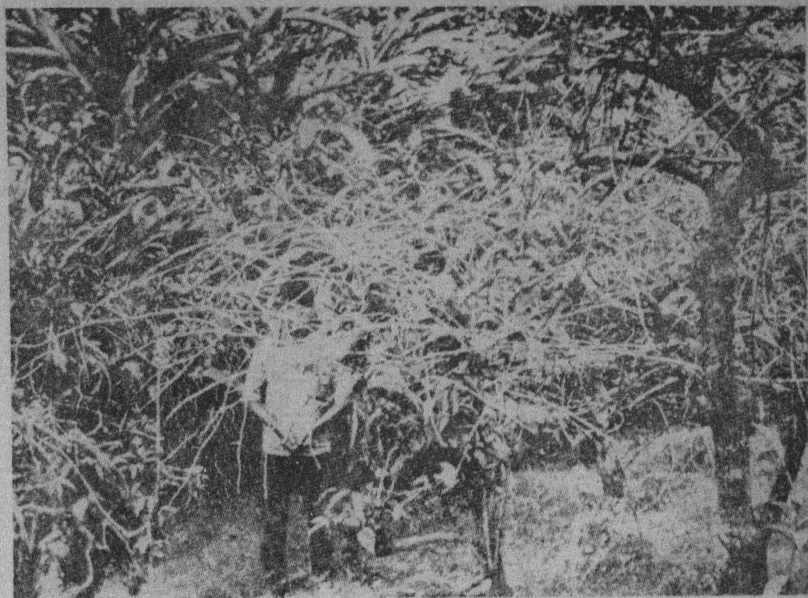




সিংহ



গণ্ডার



কুর্গের এলাচ ও কফির বাগানে





১

মানুষের জীবন যে কত বিচিত্র, ঘরের বাহিরে না বেরোলে তা বোঝা যায় না। ঘরে যা নিতান্ত অবাস্তব বলে মনে হয়, বাহিরে তা বাস্তবে পরিণত হতে সামান্যই সময় লাগে। বাড়ি ফিরে সেই ঘটনাকেই আবার অবাস্তব মনে হয়। কী করে এমন সম্ভব হয়, সেই কথা ভেবেই আশ্চর্য হতে হয় অনেক দিন।

সোমান্নাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঠিক এই রকমেরই একটি ঘটনা। একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তারপরে যখন পরিচয় হল, তখন এত অল্প সময়ে এমন অবিশ্বাস্য রকম অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল যে নিজেই সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হলুম।

বোধহয় এই রকমই হয়। ঘরের চারটি দেওয়ালই পৃথিবীটাকে ছোট করে রাখে, সঙ্কীর্ণ করে তোলে মানুষের মন। আমাদের বিশ্বাসের গণ্ডি আকাশের দিগন্ত থেকে ঘরের জানালায় টেনে এনে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু ঘরের বাহিরে পা দিলে এই সংস্কার থেকে মুক্ত হয়েই বন্দী মন পাখা মেলে ওড়ে অসীম আকাশে। মুহূর্তের মধ্যে খুঁজে বার করে এই রকমের আরও অনেক মানুষ, যারা প্রতিদিনের বন্ধন থেকে সাময়িক ভাবে মুক্তি লাভ করে সেই আনন্দে মশগুল হয়ে আছে।

মিস্টার ও মিসেস সোমান্নাকে দেখে আমার এই কথাই মনে হয়েছিল। তাঁরাও বোধহয় সংসারের ঘানি থেকে দিন কয়েকের জন্যে মুক্তি পেয়ে আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। তাই আমাকে গ্রহণ করলেন অনেক দিনের পরিচিত বন্ধুর মতো। আমাদের পরিচয় যে মাত্র কয়েক ঘণ্টার, তা বোঝবার আর উপায় রইল না।

দক্ষিণ ভারতে আমি এসেছিলুম কাজে। এবারে একাই

এসেছিলুম। ভেবেছিলুম যে হপ্তাখানেক সময় লাগবে। তাই ম্যাড্রাস থেকে ফেরার ব্যবস্থা করেছিলুম সেই হিসেবে। কিন্তু দুদিনেই যে কাজ মিটে যাবে তা ভাবতে পারি নি। তাই কয়েকটা দিন আমাকে এই অঞ্চলেই কাটিয়ে যেতে হবে।

গরমে পাহাড়ের কথা মনে পড়েছিল। প্রথমেই কোডাইকানাল পাহাড়ের কথা মনে এসেছিল। কখনও যাই নি সেই পাহাড়ে, তার আকর্ষণের কথাও ভাল জানি না। কিন্তু যেতে হয় ঘোরা পথে, আর অনেকটা পথ বাসে যেতে হয়।

এর পরেই মনে হয়েছিল উটির কথা। পাহাড়ের রানী উটি, এই রকমেরই একটা কথা প্রচলিত আছে বলে শুনেছি। কিন্তু সেবারে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছিল অন্য রকম। কিছুই ভাল করে দেখতে পাই নি বলে মনে খানিকটা দুঃখ আছে এখনও। তাই ভাবলুম যে দিন কয়েক উটিতেই কাটিয়ে যাই। উটির রূপও দেখা হবে, বিশ্রামও হবে কয়েকদিন।

উটি বা উটাকামণ্ডকে আজকাল আর উটি বলে না, বলে উতগমণ্ডলম। সাহেবদের দেওয়া পুরনো নাম একে একে বর্জন করা হচ্ছে। কলকাতায় পথঘাটের পুরনো নামগুলো যেমন রাতারাতি পাল্টে যাচ্ছে, তেমনি ভারতের অনেক পুরনো শহরের নামই পাল্টে গেছে। দেশী নাম রাখবার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে সর্বত্র। কতক নতুন নাম বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু কতক নাম দেখে বেশ ধাঁধায় পড়তে হয়। পুনাকে পুনে বললে বুঝি, কিন্তু বরোদাকে ভাদোদরা বললে বুঝি না। এই জন্যেই উতগমণ্ডলমের বদলে উটি নাম আরও কিছুদিন বলব।

মেট্টুপলাইয়াম জংশন থেকে আমি উটির ট্রেন ধরেছিলুম। দার্জিলিঙে যাবার জন্যে যেমন দার্জিলিঙ-হিমালয়ান রেলওয়ে, এখানে তেমনি নীলগিরি রেলওয়ে। ছোট ট্রেন, পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে উপরে ওঠে। পথ ত্রিশ মাইলেরও কম। ম্যাড্রাস থেকে মেট্টু-

পলাইয়ামে নীলগিরি এক্সপ্রেস আসে সকাল আটটার পরে, এবং কোচিন থেকে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার আসে তার আগে। মেট্টুপলাইয়াম থেকে উটির ট্রেন দুখানা—একখানা কোচিনের যাত্রীদের জন্য, আর একখানা ম্যাড্রাস থেকে নীলগিরি এক্সপ্রেস এসে পৌঁছবার পরে ছাড়ে। মেট্টুপলাইয়াম ও উটির মাঝে আছে গোটা আষ্টেক স্টেশন। যাবার সময়ে ট্রেন সব স্টেশনেই দাঁড়ায়। এই পথের সবচেয়ে বড় স্টেশন কুন্নুর। এটি একটি শৈলাবাসও বটে। অনেকে উটির চেয়েও ভাল বলেন। একজন যাত্রী আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বিশ্রাম কবতে হলে উটির চেয়ে কুন্নুরই ভাল, কিংবা কোটাগিরি। উচ্চতায় কিছু কম হলেও আবহাওয়া ভাল। কোটাগিরিতে আরও একটা সুবিধা আছে। ডোডাবেট্টা শৃঙ্গ এই শহরটিকে আড়াল করে বেখেছে বলে বারিপাত এখানে কম।

যে ভদ্রলোক আমাকে কুন্নুরে নামবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি আমাব সঙ্গেই চলেছিলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, ভবানী সাগর দেখেছেন?

বললুম: না।

ভদ্রলোক আফসোস করে বললেন: ইস্, খুব ভুল হয়ে গেল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: ভুল আবার কিসের!

তিনি একটি ছোটখাটো নিশ্বাস ফেলে বললেন: আগে মনে পড়লে আমি আপনাকে সেখানে যাবার পরামর্শ ই দিতাম।

তাঁর কথা শুনে আমার হাসি পেল। উটির টিকিট কেটে আমি এই ট্রেনে উঠেছি, তাঁব সঙ্গে পরিচয় হয়েছে এই গাড়িতে। কাজেই তাঁর পবামর্শ নিয়ে আমাব বিশ্রামের স্থান নির্বাচনের কোন প্রশ্ন ওঠে না। তবু সৌজন্য রক্ষার জন্যে বললুম: শুনেছি, এই অঞ্চলেব একটি সুন্দর জায়গা। কিন্তু ঠিক কোথায়, তা জানি নে।

ভদ্রলোক বললেন, মেট্টুপলাইয়াম থেকে আপনি এই ট্রেনে উঠলেন তো! সেখান থেকে সড়ক পথে কুড়ি-বাইশ মাইল দূরে

বিশ্রামের জন্যে একেবারে আইডিয়াল জায়গা। উটি দেখবেন কী! সেখানে গেলে—

ভদ্রলোক থেমে গেলেন দেখে বললুম : ভবানী সাগরে থাকবার জায়গা কী রকম?

নিশ্চয়ই ভাল জায়গা আছে।

এবারে সরাসরি প্রশ্ন করলুম : আপনি কোথায় ছিলেন?

ভদ্রলোক একটু বিব্রত বোধ করে বললেন : আমি! না, আমি সেখানে যাই নি, শুনেছি আমার এক আত্মীয়ের কাছে।

আমি শুনেছিলুম যে সেখানে ভবানী নদীতে বাঁধ দিয়ে এই সাগর বা ড্যাম তৈরি হয়েছে। কিন্তু সঠিক খবর জানবার জন্যে বললুম : কী আছে সেখানে দেখবার?

ভদ্রলোক এবার কতকটা সহজ ভাবেই উত্তর দিলেন : সবই তো দেখবার! গেলেই সব দেখতে পাবেন। আর মাছ ধরার শখ থাকলে সময় কোথা দিয়ে কেটে যাবে তা টেরই পাবেন না।

আমি বুঝতে পারলুম যে ভদ্রলোককে আর কোন প্রশ্ন করা উচিত নয়। তাঁকে সত্যিই বিপদে ফেলা হবে। এও এক রকমের চরিত্র। এঁদের উপদেশ দেবার বাসনা আছে, কিন্তু অভিজ্ঞতার গণ্ডি বেশ সীমাবদ্ধ।

সকালের পরিচ্ছন্ন রোদ জানালা দিয়ে গাড়ির ভিতরে এসে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আবহাওয়ায় উত্তাপ নেই এতটুকু। তার বদলে বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে শির শির করে শীতল বাতাস আসছে মাঝে মাঝে। পাহাড়ের উপর আমরা অনেকটা উঠে এসেছিলুম।

কিন্তু সেবারের অভিজ্ঞতা আমার অন্য রকম হয়েছিল। এ পথে আমরা আসি নি, এসেছিলুম কালিকটের দিক থেকে বাসে চেপে। কালিকটেরও নাম পাল্টে গেছে, ইংরেজী অক্ষরে বানান দেখে পড়তে হয় কোঝিকোড। কিন্তু এটা সঠিক উচ্চারণ নয়। কেউ কোড়ি-

কোড বলেন, কেউ বলেন কোলিকোড। কেন এ রকম বলেন তা জেনে নেবার সুযোগ এখনও পাই নি। তবে এইটুকু জানতে পেরেছি যে তামিলনাড়ু বা দক্ষিণ ভারতে ইংরেজী টি এইচ-এর একসঙ্গে উচ্চারণ ত, থ নয়। টি লিখলে ট বা ত বোঝা যায় না বলেই ত বোঝাতে টি এইচ লেখা হয়। এই সূত্র দিয়ে উটির নাম উতগমণ্ডলম, উথগমণ্ডলম নয়।

সকাল সাতটায় আমাদের বাস ছেড়েছিল। পশ্চিমঘাট পাহাড় ডিঙিয়ে নীলগিরি পাহাড়ের মাথায় উটি পৌঁছতে ঘণ্টা সাতেক সময় লাগে। দূরত্ব একশো মাইলের মতো। কিন্তু আমরা বিকেল চারটেয় এসে পৌঁছেছি। পথে দেরি হয়েছিল কেন, তা বুঝতে পারি নি। পথের কথা অল্পই মনে আছে। কালিকট থেকে উটি আসবার দুটো পথ আছে—একটা দক্ষিণে মঞ্জেরি ও নীলম্বুর হয়ে, অন্যটা উত্তরে ভায়িত্তিরি হয়ে। কালিকট থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে এই জায়গাটি দেখেছিলুম বলে মনে পড়ছে। আমাদের বাস খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েছিল। এই দুটো পথ এসে মিলেছিল নাডাঙ্গি নামে একটা জায়গায়, গুডালুর সেখান থেকে মাইল আষ্টেক দূরে। যাঁরা আরও দক্ষিণ থেকে আসবেন, ত্রিচুর বা পালঘাট থেকে শোরানুর হয়ে, তাঁরা দক্ষিণের পথটা ব্যবহার করবেন। আর যাঁরা উটির দিকে না গিয়ে সরাসরি মাইসোরে চলে যেতে চান, তাঁরা উত্তরের পথটাই ব্যবহার করবেন। গুডালুর একটি পাহাড়ী শহর, সেখানেই আমরা দুপুরের আহার সেরে নিয়েছিলুম। শহরটি তামিলনাড়ু রাজ্যে। সেখান থেকেও একটি পথ মাইসোরে গেছে, তার দূরত্ব ষাট মাইল। অন্য পথটি দক্ষিণ-পূর্বে উটি এসেছে, দূরত্ব চব্বিশ মাইলের কম। ট্রেনে এলে আমাদের একটা দিন বেশি সময় লাগত, পয়সাও খরচ হত অনেক।

সেবার উটি বেড়াবার পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। প্রস্তাবটা আমিই করেছিলুম, আর স্বাতি সমর্থন করেছিল আমাকে। আমি

ভুল করেছিলুম ; কেরালা হাউসের লাউঞ্জে বসে বলে ফেলেছিলুম ঃ কালকের সেই মেয়ে পুরুষের দলটি চমৎকার ব্যবস্থা করেছে।

গভীর মনোযোগে মামা পাইপ টানছিলেন। আমার কথা শুনে তিনি বলেছিলেন ঃ কী রকম ?

খানিকটা তফাতে স্বাতি মামীকে ঘেঁষে বসে ছিল। তাকে উৎকর্ণ হতে দেখে আমি বলেছিলুম ঃ ত্রিবেন্দ্রাম থেকে একই পথে তারা কলকাতায় ফিরবে না। ট্রেনে কুইলন যাবে, নৌকোয় অ্যালেপ্পি, তারপরে বাসে এর্নাকুলম। এর্নাকুলম থেকে ট্রেনে উটি, উটি থেকে মোটরে মাইসোর।

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে মামা বলেছিলেন ঃ চমৎকার !

বিদ্রূপের সুর ছিল তাঁর মন্তব্যে। কিন্তু আমি তার কারণ বুঝতে না পেরে সঙ্কোচ বোধ করেছিলুম। কিন্তু স্বাতি সামলে নেবার জন্যে তৎক্ষণাৎ বলেছিল ঃ লেপ কম্বল না নিয়েই বুঝি উটি যাওয়া যায় !

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই আমি সতর্ক হয়ে বলেছিলুম ঃ সে কথা ওরা দেরিতে বুঝবে।

উটির প্রসঙ্গ চাপা পড়েছিল সেই সময়ে। কিন্তু পথে আবার উঠে পড়েছিল। আমি তুলি নি। তুলেছিলেন এক সহযাত্রী ভদ্রলোক। বলেছিলেন ঃ উটি হল পাহাড়ের রানী। উটি না দেখে দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে গেলে এই ভ্রমণ আপনাদের অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মামা এবারে আর ব্যঙ্গ করেন নি, চিন্তিত ভাবে বলেছিলেন ঃ আমাদের সঙ্গে তো গরম কাপড় যথেষ্ট নেই।

ভদ্রলোক বলেছিলেন ঃ যথেষ্ট গরম কাপড়ের দরকার তো এখন নেই। সকাল সন্ধ্যায় একটা সোয়েটার। আর রাতে একখানা কম্বল। আর কম্বল আপনারা হোটেলেই ভাড়া পাবেন।

স্বাতি ইশারায় আমাকে কথা কইতে বারণ করেছিল। নিজেও

কোন কথা বলে নি। আমাদের সাড়া না পেয়ে মামা মামীর দিকে তাকিয়েছিলেন, আর মামী বলেছিলেন: সে সব তো সঙ্গে আছে।

গোপালের কী হবে?

উত্তর দিতে মামী দেরি করেন নি, বলেছিলেন: গোপালকে একখানা গরম চাদর দিতে পারব।

গম্ভীর ভাবে মামা বলেছিলেন: হুঁ, ষড়যন্ত্রটা তাহলে সবাই মিলে করেছ!

কিন্তু উটির অভিজ্ঞতা আমাদের আনন্দের হয় নি। বিকেলে যখন বাস থেকে নেমেছিলুম, আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন ছিল, বৃষ্টি পড়ছিল শিপ শিপ করে। রাত্রিবাসের জন্য কোথায় উঠব তা আমাদের ঠিক ছিল না। বৃষ্টিতে ও ঠাণ্ডায় উটি আসার আনন্দ আমাদের মাটি হয়ে গিয়েছিল। কোন রকমে একটি দিন কাটিয়ে আমরা মাইসোরে চলে গিয়েছিলুম বাসে। সেখান থেকেই আমাদের কর্ণাটক ভ্রমণ শুরু হয়েছিল।

খেলনার মতো ছোট গাড়ির এই ট্রেনে চেপে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার একটা রোমাঞ্চ আছে। অপরূপ সুন্দর দৃশ্য পথের দুপাশের। কিন্তু আজ এই ট্রেনে বসে রোমাঞ্চ জাগছে না, পুরনো কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে বারে বারে। আর এই স্মৃতিচারণের জন্যেই মন যেন উন্মুখ হয়ে আছে।

সেবারে সকাল বেলায় উটি শহরটা দেখে দুপুরের আহার সেরে আমরা হোটেলে ফিরেছিলুম। কিন্তু স্বাতি হোটেলে বসে থাকতে রাজী হয় নি, বলেছিল: ডোডাবেটায় উঠে উটি শহরটা দেখতে কেমন লাগে তা আমাদের দেখা হয় নি।

মামী মনে মনে খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু মামা বলেছিলেন: কেন ওদের শাস্তি দিতে চাও বুঝি না।

উৎফুল্ল হয়ে স্বাতি বলে উঠেছিল: চলে এসো গোপালদা, আর দেরি কোরো না। যেতে আসতে অনেক সময় লাগবে।

কিন্তু পথে নেমে সে বলেছিল: কোথায় যাওয়া যায় বল তো?

আমি বলেছিলুম: কেন, ডোডাবেটায় উঠবে বললে যে!

তার চেয়ে ভাল জায়গা কি আর নেই?

কুনুর আর কোটাগিরি আছে।

স্টেশনের দিকে পা বাড়িয়ে স্বাতি বলেছিল: ঠিক বলেছ। এখন কোন ট্রেন আছে কিনা দেখি গিয়ে।

স্টেশনে গিয়ে আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলুম যে নীলগিরি এক্সপ্রেস ছাড়ছে। খেলনার মতো ছোট গাড়ি, তিন-চারখানা বগি আর ইঞ্জিন। নীল রঙের ট্রেন। যাত্রীরা সব উঠে বসেছে। স্বাতি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে দুখানা টিকিট কেটে এনেই উঠে পড়ল। আর আমাকে একটুখানি জায়গা দিয়ে বলল: বোসো এইখানে।

অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিল সে। তারপর সেই ভাবটা কেটে যেতেই বলল: এ খুব ভাল হল, তাই না গোপালদা?

আমি কোন উত্তর দিই নি। সে নিজেই বলেছিল: লোকে বলে যে ট্রেনে উটি না এলে নীলগিরি পাহাড়ের সবটুকু সৌন্দর্য দেখা হয় না।

এক সময়ে আমাদের ট্রেন স্টেশনের এলাকা ছেড়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছিল। পথের ধারে উটির লেক দেখতে পেয়েছিলুম, আর কুনুরে যাবার রাজপথ। কিছু ঘরবাড়ি পেরিয়েই উটি ফুরিয়ে গেল। তারপর শুধু পাহাড়ের দৃশ্য। যে দৃশ্য দেখবার জন্যে স্বাতি ব্যগ্র হয়েছিল, সেই দৃশ্য দেখলুম পথের দুধারে।

কিছুক্ষণ চলবার পরে আমাদের ট্রেন ফার্ন হিল নামে একটা ছোট স্টেশন পেরিয়ে গিয়েছিল, তারপর লাভডেল ও কেট্টি। আরাভাঙ্কাডু নামে একটা স্টেশনে অনেক কলকারখানা দেখতে পেয়েছিলুম। যাত্রীদের একজনকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলুম যে এই কারখানাটি

ভারত সরকারের ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্টের। এর পরে ওয়েলিংটন, একটি সুন্দর পাহাড়ী শহর। নীলগিরি এক্সপ্রেস সব স্টেশনেই দাঁড়ায়। ওয়েলিংটনের পরে কুন্নুরে দাঁড়ায় দশ মিনিট। কুন্নুর ঠিক মাঝ পথে নয়। উটি থেকে কুন্নুর বারো মাইলের বেশি হবে না। কিন্তু সময় লেগেছিল ঘণ্টা খানেক। কুন্নুরেই আমরা নেমে পড়েছিলুম।

এ যাত্রায় আমরা নিচে থেকে উপরে উঠছিলুম। সময় লাগছিল বেশি। কুন্নুর পর্যন্ত পথ আঠারো মাইলের কম। কিন্তু সময় লাগল প্রায় আড়াই ঘণ্টা।

কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই আমি কুন্নুরে নেমে পড়লুম।

২

কিন্তু কুন্নুরে নামবার জন্যে তো আমি আসি নি! কুন্নুরে নামলুম কেন? জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে এই কথাই আমার প্রথমে মনে এল। বোধহয় কুন্নুরের কথাই আমি ভাবছিলুম।

সেবারেও স্টেশনের বাহিরে এসে স্বাতি বলেছিল: খুব ভাল লাগল, তাই না গোপালদা?

আমি সংক্ষেপে বলেছিলুম: লাগল বৈকি।

এই পাহাড়ের সৌন্দর্য সত্যিই অপরূপ। বরফের পাহাড় এখানে নেই, পাহাড় অরণ্যময়। মাঝে মাঝে চা কিংবা কফির বাগান, আর দূরের পাহাড়ে ছোট ছোট গ্রাম দেখা গেছে ছবির মতো। এ অঞ্চলে কফির বাগান আছে অনেক। কিন্তু ট্রেন থেকে তা দেখতে পাওয়া যায় নি।

কিন্তু কুন্নুরে আমরা বেশিক্ষণ থাকি নি, দেখিও নি কিছু। কাছাকাছি দেখবার কিছু নেই বলে বাসে কোটাগিরি চলে গিয়েছিলুম।

বোধহয় এই পুরনো কথা ভাবতে ভাবতেই অন্যমনস্ক ভাবে আমি নেমে পড়েছি। স্টেশনে ফিরে গিয়ে কি আবার ট্রেনে উঠে পড়ব? না, এখানেই দিন কয়েক কাটিয়ে নেমে যাব নিচে!

জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম যে স্টেশনের কাছেই আছে একটা টুরিস্ট বাংলো। সেখানে জায়গা পেলে দিন কয়েক কুন্নুরেই কাটানো যাবে ভেবে এগিয়ে গেলুম। কিন্তু জায়গা পাওয়া গেল না। এখানে বাসস্থানের কোন অভাব নেই—রিজ আর হ্যাম্প্‌টন নামে ওয়েস্টার্ন স্টাইলের হোটেল আছে দুটি, সস্তায় দেশী হোটেলও

কয়েকটা আছে। তাছাড়া লজ রেস্ট হাউস ইন্‌স্পেক্‌শন বাংলোও আছে। বাস স্ট্যাণ্ডে রিটায়ারিং রুমও আছে।

কিন্তু কেন জানি না, উটির জন্যে একটা আকর্ষণ অনুভব করলুম। মনে হল যে উটিতে বিশ্রাম হবে ভাল, সময়টাও ভাল কাটবে। তাই বিকেলের গাড়িতেই উটি যাওয়া স্থির করে ফেললুম। দুপুরে এখানেই আহার সেরে একটুখানি বেড়িয়ে আসব।

সেবারে বেড়াবার জায়গার নাম শুনেছিলুম অনেকগুলি। কিন্তু সেসব নাম এখন আর মনে নেই। প্যাস্টুর ইন্‌স্টিটিউটের নাম ভুলে যাই নি। ডিরেক্টারের অনুমতি নিয়ে তা দেখা যায়। কিন্তু দেখবার উৎসাহ নেই। ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিক নই বলে বোধহয় শনিবার ছাড়া অন্য দিনে দেখার অনুমতিও পাওয়া যাবে না।

চা বাগান দেখেছি। দেখি নি কফির বাগান। কিন্তু তাতে বৈচিত্র্য কিছু নেই। কফির ফুল বা ফল খাওয়া হয় না, ফলের বীজ গুঁড়ো করে তাই খাওয়া হয়। শহরের মধ্যে নিশ্চয়ই বাগান নেই, তার জন্যে দূরে যেতে হবে।

তবে কি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখব? ল্যাম্ব্‌স রক, লেডি ক্যানিং'স সীট, ডল্‌ফিন্‌'স-নোজ্‌ ড্রুগ বা দুর্গ, টাইগার রক, র‍্যালিয়া ড্যাম এসব তো ছয় থেকে আট মাইল দূরে বলে শুনলুম। লো'স্‌ ওয়াটারফল নামে একটা জলপ্রপাতও আছে, কিন্তু কত দূরে বুঝতে পারলুম না। পাহাড়ী শহরে কিছু না জেনে শুনে একা দূরের পথে যাওয়া ঠিক নয় বলে মনে হল। আর কিছু দেখতে হলে একা যেন কিছুই ভাল লাগে না।

তার চেয়ে সিম্‌'স পার্কে একবার ঘুরে আসা চলে। কিংবা আর একটা জায়গায় গেলে হয়তো নতুন কিছু দেখা সম্ভব হবে। এদিকে শোলার উপত্যকা আছে ও প্রচুর শোলা জন্মায়। কিন্তু কয়েক জনকে জিজ্ঞাসা করেও সঠিক জায়গার হদিস পেলুম না। যত দূর মনে পড়ে, কোথায় যেন শুনেছিলুম যে লেডি ক্যানিং'স

সীটে যাওয়ার পথে কিংবা তা ছাড়িয়ে একটুখানি গেলেই শোলার বন দেখতে পাওয়া যায়। এক সময়ে এই শোলা দিয়ে গরম কালে ব্যবহারের জন্য সাহেবদের মাথার টুপি তৈরি হত, তার নাম ছিল শোলা হ্যাট। এখন বাঙলায় ঠাকুর গড়ার কাজে শোলার অপর্যাপ্ত ব্যবহার। শোলা দিয়ে দুর্গা-প্রতিমা পর্যন্ত তৈরি হয়েছে। নানা রকমের ফুল ও মালা তৈরি হয় সাজানোর জন্যে। শোলা-শিল্পীদের সূক্ষ্ম কাজ দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

শেষ পর্যন্ত আমার কোথাও যাওয়া হল না। দুপুরের আহার সেরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে ঘুরে সময়টা কাটিয়ে দিলুম। তারপর সময় মতো স্টেশনে এসে উটির ট্রেনে উঠে বসলুম। ট্রেন ছাড়ল সাড়ে পাঁচটায়। দিনের আলো তখন নিবে এসেছে।

সেই পুরনো পরিচিত পথ ধরে ট্রেন উপরে উঠতে লাগল। স্টেশনের নামগুলো আমি ভুলি নি। প্রথমেই ওয়েলিংটন, তারপর আরাভাঙ্কাড়ু। কেট্টি ও লাভডেলের পরেই উটি। ফার্ন হিল নামের কোন স্টেশন আর নেই। কিন্তু বেশিক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। অন্ধকারে একাকার হয়ে গেল সব কিছু।

অন্ধকারের গভীরতা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার বুঝি সচরাচর দেখা যায় না। হঠাৎ খানিকটা দমকা বাতাস গাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়তেই যাত্রীরা লাফিয়ে উঠে তৎপর ভাবে জানালাগুলো বন্ধ করে দিলেন। দেখতে না দেখতেই জানালার কাচের উপরে বিন্দু বিন্দু জল জমতে লাগল।

বৃষ্টি নেমেছে। বুঝতে পারলুম যে এতক্ষণ শুধু রাতের অন্ধকার দেখি নি। দেখেছি মেঘের অন্ধকারও। কুন্নুরের এক ভদ্রলোক আমাকে ঠিকই বলেছিলেন। আকাশের ভাবগতিক ভাল নয়। এই সেপ্টেম্বর মাসেও বৃষ্টি হয়, আর বৃষ্টি নামলে দু-একদিন চলে। সঙ্গে গরম জামা কাপড় আর ছাতা না থাকলে ভারি কষ্ট।

আমি বলেছিলুম, গরম জামা কাপড় বলতে আমার একটা স্লিপ-

ওভার আছে, কিন্তু ছাতা নেই।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, তবে উটি না গিয়ে এখানেই থেকে যান। এখান থেকেই ফিরে যাবেন ম্যাড্রাসে।

সেবারে যে আমরা মাইসোরে পালিয়ে গিয়েছিলুম, সে কথা আমার মনে আছে। তাই বললুম: বেগতিক দেখলে উটি থেকে মাইসোর হয়ে ম্যাড্রাসে চলে যাব।

তবে এক কাজ করুন।

বলুন?

রাতটা কুনুরে কাটিয়ে সকালের ট্রেনে যান উটি। দরকার হলে দিনের বেলাতেই মাইসোরের বাস ধরতে পারবেন।

ভদ্রলোকের গায়ে-পড়া উপদেশের জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম যে রাতটা উটিতেই কাটাব। তার জন্যে যদি কষ্ট স্বীকার করতে হয় তাতে আপত্তি নেই। সেবারেও আমরা বাস থেকে নেমে ভিজতে ভিজতেই একটা হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিলুম স্টেশনের কাছে। বারে বারেই যে এ রকম হবে, তার কোন মানে নেই। পাহাড়ে বৃষ্টি হয় যখন তখন, তবে নিশ্চয়ই এই বৃষ্টি কোন নিয়ম মেনে চলে না। তবে শুনেছি যে হিমালয়ের ধর্মশালায় ও গ্যাংটকে নাকি সন্ধ্যের দিকে প্রায়ই বৃষ্টি হয়।

দেখতে না দেখতেই জানালার কাচ বেয়ে জলের ধারা নামল নিচে। সেই জল গাড়ির ভিতরেও এল গড়িয়ে। যাত্রীদের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা দেখা দিল। আমরা উটির নিকটবর্তী হয়েছি। এইভাবে বৃষ্টি পড়তে থাকলে স্টেশনের বাহিরে যেতে পারব না বলেই বোধহয় এই উৎকণ্ঠা। কেন জানি না, আমার হাসি পেল। মনে হল যে উটি বোধহয় এবারেও আমার সঙ্গে রসিকতা করছে। সেবারের দুর্ভোগের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

ট্রেন যখন উটির প্ল্যাটফর্মে এসে থামল, ঘড়িতে তখনও সাতটা বাজে নি। চারিদিকে ঘন অন্ধকার, আর বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রান্তভাবে।

গাড়ির দরজা খুলতেই হু-হু করে একটা দমকা শীতল বাতাস ঢুকে সবাইকেই কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলুম যে একটা শৈলাবাসে এসে পোঁছেছি; শীত এখানে অগ্রাহ্য করা চলবে না।

কিন্তু আমরা প্রায় সবাই নিরুপায়। যাঁদের বর্ষাতি বা ছাতা ছিল তাঁরা একে একে চলে গেলেন। কিন্তু আর সবাই প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে রইলুম। স্টেশনের বাহিরে যাবার উপায় নেই। গায়ের একমাত্র গরম জামাটি ভিজে গেলে অবস্থা আরও অসহায় হবে।

একটু একটু করে এগিয়ে স্টেশনের সামনে এলুম। খানিকটা তফাতে কয়েকটা ট্যাক্সি দেখলুম অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমার পিছনে অপেক্ষা করছে আমার কুলি, তার হাতে আমার সুটকেস। তাকে বললে সে একটা ট্যাক্সি হয়তো ডেকে আনতে পারে। কিন্তু যাব কোথায়? সেবারে যে হোটেলে দুটো রাত কাটিয়েছিলুম সেখানে খাবার পাওয়া যায় না, বৃষ্টি না থামলে অনাহারে রাত কাটাতে হবে। আর যেসব হোটেলের নাম জানি, সেখানে নিরামিষ খাবার। এই শীতের দেশে নিরামিষ খাবারের নামে ভয় হয়। পছন্দ মতো কোন বাসস্থানের কথা আমার মনে পড়ল না। আমি আমার ব্রীফকেসটা হাতে নিয়ে কী করা যায় তাই ভাবছিলুম।

হঠাৎ পিছন থেকে আমার কুলি একটা চলনসই বোধ্য ভাষায় প্রশ্ন করল: আমি কোথায় যাব?

বললুম: সেই কথাই ভাবছি।

সে বলল: যাবার কোন জায়গা নেই তো! তাহলে এক কাজ করুন।

কী কাজ?

স্টেশনের ওপরতলায় রিটায়ারিং রুম আছে। আজকের রাতটা সেখানেই কাটাতে পারবেন।

তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললুম: সাবাস। রিটায়ারিং রুমের কথা তো সেবারেই শুনেছিলুম। কিন্তু মনে পড়ে নি এতক্ষণ।

কুলি হন হন করে এগিয়ে গেল অফিসের দিকে। যেতে যেতেই আমার দিকে ফিরে বলল: ঘর খালি আছে কিনা দেখে আসছি।

বলেই একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

চোখের সামনে আমি স্টেশনের প্রায় সবটাই দেখতে পাচ্ছিলুম। ছোট স্টেশন। এক নজরে মনে হয় যে কোন আশ্রয়স্থল নেই। রিটায়ারিং রুম উপরতলায়। কিন্তু তার সিঁড়ি এমন জায়গায় যে দেখা যায় না। অল্পক্ষণ পরেই কুলি ফিরে এসে বলল: প্রথম ঘরটাই খালি আছে।

এরই নাম মুশকিল আসান। স্টেশনে এই কুলিরাই যাত্রীদের পরম বন্ধু। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এই কুলির জাত। বিপদে আপদে সম্পদে সব সময়ে তারা যাত্রীদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি সমস্ত বড় রেল-স্টেশনে এই কুলিরা না থাকলে যাত্রীদের দুর্দশার অন্ত থাকত না। এন্‌কোয়ারি অফিসে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। মাইক্রোফোনে অহরহ ভুল ঘোষণা হয়, রিজার্ভেশন অফিস থেকে হামেশাই বিফল মনোরথে ফিরতে হয়। কিন্তু এই কুলীরা যাত্রীকে কখনও নিরাশ করে না। তারা সঠিক খবর দেয়, সঠিক জায়গায় নিয়ে যায়। বিনা রিজার্ভেশনেও গাড়িতে তুলে দিতে তারা সক্ষম। ট্রেনের টিকিট! সে ব্যবস্থাও তারা করতে পারে। যাত্রী তাদের দেবতা, আর তারা যাত্রীদের গুরু, তাদের শরণ নিয়েই মোক্ষলাভ হবে। আমিও এদেরই একজনকে অনুসরণ করে কতকটা গুপ্ত পথে উপরে উঠে রিটায়ারিং রুমের একটি ছোটখাটো ঘর খুব সহজেই দখল করতে সক্ষম হলুম।

এক সারিতে পাশাপাশি দুটি রিটায়ারিং রুম ও একটি রেলওয়ে অফিসারের রেস্ট রুম। একটিতে যাত্রী ছিলেন, অন্যটিতে আমি স্থান

পেলুম। দুজনের জন্য একটি ঘর। দুটি খাট পাতবার পর সামান্যই জায়গা আছে। তাতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। টেবলের উপরে একটি ইলেক্‌ট্রিক রূম হীটার দেখেই আনন্দ হল সবচেয়ে বেশি। বিছানায় কম্বলও আছে, তার নিচে সাদা চাদর। পরিষ্কার বিছানা। কম্বলখানি অন্যের ব্যবহৃত হলেও ক্ষতি নেই, নিচের চাদরখানি পরিষ্কার।

সুটকেসটি নামিয়ে রেখে কুলি একটি সেলাম করল। আর প্রাপ্যের অতিরিক্ত পেয়ে রূম হীটারটি চালিয়ে দিয়ে পরামর্শ দিল: স্টেশনের কাছেই ছোটখাটো হোটেলে খাবার পাওয়া যায়। কিন্তু এ রকম বৃষ্টি থাকলে স্টেশনের চায়ের স্টলেই কিছু খেয়ে নেবেন।

এই উপদেশের জন্য তাকে আমি একটা ধন্যবাদ দিলুম।

কুলি বিদায় নেবার পর পায়ের জুতো আমি খুলে ফেললুম। জানতুম যে একবার ঐ গরম বিছানার লোভে শুয়ে পড়লেই অনাহারে রাত কাটাতে হবে, ক্ষুধার তাড়ানাকেও অগ্রাহ্য করে শুয়ে থাকতে হবে বিছানায়। তার চেয়ে এখুনি একটুখানি গরম চায়ের সঙ্গে কিছু খেয়ে নেওয়া ভাল। রাতে তাহলে অভুক্ত থাকতে হবে না।

এখন এ স্টেশনে আর কোন ট্রেন আসবে না, কোন ট্রেন ছাড়বেও না। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ছেড়ে গেছে শেষ ট্রেন। রাতে এই ছোট লাইনে ট্রেন চলাচল নেই। দিনের বেলাতেও ট্রেনের সংখ্যা কম। দুখানা ট্রেন আসে নীলগিরি পাহাড়ের পাদদেশে মেট্টুপা-লাইয়াম জংশন থেকে, আর দুখানি ট্রেন আসে কুন্নুর থেকে। এক-খানি সকালে, আর বিকালে আর একখানি। এই দুখানি ট্রেনের ফেরার সময়ও এক। কিন্তু মেট্টুপলাইয়ামের ট্রেন সকালে ছাড়ে না। নিচে থেকে যে ট্রেন আসে, তাই ফিরে যায়।

চায়ের দোকান বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে ষোল আনা। বৃষ্টির জন্য বাহিরে যাওয়াও অসম্ভব। তবু আমি গরম বিছানার লোভ সামলাতে পারলুম না, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কম্বলের নিচে

ঢুকে পড়লুম। প্রথমটায় একটুখানি শীত ভাব ছিল, তারপর আরামে চোখ বুঁজে এল।

কিন্তু একবার আমাকে উঠতেই হবে। শুধু খাওয়া নয়, বাথরুমেও যেতে হবে, আর জামা কাপড় ছেড়ে রাতের পোশাক পরতে হবে। তারপরে দরজায় খিল দিয়ে ঘুমনা। এসবের জন্য তাড়া কিছু নেই। এখন সন্ধ্যে সাতটা। পাহাড়ী শহর বলেই অন্ধকার বৃষ্টি আর শীতে কাবু হয়েছি। আর এই শীতও যে বৃষ্টির জন্য তা বুঝতে পারছি, কিন্তু এই বৃষ্টি বন্ধ হবে কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না।

উটিতে কোন অসুবিধা হবে না বলেই আমার একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে সেই বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছিল। শীতার্ত অন্ধকার রাত যে এমন ভয়াবহ হতে পারে, তা ভাবতে পারি নি। কিন্তু এখন আর কোন ভয় নেই। কম্বলের নিচে শরীর বেশ গরম হয়ে উঠেছে। ঘরখানা নিতান্ত ছোট দেখে প্রথমটায় ভাল লাগে নি ঠিকই; এখন মনে হচ্ছে যে ছোট ঘরই ভাল, তাই এত অল্প সময়ে এমন আরামপ্রদ হয়ে উঠছে। আপাদমস্তক ঢেকে আমি দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুলুম। ভাল লাগছে, নেশার মত একটা আমেজ আসছে। আহারের সন্ধানে বেরোবার কথাও ভুলে যেতে ইচ্ছে করছে।

শুধু মনে পড়ছে সেবারের একটি ঘটনা। ভেজানো দরজার গায়ে গোটা কয়েক টোকা দিয়ে স্বাতি এসেছিল ঘরে, ফিস ফিস করে বলেছিল: বাবা তোমাকে খুন করবেন বলছেন।

আমি হেসে বলেছিলুম: কেন, কী করেছি আমি!

স্বাতি বলেছিল: হাসি নয় গোপালদা, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তো পালিয়ে যাও।

বলেছিলুম: কোথায় পালাব! ঘরের বাইরে গেলেও যে প্রাণ যাবে!

স্বাতি খিল খিল করে হেসে বলে উঠেছিল: ছি ছি, এমন শীত-কাতুরে তোমরা!

বলেই দরজা আবার ভেজিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে ফিরে গিয়েছিল।

সেদিনের সমস্ত ঘটনাই আমার মনে আছে। মনে পড়ছে। ভাল লাগছে। স্বাতি এবারে আসতে পারে নি। তার ছুটি ছিল না। কিন্তু ছুটি সে নিতে পারত। ইচ্ছে করেই ছুটি নেয় নি। বলেছে, শীতের গোড়ার দিকে সে ছুটি নেবে। অন্তত দিন পনেরো। জিজ্ঞাসা করেছিলুম: কোন দরকার আছে?

স্বাতি হেসে বলেছিল: আছে বৈকি!

কোন প্রশ্ন না করে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। আর সে গম্ভীর মুখে বলেছিল: আমার কাজ আছে আন্দামানে, সময় পেলে নিকোবরও দেখে আসব।

আমিও গম্ভীর হয়ে জানতে চেয়েছিলুম: আমাকে সঙ্গে নেবে না?

আর্জি পেশ কোরো।

বলে সে হেসে উঠেছিল তার নিজস্ব ভঙ্গিতে।

এখানে এই ঘরে কম্বলে মাথা ঢেকে শুয়ে আমি যেন তার সেই হাসির শব্দ মনের কানে শুনতে পাচ্ছি। আমি কি জেগে আছি, না ঘুমিয়ে পড়েছি!

৩

আমি বোধহয় আরামে ঘুমিয়েই পড়েছিলুম। হঠাৎ গায়ের উপরে দুপ দাপ করে কয়েকটা কিল চড় পড়তেই ঘুম ছুটে গেল। মুখের কম্বল সরিয়ে উঠবার চেষ্টা করতেই সমস্ত শরীর আমার অবশ হয়ে গেল। সবলে কে যেন আমাকে চেপে ধরল। তার কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাচ্ছি। কণ্ঠস্বর নয়, অজস্র অভিযোগ। কিন্তু সে কোন্ ভাষায় তা বুঝতে পারলুম না। কোন পুরুষের কণ্ঠস্বর হলে বল প্রয়োগ করে আমি তাকে সরিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু এ নারীর কণ্ঠস্বর—মিষ্টি মধুর স্বরে নানা অভিযোগে উচ্চকিত। আমি কী করব ভেবে পেলাম না। স্থির হয়ে পড়ে রইলুম।

সহসা আমাকে ছেড়ে দিয়ে এক হেঁচকা টানে কম্বলখানা সরিয়ে নিতেই আগন্তুক পরম বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গেল। আমি তার মুখের দিকে তাকালুম, আর সে তাকাল আমার মুখের দিকে। একটি মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই সে খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটি ভুল করেছে, না আমি স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলুম! উহুঁ, স্বপ্ন হলে দরজাটা এখনও খোলা দেখছি কেন! আর ঐ টেবলের উপরে ও সব কী দেখতে পাচ্ছি! ও সব তো স্বপ্ন হতে পারে না!

না, স্বপ্ন নয়। শীত করছে আমার। গায়ের কম্বলখানা সে সরিয়ে দিয়ে গেছে। আমি আবার সেখানা টেনে নিলুম। কিন্তু বিছানা থেকে উঠে দরজা বন্ধ করে দেবার ইচ্ছে হল না। টেবলের উপরে জিনিসপত্র যা রেখে গেছে, তা নিতে এলে নিজেই সে দরজা বন্ধ করে দেবে। কিন্তু ওসব নিতে কি কেউ আসবে!

এবারে আমি আর ঘুমিয়ে পড়লুম না। ঘড়িতে দেখলুম আটটা বেজে গেছে। এখন উঠতে হবে, যা করবার তা এখনই করে নিতে

হবে। দেরি করলে হয়তো আরও কষ্ট হবে। তবু আমি গড়িমসি করতে লাগলুম। একটু আগে যে ঘটনাটা ঘটে গেল, তার একটা সমাধান হওয়া দরকার। সমাধান মানে ব্যাপারটা আসলে কী তাই জানা।

মনে হল যে এ কথা জানার অসুবিধা হবে না। টেবলের জিনিস-গুলো নেবার জন্য কেউ আসবে এবং সেগুলো নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমার বাইরে যাওয়া উচিত হবে না। দরজা বন্ধ করে গেলে তাদের অসুবিধা হবে, আর দরজা খুলে রেখে যাওয়াও উচিত হবে না। নিজের জিনিস চুরি গেলে পথে আমার কষ্টের সীমা থাকবে না। কাজেই এখন নিশ্চিন্ত মনে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সবুরে যে মেওয়া ফলে, এই প্রবাদ বাক্যটি আজ আমাকে মেনে নিতে হল। খানিকক্ষণ পরেই দীর্ঘ দেহের অধিকারী এক সুপুরুষ ভদ্রলোক আমার ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন: গুড্ ঈভ্নিং সার, আই অ্যাম ইওর নেইবার সোমান্না।

গুড্ ঈভ্নিং।

বলে আমি কম্বল ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের নাম বললুম তাঁকে।

ভদ্রলোক অত্যন্ত শক্ত হাতে করমর্দন করলেন। তাঁর দেহের উত্তাপের সঙ্গে মনের উত্তাপও খানিকটা পেলুম। বললেন: আসুন, লেট আস্ ডাইন টুগেদার।

বলে টেবলের জিনিসপত্রগুলি গুছিয়ে তুলতে লাগলেন।

আমি ভদ্রতা করে 'মাপ করুন' বলবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু দেহের মতোই শক্ত তাঁর অনুরোধ। বললেন: নো এক্সকিউজ, প্লীজ।

তবু আমি ইতস্তত করছি দেখে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার জন্য হাত বাড়ালেন।

ভদ্রলোকের ঠোঁটের উপরে চওড়া কালো মশমশে গোঁফ। দুধারে মানানসই কামানো, আর কড়া করে তা ছেঁটে শক্তির পরিচায়ক হিসেবে গোঁফ জোড়া ব্যবহার করছেন। কিন্তু এখন সেই গোঁফের নিচের ঠোঁট ঈষৎ খোলা এবং মুখে একটা সকৌতুক হাসি দেখতে পাচ্ছি। বললেন: দেরি করবেন না। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

বলে আমাকে সঙ্গে নিয়েই ঘর থেকে বেরোলেন।

পাশের ঘরে ঢুকতে আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিল। মনে হচ্ছিল যে এইবারে বোধহয় সেই মহিলাকে দেখতে পাব। দেখা হলে আমার চেয়ে বেশি লজ্জা তাঁরই। কিন্তু আমি কী বলব, সেই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে উঠলুম।

ঠিকই অনুমান করেছিলুম। সেই মহিলা ঘরের এক কোণে মাথা নিচু করে বসেছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: আমাকে ক্ষমা করবেন।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম: না না—

কিন্তু বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন: ঐ মার-ধোর কার প্রাপ্য ছিল তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। ইনি একাকিনী গৃহিণী আমার। নিজের স্বামীকে মেরে মেরে এখন এমনই সিদ্ধ হস্ত যে কার পিঠে মার পড়ছে তারও খেয়াল থাকে না।

ভদ্রমহিলা রুখে উঠে বললেন: তোমাকে মারি আমি?

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে ভদ্রলোক বললেন: না না, কোন দিন না। আমার গায়ে হাত তুলেছ, এমন কথা শত্রুতেও বলতে পারবে না।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন: শুধু আজ এই ঠাণ্ডায় নিজের হাত দুটো একটুখানি গরম করবার ইচ্ছা হয়েছিল আর কি! বাইরে বেরিয়ে ঠাণ্ডা লেগেছিল তো, তাই ভেবেছিলে কারও পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে দিলে নিজের ঠাণ্ডা শরীরটা গরম হবে। তাতে দোষ কিছু হয় নি। কী বলেন?

বলে একখানা চেয়ার আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে বসে পড়লেন।

ভদ্রমহিলা বললেন: সত্যি কথা বলছ না কেন? নিজে কম্বলের মধ্যে শুয়ে থেকে আমাকে ভেজালে বৃষ্টিতে। তোমাকে আমার—

খুন করা উচিত ছিল। তা এখনও করতে পারো। পিস্তলটা বার করে দেব?

তাদের কথাবার্তা শুনে আমি হাসছিলুম। আর ভদ্রলোক বেশ উপভোগ করছিলেন বলে মনে হল। কিন্তু ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন: এমন সব কাণ্ড এক একটা করে যে কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

বলেই ভদ্রলোককে তাঁর চেয়ার থেকে টেনে তুলে দিয়ে নিজে বসে বললেন: কথা বলে তো পেট ভরবে না, খাবারও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন: আমাদের কোন বাসনপত্র নেই কিন্তু, হাতে হাতেই খেতে হবে।

বলে একটা মোড়ক থেকে রুটি আর একটা থেকে গোটাকয়েক কাটলেট বার করলেন। পাঁউরুটি কাটা ছিল, তাই ভাগ করে দিতে অসুবিধা হল না। আর খেতে খেতেই সব কথা জানা গেল। একটা বিয়েয় যোগ দেবার জন্য তাঁরা কুর্গের প্রধান শহর মার্কারায় যাচ্ছেন। ম্যাড্রাস থেকে মার্কারায় যাবার সোজা পথ হল ব্যাঙ্গালোর হয়ে। কিন্তু মিস্টার সোমান্না বললেন যে তিনি উটি ও মাইসোর হয়ে যাচ্ছেন। কালিকট থেকে তাঁর এক বন্ধুও সস্ত্রীক এই বিবাহে যোগ দিতে যাবেন। তিনি উটি আসবেন তাঁর গাড়ি নিয়ে। তারপর একসঙ্গে সবাই মার্কারায় যাবেন।

এঁরা নীলগিরি এক্সপ্রেসে দুপুর বেলায় এসেছেন এখানে। একই সময়ে তাঁদের বন্ধুদেরও আসবার কথা ছিল। সকালে ব্রেকফাস্টের পরে কালিকট থেকে বেরোলে বিকেলের আগেই এখানে

পৌঁছনো যায়। কিন্তু বন্ধুদের বদলে একটা 'তার' এসেছে: সরি, একদিন দেরি হয়ে যাচ্ছে বিশেষ কারণে। আজকের বদলে তাঁরা কাল এসে পৌঁছবেন। ট্রেন থেকে নেমেই সোমান্নারা এই খবর পেয়েছেন। আর এই জন্যেই এখানে এঁদের রাত কাটাতে হচ্ছে।

মিসেস সোমান্না বললেন: বলি নি আমি, এ সব দুর্বুদ্ধি ভাল নয়। উটিতে এখন প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে।

মিস্টার সোমান্না গম্ভীর ভাবে বললেন: সীতা, কোথায় বৃষ্টি হয় না বল তো! আর বৃষ্টি হলেই কি কোন জায়গাকে খারাপ বলতে হবে!

মিসেস সোমান্না বলে উঠলেন: তবে কেন ঘরের ভেতরে ঢুকে অবধি আর বেরোতে পারছ না! খাবার জন্যেও তো বেরোতে পারলে না ঘর থেকে!

ভদ্রমহিলার রাগের কারণ এবারে বোঝা গেল। বৃষ্টি দেখে মিস্টার সোমান্না খেতে যাবার জন্যে বেরোতে রাজী হন নি, আর তাঁর স্ত্রীও স্বামীকে অভুক্ত রাখতে রাজী ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত একাই বেরিয়েছিলেন পথে, আর বৃষ্টিতে অনেকক্ষণ আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত একখানা ট্যাক্সি ধরে স্টেশনে ফিরেছেন। উত্তপ্ত হয়েই ফিরেছিলেন। আর তাড়াহুড়োয় প্রথম ঘরটিতে ঢুকে পড়েছিলেন ভুলে। লাল কম্বলে মুখ ঢাকা দিয়ে একটা মানুষকে আরামে শুয়ে থাকতে দেখে তাঁর আক্রোশটা মিটিয়ে নেবার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তখন আর লজ্জার সীমা ছিল না তাঁর। কী বলবেন ভেবে না পেয়ে পালিয়ে এসে স্বামীর সাহায্য নিয়েছেন। মিস্টার সোমান্না রসিক বলেই ব্যাপারটা সহজে মিটে গেল, সম্বন্ধ সহজ হয়ে গেল অল্প সময়ে।

মিস্টার সোমান্না বললেন: কিন্তু সার, আমার বউএর হাতের মার যখন খেয়েছেন, তখন তাঁর নিমন্ত্রণের ভাগও নিতে হবে।

এর আগে আমি নিজের কথা বলেছিলুম। এ দিকের কাজ

শেষ করে দিন কয়েক বিশ্রাম নিতে এসেছি এখানে। এখান থেকেই দেশে ফিরে যাব। এই কথার পিঠেই তিনি নিমন্ত্রণের কথা বললেন। আর আমি ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বললুম : মানে ?

মানে খুব সোজা। ছুটি যখন আছে, তখন সীতার সঙ্গে আপনাকেও মার্কারা যেতে হবে।

ভদ্রমহিলা বললেন : উটিতে তো আপনি বেড়াতে এসেছেন, চলুন না আমাদের সঙ্গে। মার্কারা এই উটির চেয়ে অনেক ভাল।

ভদ্রলোক বললেন : উটি বুড়ো শহর, এর সর্বত্র একটা জবুথবু জড়সড় ভাব। মার্কারায় নতুন জীবন সঞ্চারিত হয়েছে। উঠতি শহর কিনা, তাই সজীব ও প্রাণবন্ত।

আমি বললুম : কষ্ট হবে আপনাদের।

কষ্ট কিসের ! আনন্দ হবে বলুন।

তবু আমি ইতস্তত করছি দেখে ভদ্রলোক বললেন : কোডাভাদের দেখলে বুঝতে পারবেন, অতিথি এলে তারা কত আনন্দ পায় !

আমার কোন যুক্তিই তাঁরা মানলেন না। শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলুম : আজকের রাতটা ভেবে দেখি।

৪

কুর্গ সম্বন্ধে কৌতূহলের আমার অন্ত ছিল না। ছেলেবেলায় ভূগোলে এই নাম পড়েছি। কুর্গের রাজধানী মার্কারা। এক সময়ে স্বাধীন রাজ্য ছিল। পরে বৃটিশ অধিকারে এসেছিল। মাইসোর রাজ্যের সংলগ্ন এই ছোট দেশটি মানচিত্রে ভিন্ন রঙে দেখানো হত।

পরে আরও কিছু জেনেছিলুম। এ দেশের লোকেরা খুব সাহসী ও উঁচু দরের যোদ্ধা। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তাদের খুব নাম। এই দেশেরই দুজন মানুষ ভারতের প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন।

এখন শুনতে পাচ্ছি যে কুর্গ কর্ণাটক রাজ্যের একটি জেলায় পরিণত হয়েছে। জেলার প্রধান শহর মার্কারা। মার্কারায় ট্রেন নেই। মোটরে বা বাসে যেতে হয়। মাইসোর থেকে যায় শুনেছি। কিন্তু আরও কোন পথ আছে কিনা আমার জানা নেই। মার্কারায় কী দেখবার আছে, সে সম্বন্ধেও কোন ধারণা নেই। আর এই জন্যই বোধহয় আমার কৌতূহল বেড়ে গেল।

বাধা শুধু সৌজন্যের। সামান্য একটা ঘটনার জন্যে এই সোমান্না পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। নিতান্তই মৌখিক পরিচয়। মিসেস সোমান্না ভুল করে আমার ঘরে ঢুকে না পড়লে এ পরিচয় হত না। নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে গেলেও সে সম্ভাবনা ছিল না। ভুলটা সংশোধন করবার প্রয়োজন হয়েছিল বলেই তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।

তাঁরা একটা বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাচ্ছেন। আশ্বিন মাসে বিয়ে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমাদের দেশেও আজকাল আশ্বিন মাসে বিয়ে হচ্ছে এক আধটা। কিন্তু সোমান্নারা নিজেরাই নিমন্ত্রিত। আর আমাকে নিমন্ত্রণ করছেন তাঁরা।

3

আমাদের দেশে নিমন্ত্রিতরা অন্যকে নিমন্ত্রণ করে না। তবে হয়তো নিমন্ত্রণ করবার অধিকার আছে তাঁদের। কিন্তু অসঙ্কোচে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার মতো সাহস আমার নেই।

পরদিন মিসেস সোমান্না বললেনঃ আপনি ভারি লাজুক প্রকৃতির মানুষ!

আর মিস্টার সোমান্না গম্ভীর ভাবে বললেনঃ বাঙালীরা এই রকমই।

বলে আমার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলেন।

আমি বললুমঃ বাঙালীদের এ চিরকালের বদনাম। তা না হলে এক কালে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বার পরে একালে নিজের দেশেই খুনোখুনি করে মরছে! কোন দিন শুনবেন যে নিজের ঘরেই তারা খুনোখুনি করছে।

মিস্টার সোমান্না বললেনঃ পাড়ায় পাড়ায় এ রকম হচ্ছে বলে তো শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের কথাটা অন্যরকম। আমরা লাজুক প্রকৃতির কথা বলছি। বাঙলার বাইরে বাঙালীরা এমন লাজুক কেন!

সবাই নয়।

তাহলে আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। আমরা যাঁদেরই দেখছি, তাঁরাই এই রকম। একজন মহিলার হাতে মার খেয়েও আপনি প্রতিবাদ করলেন না। কোন শাস্তি দেবার কথাও মনে এল না। কী লজ্জার কথা বলুন!

হেসে বললুমঃ মহাত্মাজীর কথা মনে আছে! এক গালে চড় খেলে আর একটা গাল বাড়িয়ে দেবার কথা তিনি বলেছেন।

মিস্টার সোমান্না বললেনঃ এইজন্যেই তো তাঁকে মরতে হল। গাল বাড়িয়ে চড় খাবার যুগ আর নেই। এখন বাঁচতে হলে অন্যকে চড় মারবার জন্যেই সারাক্ষণ তৈরি থাকতে হবে। আমি আপনার

জায়গায় হলে ও রকম মার খাবার পরে সীতাকে আর সোমান্নার কাছে ফিরে যেতে দিতাম না।

অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে মিসেস সোমান্না বললেন: কালকের কথা আজ আবার তুলছ কেন!

মিস্টার সোমান্না বললেন: আমাদের সঙ্গে মার্কারায় যেতে রাজী হলে কি আর এ কথা তুলতাম! স্ত্রীলোকের হাতে মার খেয়েও ভদ্রলোকের লজ্জা হয় নি।

বলে হাসতে লাগলেন।

সকাল বেলাতেই এঁরা আমাকে ডেকে তুলেছেন। বলেছেন: মুখ হাত ধুয়ে নিন তাড়াতাড়ি।

আমি বলেছিলুম: এই ঠাণ্ডার দেশে তার জন্য তাগাদা কিসের!

এ কথার উত্তরে মিসেস সোমান্না বলেছিলেন: জানলা দিয়ে দেখতে পান নি! আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

আর মিস্টার সোমান্না বলেছিলেন: বেশিক্ষণ যে পরিষ্কার থাকবে, তার কোন গ্যারান্টি নেই।

অতএব আমরা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

নির্জন স্টেশন। একখানি খালি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সেখানে দু-একজন রেলের কর্মচারী। সাড়ে সাতটার সময় এই ট্রেন ছাড়বে। স্থানীয় যাত্রীরা আসবে ছুটতে ছুটতে। নীলগিরি পাহাড়ের লোকাল ট্রেন এটি। নঙডেনে দাঁড়াবে, দাঁড়াবে কেট্টি আরাভাঙ্কাড়ু ও ওয়েলিংটনে। আরাভাঙ্কাড়ুতে বড় ফ্যাক্টরি আছে. ওয়েলিংটনে পুলিসের হেড কোয়ার্টার। তার পরের স্টেশন কুন্নুর এই পাহাড়ের দ্বিতীয় শহর। সকাল বেলাতেই পৌঁছে দেবে কাজের লোকদের। আবার ফিরিয়ে আনবে বিকালে। কাল আমি এই ট্রেনেই এসেছি।

কিন্তু এসব দেখবার জন্য আমরা দাঁড়াই নি। আমরা কোন

হোটেলে চা খেয়ে বেড়াতে যাব। উটির আবহাওয়ার উপরে কোন ভরসা নেই বলেই আমরা এত সকালে বেরিয়ে পড়েছি। স্টেশনের বাহিরে আসতেই একটা দল আমাদের যেন আক্রমণ করতে ছুটে এল। মিস্টার সোমান্না হাত নেড়ে বললেন: দরকার নেই।

কিসের দরকার নেই!

ট্যাক্সির। এরা সব ট্যাক্সির ড্রাইভার। ঐ যে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো সব ট্যাক্সি। দেখতে সব প্রাইভেট গাড়ির মতো। আর মডেল দেখতে পাচ্ছেন তো! ইংরেজ আমলের পুরনো বিলিতি গাড়ি। এ সব গাড়ি এদেশে আর আসে না। উটিতে এখনও চলছে।

তারপরে বললেন: মার্কারায় আপনি সব নতুন গাড়ি দেখতে পাবেন। নতুন দেশী গাড়ি। সেখানে গেলেই আপনি মেনে নেবেন, উটিকে আমি বুড়ো শহর কেন বলি!

আর এর পরেই মিসেস সোমান্না বললেন: মার্কারা যাবার জন্যে মনস্থির করে ফেলেছেন তো!

মার্কারা সম্বন্ধে কৌতূহল আমার কম ছিল না। কিন্তু সহসা রাজী হতে পারি নি বলেই বাঙালীর দুর্নাম শুনতে হল। আমি একটু ইতস্তত করে বলেছিলুম: আমাকে আর টানবেন না।

আর এই কথার উত্তরেই মিসেস সোমান্নাও বলেছিলেন: সত্যিই আপনি লাজুক প্রকৃতির মানুষ।

এই দম্পতির সঙ্গে এগোবার সময় আমি চারিদিকে নজর রেখেছিলুম। স্টেশনের বাইরেটা একটা বিরাট প্রাঙ্গণের মতো। তারপর দোকানপাট হোটেল রেস্তোরাঁ গাড়ি ঘোড়া বাসস্ট্যাণ্ড। ডান দিকের পথ লেকের দিকে গেছে, আর বাঁ দিকের পথ গেছে শহরের দিকে। আর সামনের পথটা একটা ছোট পাহাড়ের উপরে উঠেছে। সেই পাহাড়েও ঘর বাড়ি আর বড় হোটেল দেখতে পাচ্ছি।

আকাশ এখন পরিষ্কার। শীতের বাতাস বইছে না। একটি স্লিপওভার এখন বেশ আরামপ্রদ মনে হচ্ছে। বাঁ দিকের পথ ধরে চলতে চলতে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ একটা রেস্তোরাঁর সামনে এসে মিস্টার সোমান্না বললেন : আসুন।

রেস্তোরাঁয় তখনও ভিড় হয় নি। একটা টেবলে আমরা তিনজন বসলুম। মিস্টার সোমান্না ইড্‌লি বড়া আর কফির অর্ডার দিলেন। তারপরেই আমাকে বললেন : দক্ষিণ ভারতে এলে কি আপনাদের খাওয়ার কষ্ট হয় ?

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু তিনি বললেন : না বললে মানব কেন! আপনারা নিরামিষ ভোজী নন। অথচ এদিকের নিরামিষ হোটেলগুলিই বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমিষ আহারের জন্যে আপনাকে মিলিটারি হোটেলে যেতে হবে।

মিলিটারী হোটেল!

ভদ্রলোক হেসে বললেন : মিলিটারী হোটেল মানে সৈনিকদের হোটেল ভাববেন না। যে হোটেলে আমিষ খাবার পাওয়া যায়, তারই নাম মিলিটারী হোটেল। এককালে বোধহয় আর্মির লোকের মনোরঞ্জনের জন্যে চলত, তাই এই নাম। মাংসের সঙ্গে বোধহয় মদও চলত। কিন্তু সে সব জায়গা ব্রাহ্মিণ হোটেলের মতো পরিচ্ছন্ন নয় বলেই আপনাকে এইখানে আনলাম।

মিসেস সোমান্না বললেন : ভাল কাটলেটের জন্যে আমাকে বেরিং ক্রসে যেতে হয়েছিল। সেদিকটা এদিকের মতো নোংরা নয়।

আমি বললুম : খাবার শৌখিনতার জন্যে এখানে আসি নি তো! এসেছি কয়েকদিন বিশ্রাম করতে।

মিস্টার সোমান্না বললেন : সে আপনার দুরাশা।

কেন ?

স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে আপনার বিশ্রাম হবে না। বাথরুমে গরম জল পাবেন ঠিক, কিন্তু সে বাথরুমটা ঘরের বাইরে। আর

চারবেলা খাবার জন্যে আপনাকে চারবার ওপর নিচে ও বাজারে যাতায়াত করতে হবে। আর হোটেল মানেই নিরামিষ আহার।

মিসেস সোমান্না বললেন : কেন, বিলিতি হোটেল তো আছে!

তা আছে। কিন্তু সে সব জায়গায় রোজ পোষায় না।

ঠাণ্ডা ইড্‌লির সঙ্গে গরম বড়া এল, তার সঙ্গে চাটনি। কফিও এল। এ খাবার আমার কাছে নতুন নয়। ডোসাও খেয়েছি। মসালা ডোসা বা কিমা ডোসা আমার কাছে সুস্বাদু মনে হয়েছে। কিন্তু সে জিনিস সব সময় তৈরি থাকে না। আর সর্বত্র ভাল তৈরিও হয় না।

কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখেই মিস্টার সোমান্না উঠে গিয়ে ঘরের এক কোণে এক ভদ্রলোককে পয়সা দিয়ে দিলেন। কফি আমি আগেই শেষ করেছিলুম। ভেবেছিলুম যে বিল এলে আমিই পয়সাটা দিয়ে দেব। কিন্তু এখানে যে বেয়ারা বিল আনবে না, আর আমাদেরই উঠে গিয়ে পয়সা দিতে হবে, তা বোঝবার আগেই ভদ্রলোক ফিরে এসে বললেন : তাহলে ঐ কথাই রইল। এ বেলায় উটিতে একটু ঘোরাঘুরি করে ও বেলায় আমরা মার্কারা যাচ্ছি।

আমি এবারে মিনতি করে বললুম : আপনারা একটা বিয়েয় যোগ দিতে যাচ্ছেন! আমাকে সেখানে মানাবে না।

এ কথার উত্তর যেন ভদ্রলোকের ঠোঁটেই লেগে ছিল। বললেন : বিয়ে বাড়িতে যদি আপনার ভাল না লাগে তো একটা চমৎকার হোটেলে আপনাকে পৌঁছে দেব। যেমন থাকবার জায়গা, তেমনি খাবার ব্যবস্থা। বিয়ের দিন এসে বিয়েটা দেখে যাবেন, আর দেশে ফিরে গল্প করবেন বন্ধু বান্ধবের কাছে।

এবারে সত্যিই একটা লোভ জাগল আমার। দেশের বাইরে সামাজিক ক্রিয়া কর্ম দেখবার সুযোগ আমাদের হয় না। আমরা বাইরে যাই কাজে, কিংবা স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে। যে সব জায়গায়

যাই, তার বাইরের রূপটাই দেখি। ভিতরের খবর নিই না আগ্রহের অভাবে। এ যাত্রায় কুর্গ দেখবার সুযোগ পাচ্ছি; কোডাভাদের বিবাহ উৎসব দেখতে পাব। তবু কেন রাজী হতে পারছি না! মনে হল যে এ বোধহয় অন্য একটা কারণে। যাঁরা আমাকে যাবার জন্যে বলছেন, তাঁরা নিজেরাই যাবেন অন্যের গাড়িতে। তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, তাঁরা আমাকে কী চোখে দেখবেন তাও জানি না। এই অনিশ্চয়তায় জন্যেই আমি রাজী হতে পারছিলুম না।

মিস্টার সোমান্না বোধহয় এই কথাই ভাবছিলেন। বললেন: আচ্ছা, ঠিক আছে। মিসেস চাঙ্গাপ্পা যদি আপনাকে ছেড়ে দেয় তো দেবে।

মিসেস চাঙ্গাপ্পা!

মিসেস সোমান্না হাসছিলেন। আমি এই হাসিতে খানিকটা কৌতুকের আভাস পেয়ে প্রশ্ন করলুম: ব্যাপারটা খুলেই বলুন না।

ভদ্রলোক বললেন: বিকেলের দিকে নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন।

আর হাসতে হাসতে মিসেস সোমান্না বললেন: আরও শক্ত পাল্লায় পড়বেন।

মানে?

মানে আর কিছু নয়। তার ভয়েই আমরা ব্যাঙ্গালোর হয়ে মার্কারায় যেতে পারলাম না। ওদিকের টিকিট কেটেও টিকিট ফেরৎ দিতে হয়েছে।

কেন?

না দিয়ে উপায় আছে! টেলিফোনে হুকুম এল, উটি এসো, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমরা অপেক্ষা করব তোমাদের জন্যে।

তারপর?

তারপরে খবর এল, না। আমাদেরই অপেক্ষা করতে হবে

তাদের জন্যে। বিশেষ কারণে তাদের রওনা হতে দেরি হচ্ছে তারা বিকেলে এসে পৌঁছবে।

বললুম: বিকেলেও তো এলেন না তাঁরা!

মিসেস সোমান্না বললেন: আজ বিকেলে এসে পৌঁছলেও বাঁচি!

মিস্টার সোমান্না বললেন: আজ আর অপেক্ষা করব না আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে চলে যাব।

মিসেস সোমান্না বললেন: অসম্ভব।

কেন?

তাহলে মার্কারা থেকে আমাদের উটিতে ফিরিয়ে আনবে তারপর প্রোগ্রাম মাফিক নিয়ে যাবে মার্কারায়।

মহিলার কথা শুনে আমি হেসে ফেললুম। কিন্তু তিনি বললেন: হাসছেন আপনি! ওঁর পাল্লায় পড়লেই বুঝতে পারবেন, ব্যাপারখানা কী!

আমি হেসে বললুম: বিয়ের পরে পৌঁছলেও তো বিপদ হতে পারে! আপনাদের জন্যে বর কনেকে হয়তো দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে হবে!

মিসেস সোমান্না খিল খিল করে হেসে উঠে বললেন: ঠিক বলেছেন। আমরা পৌঁছবার আগে যদি বিয়ে হয়ে যায় তো জবরদস্তি করে বলবে, আবার বিয়ে কর।

মিস্টার সোমান্না বললেন: ভুল করবেন না, যিনি বলবেন তিনি মিস্টার চাঙ্গাপ্পা নন, মিসেস চাঙ্গাপ্পা।

গল্প করতে করতে স্টেশনের দিকেই আমরা ফিরে যাচ্ছিলুম। এ পথটা আমি চিনে ফেলেছি, তবু বললুম: এখন আমরা কোথায় চলেছি?

ভদ্রলোক বললেন: স্টেশনে একবার খবর নিতে হবে, আর

কোন সংবাদ এসেছে কিনা। আর কোন্ দিকে যাচ্ছি, তাও বলে যেতে হবে।

মিসেস সোমান্না বললেন: বলা যায় না, শেষ রাতে রওনা হয়ে সকাল বেলায় এসে পৌঁছতে পারে। আর মাইসোরে হল্ট্ না করেই যেতে পারে মার্কারা। ওদের কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই।

মিসেস সোমান্না বললেন: কিন্তু তাতে বিপদ ঘটবার ভয় আছে। আমাদের বাধা দিতে হবে।

তুমি দিও।

বলে মিস্টার সোমান্না গট গট করে হাঁটতে লাগলেন।

স্টেশনে কোন নতুন খবর পাওয়া গেল না। সাড়ে সাতটার ট্রেনটা চলে গেছে। প্ল্যাটফর্ম আবার আগের মতোই নির্জন। দু-একজন রেলের কর্মচারী ছাড়া আর কেউ নেই। মিস্টার সোমান্না তাদেরই একজনকে ধরে স্থানীয় ভাষায় কিছু বলে এলেন। তারপর কাছে এসে বললেন: আসুন।

বললুম: কোথায়?

ডোডাবেটায় উঠবেন?

ডোডাবেটার কথায় আবার আমার পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। স্বাতি ঐ পাহাড়ের মাথায় উঠে উটি শহরটাকে দেখতে চেয়েছিল। তারই জন্যে দুপুরে বেরিয়েছিল হোটেল থেকে। কিন্তু পাহাড়ে ওঠা হয় নি। তার বদলে আমরা কুন্নুরে চলে গিয়েছিলুম, আর কুন্নুর থেকে কোটাগিরি।

আমার কোন উত্তর না পেয়ে ভদ্রলোক বললেন: নীলগিরি পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু শিখরের নাম শোনেন নি!

তারপরেই হাতের আঙুল দিয়ে সামনের পাহাড় দেখিয়ে বললেন: ঐ তো ডোডাবেট্টা! ওর ওপর যদি উঠতে চান তো বলুন, একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে।

কেন জানি না, ডোভাবেটায় উঠবার ইচ্ছা আমার হল না। তাই বললুম: তার চেয়ে নিচেটাই একটু দেখে নেওয়া যাক।

ভদ্রলোক কিছু আশ্চর্য হয়ে বললেন: নিচে আর দেখবেন কী!

মিসেস সোমান্না বললেন: লেকে গেলে নৌকোয় চাপা যাবে, আর বটানিকাল গার্ডেনে গেলেও মন্দ লাগবে না।

ভদ্রালাক তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন: রেসকোর্সের নাম বলছ না কেন! সেখানে গেলে ঘাসের ভেতর লুকোচুরি খেলা যাবে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন: হাঁটতে আপনার কেমন লাগে?

বললুম: ভাল।

তবে আসুন, পায়ে হেঁটেই লেকটা দেখে আসা যাক।

মিসেস সোমান্না ভয়ে ভয়ে বলে উঠলেন: শেষ পর্যন্ত হাঁটাবে নাকি!

গম্ভীর ভাবে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন: না। এধার থেকে লেকের চেহারা দেখেই ইনি ফিরে আসতে চাইবেন, ওধারে আর যাবেন না।

দিনের আলোয় পথ তখন আরও পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে চললুম।

শহরের যে প্রান্তে রেল স্টেশন, সেই দিকেই লেক। কুন্নুরও এই দিকে। রেল লাইনের মতো এই পথও নিচে নেমে যাবে। লেকের ধারে পৌঁছতে আমাদের বেশি সময় লাগল না।

একটি সুন্দর জলাশয়। কিন্তু এ সময়ে কোন যত্নের চিহ্ন নেই। তাই আমার কাছে তেমন আকর্ষণীয় বলে মনে হল না। মিসেস সোমান্না বললেন: ওধারে যাবেন?

বললুম: এধার থেকেই তো সব দেখতে পাচ্ছি!

মিস্টার সোমান্না বললেন: কাল ট্রেন থেকেই হয়তো দেখেছেন!

না, দেখি নি।

বোধহয় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তাই না ?

বললুম : বৃষ্টি পড়ছিল। তবে ট্রেন থেকে দেখা যায় জানলে দেখবার চেষ্টা করতুম।

ভদ্রলোক বললেন : বুঝেছি। না দেখলে আপসোস করতে হত।

আবার আমরা স্টেশনে ফিরে এলুম। মিস্টার সোমান্না ভিতর থেকে আবার খবর নিয়ে এসে বললেন : বটানিকাল গার্ডেনই বা বাদ থাকে কেন !

বলে বাজারের পথ ধরে এগোলেন।

আকাশে তখন মেঘ দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়ের মাথায় মেঘ জমেছে। রোদও উঠেছে। ভাল লাগছে হাঁটতে। পায়ে হেঁটেই আমরা উটি শহরটা দেখব।

৫

উটির সঙ্গে মার্কারার তুলনা করেছিলেন মিস্টার সোমান্না। উচ্চতায় মার্কারা উটির প্রায় অর্ধেক। এমন কি কুন্নুর ও কোটা-গিরির চেয়েও অনেক নিচু। মার্কারার মতো চার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ী শহর ভারতবর্ষে অনেক আছে। কিন্তু মানে সম্মানে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর শহর। পাহাড়ী শহরের মর্যাদা যেন উচ্চতার উপরেই নির্ভর করে। এ কথা বিশেষ ভাবে সত্য হিমালয়ের পাহাড়ী শহর-গুলোর ব্যাপারে। চারি দিক থেকে বরফ দেখা না গেলে যেন তা শৈলাবাসই নয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের বেলায় এ নিয়ম ঠিক মানা যায় না। দক্ষিণ ভারতের কোনখানেই বরফ নেই। উটিতেও না। কেউ বলে না দিলে বোঝাও যাবে না, কোন্‌টা উঁচু আর নিচু কোন্‌টা।

ঠিক এই সময়ে মিসেস সোমান্না বাধা দিয়ে বললেন: তোমার এ কথা মেনে নেওয়া যায় না।

কেন?

মিসেস সোমান্না বললেন: এই মেঘ এই বৃষ্টি আর এই শীত—এ সব থেকেও বেশ বোঝা যায় যে উটি এ অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ী শহর।

মিস্টার সোমান্না বললেন: এই যে সমতল পথ ধরে আমরা চলেছি, এর থেকে কী বোঝা যায়?

মিসেস সোমান্না বললেন: এ পথ সমতল হতে পারে, কিন্তু আশেপাশে উঁচু-নিচু পথও আছে।

আমি বললুম: মার্কারার পথ বুঝি সব উঁচু-নিচু?

মিস্টার সোমান্না বললেন: শহরের প্রধান পথটি ঠিক সমুদ্রের

ঢেউএর মতো উঠছে আর নামছে। রাজার্স মীটে যেতে চান তো পাহাড়ে উঠতে হবে। ফোর্ট কোর্ট-কাছারি যাবেন তো সেও পাহাড়। রাজাদের সমাধিও পাহাড়ের ওপরে।

মিসেস সোমান্না বললেন ঃ শিবের মন্দির ?

মিস্টার সোমান্না একটু থমকে গিয়ে বললেন ঃ কতকটা সমতল, কিন্তু প্রথমটায় খানিকটা নিচে নামতে হবে। আর সিনেমা হাউস তো পাতালেই বলতে পার। সিনেমা দেখে ওপরে ওঠা একটা কঠিন একসারসাইজের ব্যাপার। কিন্তু আমরা আপনাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না। ইউ উইল সী এ লিভিং টাউন, এ থ্রাইভিং প্লেস।

এব কারণটাও তিনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন। এই সব পাহাড়ী শহরেব গুমর ছিল ইংরেজের আমলে। গরমের দেশ। অথচ পাখা নেই, ফ্রিজ নেই, এয়ারকণ্ডিশনার নেই। সাহেবদের খুব কষ্ট হত গরমকালে। তাই গরমের সময় লম্বা ছুটি নিয়ে দেশে চলে যেত যাদের সঙ্গতি আছে। আর অন্যরা এ দেশেরই পাহাড়ের আনাচেকানাচে ঠাণ্ডা জায়গা খুঁজে বেড়াত। মাছ ধরত, শিকার কবত, ডাকবাংলো তৈরি করত। বর্ধিষ্ণু পাহাড়ী গ্রাম হত শহরে পরিণত। শেষ পর্যন্ত লাটসাহেবরা বললেন, গ্রীষ্মের সময়ে তাঁদের রাজধানী পাহাড়ে চলে যাবে। মানে, লাটসাহেবের খাস দপ্তরগুলো যাবে। তাঁর অফিসার আর্দালী কেরানীবাবুরাও যাবে। পাহাড়ী শহরগুলো জমজমাট হয়ে উঠবে গরমের কয়েক মাস। চেঞ্জাররা আসবে, আসবে অফিসার ও কেরানীবাবুদের আত্মীয় পরিজন বন্ধু-বান্ধব। সিনেমা থিয়েটার ঘোড় দৌড় আমোদপ্রমোদের নানা ব্যবস্থা। তারপর শীত আসন্ন হলে সবাই নেমে যাবে। ঘুমিয়ে পড়বে শহর।

এখন এসবের আর দরকার নেই। রাজ্যপালের বাড়ি এয়ার-কণ্ডিশণ্ড্। দপ্তরও তাই। বড় বড় অফিসারদের ঘরেও এয়ার-কণ্ডিশনার। গরমের জন্যে তাঁদের আর পাহাড়ে যাবার প্রয়োজন

হয় না। তবে কে যাবে পাহাড়ে! কজনের পয়সা আছে! অবসরই বা আছে কজনের! মুষ্টিমেয় শৌখিন চেষ্টার নিয়ে কি একটা শহর বেঁচে থাকতে পারে! মিস্টার সোমান্না বললেন: মৃত্যু তার অনিবার্য। কিন্তু একদিনে মরবে না, তিলে তিলে মরবে। উটিও দেখতে পাচ্ছেন, ওর নাভিশ্বাস উঠেছে।

কিন্তু আমার সেরকম কিছু মনে হল না। পথঘাটে লোকজন আছে। বাজার হাটে ক্রেতা ও বিক্রেতা দেখতে পাচ্ছি। হোটেল রেস্তোরাঁয় খাচ্ছে লোকজন। পথে মোটর চলছে, বাস যাতায়াত করছে। কাজেই মিস্টার সোমান্নার কথা মেনে নিতে মন রাজী হল না।

তারপর তিনি বললেন: মার্কারা হল অন্য রকমের শহর। একেবারে উঠতি শহর। শৈলাবাস বলব না। বলব কুর্গের প্রধান শহর, ব্যবসায়ের কেন্দ্র। সমস্ত রাজ্যে—এখন আর রাজ্য বলা ঠিক হবে না, জেলা বলাই উচিত—যা কিছু উৎপাদন হচ্ছে, তা নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র হল মার্কারা। প্লাণ্টার কথাটা শুনেছেন?

বললুম: না।

মার্কারায় গিয়ে এই কথাটার মানে বুঝতে পারবেন। ইংরেজী শব্দ প্লাণ্ট্ থেকে প্লাণ্টার। মানে চাষী। সোজা কথায়, যারা কফির চাষ করে বা করায়, তাদের আমরা প্লাণ্টার বলি।

মিসেস সোমান্না বললেন: চাষীই বটে। আমাদের সবাইকে তারা এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে।

সে কি!

বলে আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁদের মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন: কথাটা মিথ্যে নয়। কাপড়ের মিলের মালিককে তাঁতি বলার মতো আর কি! কফির বাগানটা হল প্লাণ্টারের। আপনাদের দেশে যেমন চায়ের বাগান, কুর্গে তেমনি কফির বাগান। এক একজনের লাখ লাখ টাকার কারবার।

আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজী না হলে যে হোটেলে আপনাকে তুলে দিতে হবে, সেও এক প্লান্টারের হোটেল। ঐ হোটেলে উঠেই ব্যাপারটা অনুমান করতে পারবেন।

কিন্তু হঠাৎ প্লান্টারের কথা কেন?

আমার প্রশ্ন শুনে মিস্টার সোমান্না হাসলেন। আর মিসেস সোমান্না বললেন: চাঙ্গাপ্পা হলেন প্লান্টার।

আমি ভারি স্বরে বললুম: সর্বনাশ! আমাকে কি উটিতে কিনে মার্কারায় বেচে দেবেন নাকি!

প্রবল কণ্ঠে মিস্টার সোমান্না হেসে উঠলেন। আর মিসেস সোমান্না ভরসা দিয়ে বললেন: সে ভয় নেই। চাঙ্গাপ্পা সে জাতের প্লান্টার নন, তাঁর দৌড় খুব বেশী নয়।

বড় বড় পা ফেলে আমরা বটানিকাল গার্ডেনের দিকে চলেছিলুম। পথের এক ধারে ছোট বড় দোকানপাট বাজার। আর অন্য ধারে খানিকটা দূরে একটা ময়দানও দেখতে পেলুম। বড় বড় ঘাসে আচ্ছন্ন সেই ময়দান, পশু চারণ ক্ষেত্রের মতো মনে হল। মিস্টার সোমান্না বললেন: এই হল উটির বিখ্যাত রেসকোর্স। এখানে লুকোচুরি ছাড়া আর কিছু খেলা যায় বলে মনে হয় কি?

মিসেস সোমান্না বললেন: বর্ষায় এই অবস্থা হয়। বৃষ্টি বন্ধ হলেই এর ব্যবস্থা হবে।

এমনি করে কথা বলতে বলতে আমরা বটানিকাল গার্ডেনে পৌঁছে গেলুম।

কলকাতার মতো বিরাট বাগান নয়, দার্জিলিঙের মতো পাহাড়ের গায়েও নয়। ছোট একটি সমতল ক্ষেত্রে একটি সাজানো সুন্দর বাগান। তার পিছনে পাহাড়। সবুজ লন আছে। মরসুমি ফুলের চারা লাগানো হয়েছে। কিন্তু ফুল এখনও ফোটে নি। আর কিছুদিন পরে এখানে ফ্লাওয়ার শো হবে। তখন ফুলে ফুলে ভরে যাবে এই বাগান। ভিড় করে লোক আসবে এই ফুলের শোভা দেখতে।

বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে সকালের রোদ এসে স্থানে স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। দু-চারজন মেয়ে পুরুষ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আর দু-একজনকে দেখলুম নিবিষ্ট মনে বসে বই পড়ছে।

মিস্টার সোমান্না বললেন : কেমন দেখছেন ?

বললুম : মন্দ না।

এরপর কোথায় ?

বললুম : জানি নে।

তিনি তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন : হাতে এখনও অনেক সময় আছে। আর কিছু দেখবার ইচ্ছা থাকলে বলুন।

নীলগিরির টোডাদের কথা আমার মনে পড়ে গেল। সেবারে তাদের দেখেছিলুম। কিন্তু বিশেষ কিছু জানতে পারি নি। তাই বললুম : এই পাহাড়ের আদিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক আজগুবি কথা একটা ইংরেজী বইএ পড়েছিলুম। তাদের সম্বন্ধে কিছু জানা সম্ভব কিনা জানি নে।

তখন আমরা ধীরে ধীরে হাঁটছিলুম। আর পথের ধারে একটা বেঞ্চিতে বসে একজন পাঠরতা মেয়ে যে আমাদের লক্ষ্য করছিল, তা দেখতে পাই নি।

মিস্টার সোমান্না বললেন : এখান থেকে অনেকটা দূরে মুকুর্টি পাহাড়ে তাদের বাস আছে শুনেছি। মাইসোরে যাবার পথে তাদের দেখে যাওয়া সম্ভব।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : ধারে কাছে কোন গ্রাম নেই, কিংবা কোন বস্তি ?

মিস্টার সোমান্না তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। আর তাঁর স্ত্রী তাকালেন পথের ধারের সেই মেয়েটির দিকে। মেয়েটি হেসে বলল : আপনারা কি টোডাদের দেখতে চান ?

ইংরেজীতে প্রশ্ন। ইংরেজীতেই জবাব দিলেন মিসেস সোমান্না। বললেন : আমাদের এই বন্ধুটির শখ।

বেশ তো, দেখে যান না আপনারা।

বলে মেয়েটি আমাদের উৎসাহ দিল।

আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। মিসেস সোমান্না জিজ্ঞাসা করলেন: কত দূরে আমাদের যেতে হবে?

মেয়েটি বলল: দু-এক ঘর টোডা দেখবার জন্যে বেশি দূরে যেতে হবে না। এখান থেকে খুবই কাছে। কিন্তু বাজপথ ধরে গেলে মাইল তিন-চার হবে।

আমার দিকে চেয়ে মিস্টার সোমান্না বললেন: ইনি হাঁটতে পারবেন?

মেয়েটি উত্তর দিল: হাঁটলে পথ অনেক সংক্ষেপ হবে।

কিন্তু মিসেস সোমান্না বললেন: আজ হাঁটিয়ে আমাদের মেরে ফেলবে নাকি! উটিতে কি ট্যাক্সি নেই!

একটু আগে যে একটা ট্যাক্সিতে করে জনকয়েক মেয়ে পুরুষ বেড়াতে এসেছিল, আমরা তা দেখতে পাই নি। মেয়েটি বলল: ঐ তো ট্যাক্সি!

কিন্তু ট্যাক্সির কাছে গিয়ে সুবিধা হল না। সে বলল, তিন-চার মাইলের মধ্যে কোন টোডা বস্তির কথা তার জানা নেই।

মিসেস সোমান্না বললেন: দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি।

বলে মেয়েটির কাছে ফিরে গিয়ে কী বললেন জানি নে, মেয়েটিকে একরকম জোর করেই টেনে আনলেন। বললেন: ইনিই আমাদের দেখিয়ে আনবেন।

মিস্টার সোমান্না বললেন: অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

তারপরে আমরা ট্যাক্সিতে উঠে বসলুম।

মেয়েটিকে দেখে মনে হয়েছিল যে বোধহয় কোন কলেজের ছাত্রী। মিসেস সোমান্না ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা করলেন: কোন কলেজে পড়েন?

মেয়েটি হেসে বলল: না।

ততক্ষণে আমি তার হাতের বইটি দেখতে পেয়েছিলুম। বই নয়, মেডিকেল জার্নাল। আমি তাই অসঙ্কোচে বললুম: বোধহয় ডাক্তারী করেন!

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল: হাসপাতালে চাকরি করি।

মিসেস সোমান্না আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি হেসে বললুম: আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওঁর হাতে মেডিকেল জার্নাল, অথচ ছাত্রী নন। কাজেই ডাক্তার বলেই আমি সন্দেহ করেছি।

মেয়েটি হেসে বলল: ভুলও হতে পারে। আমি যার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম তিনি ডাক্তার হতে পারেন!

মিস্টার সোমান্না বললেন: তবে তো আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

মেয়েটি বলল: দেখবার তো বিশেষ কিছু নেই! কাজেই ইচ্ছা করলেও দেরি করতে পারবেন না।

এর পরে টোডাদের কথা শুরু হল। মিস্টার সোমান্না বললেন: টোডারা চিরকালই আদিবাসী থেকে গেল, কিছুতেই সভ্য হতে পারল না।

মিসেস সোমান্না বললেন: কেমন করে হবে! সে সুযোগ তো নেই!

মিস্টার সোমান্না বললেন: সুযোগ পেলেও যে সুযোগ তারা নেবে না। সরকার তো আদিবাসীদের জন্যে অনেক কিছু করছেন। তাদের লেখাপড়ার জন্যে, চাকরির জন্যেও নানা রকমের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন। এর পরেও যদি তারা সুযোগের অভাব আছে বলে তো অন্যায় হবে।

মেয়েটি এই আলোচনায় যোগ দিল না। কতকটা জোর করেই সে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসেছিল। বলেছিল, তাতে পথ দেখাতে সুবিধা হবে। সেই কাজই সে করছে। আমাদের আলোচনায়

তার কান আছে কিনা বুঝতে পারলুম না।

ট্যাক্সি তখন সদর রাস্তা ছেড়ে অন্য পথ ধরেছে। পাহাড়ের উপরে যেন উঠে যাচ্ছে। আমি এইবারে জিজ্ঞাসা করলুম ঃ টোডাদের এখন পেশা কী?

মিস্টার সোমান্না বললেন ঃ পশুপালন। পশুর মধ্যে শুধু মোষ।

চাষ আবাদ?

সে নামে মাত্র।

তবে তাদের চলে কী করে?

চলে আর কোথায়! তাকে চলা বলে না। বাপদাদা একটা কুঁড়ে তৈরি করে রেখে গেছে, গোটা পরিবারটা আছে তারই ভেতরে। আর সে কুঁড়ে কি আমাদের কুঁড়ের মতো! দরজা এমনি ছোট যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয় ভেতরে। কোন জানালা নেই। দ্বিতীয় পথ নেই বেরোবার। আর ঐ একটি কুঁড়ের মধ্যেই সব।

তারপরে টোডাদের অনেক কথা শোনালেন আমাদের। ভারি অদ্ভুত জাত এরা, অনেক অদ্ভুত সামাজিক রীতিনীতি আছে এদের। তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল শিশুকন্যা হত্যা।

আমি চমকে উঠে বললুম ঃ এখনও এই কুসংস্কার আছে?

মিস্টার সোমান্না গম্ভীর ভাবে বললেন ঃ নিশ্চয়ই আছে। চিরকালের সংস্কার তাদের যাবে কোথায়! প্রকাশ্যে না করলেও লুকিয়ে করে।

এক সাহেবের লেখায় আমিও এই সংস্কারের কথা পড়েছিলুম। এদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা এক সময়ে বেশি ছিল। মেয়েরা সংসারের ভার বহন করতে পারে না, পারে ভার বৃদ্ধি করতে। টোডারা তাই শিশুকন্যা হত্যা করতে লাগল। অনেকদিন পরে দেখা গেল যে অবস্থা ঠিক উল্টে গেছে। মানে, পুরুষরা আর বিয়ের জন্যে মেয়ে পাচ্ছে না। অনেক পুরুষ মিলে একটা মেয়েকেই বিয়ে করছে। এক পরিবারের ভাইরা একটা মেয়েকে বিয়ে করলে অসুবিধা নেই।

নানা বয়সের ভাইরা সেই মেয়েকে নিয়ে সুখেই সংসার করতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন গ্রামের কয়েকটা পুরুষ যখন একটা মেয়েকে বিয়ে করে, তখনই হয় মুশকিল। পালা করে মেয়েটাকে এক এক গ্রামে থাকতে হয় এক একটা স্বামীর সঙ্গে।

মিস্টার সোমান্না হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। আমি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম: কী হল?

ভদ্রলোক একটু সামলে নিয়ে বললেন: না, কথাটা বলা ঠিক হবে না।

কেন?

কানের কাছে মুখ এনে ভদ্রলোক বললেন: মেয়েরা অফেন্স নেবে।

কিন্তু না বলেও থাকতে পারলেন না। চুপি চুপি বললেন: পেটে বাচ্চা এলেই বিপদ! কার ছেলে তাই নিয়ে গণ্ডগোল!

মিস্টার সোমান্না বসেছিলেন মাঝখানে। এক ধারে আমি, আর মিসেস সোমান্না অন্য ধারে। কিন্তু মিস্টার সোমান্নার কথা যে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, আমি তাঁর কৌতুক দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম। আর সামনের মেয়েটিও যে শুনতে পেয়েছে, তাও বুঝতে পারলুম তার কানের রঙ দেখে। হঠাৎ খানিকটা লাল রঙ যেন তার কানের দু পাশে লেগে গেল। তাই আমি আর কোন আগ্রহ প্রকাশ করতে পারলুম না।

মিস্টার সোমান্নাও কিছু সন্দেহ করেছিলেন। বললেন: পরে আপনাকে বলব।

কথায় কথায় কখন যে আমরা শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছিলুম, আর কখন তা ছাড়িয়ে এসেছি, তা খেয়াল করি নি। এ জায়গায় আর ঘরবাড়ি নেই। এক দিকে পাহাড় আর খাদ অন্য দিকে। সামনের পথ ক্রমেই উপরে উঠেছে। সেই দিকে তাকিয়ে আমি টোডাদের গ্রাম দেখবার চেষ্টা করছিলুম।

মিস্টার সোমান্না বলে উঠলেন ঃ এদের বিয়ের ব্যাপারটাও ভারি মজার। ভারি কৌতুকের মনে হবে আপনার কাছে।

কিন্তু সে কথা আরম্ভ করবার আর সময় পেলেন না। সামনের মেয়েটি কিছু নির্দেশ দিতেই ড্রাইভার তার গাড়ির গতি মন্থর করল। তারা যে স্বচ্ছন্দে কোন স্থানীয় ভাষায় আলাপ করছিল, তা লক্ষ্য করে আমি আশ্চর্য হলুম। আর মিস্টার সোমান্নাও তাই দেখে থেমে গেলেন।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাড়ি থামল। আর মেয়েটিকে নামতে দেখে আমরাও নেমে পড়লুম। মিসেস সোমান্নার কাছে এসে মেয়েটি বলল ঃ একটু অপেক্ষা করুন।

বেশিক্ষণ নয়, একটুখানি সময়ের জন্য অদৃশ্য হয়ে গিয়েই সে ফিরে এল। বলল ঃ আসুন এইবারে।

বলে আমাদের পথ দেখিয়ে অগ্রসর হল।

আমরা অনুসরণ করলুম তাকে।

৬

এক নজরে চারি ধারে চেয়েই আমার মনে হল যে সেবারেও বোধহয় আমরা এখানে এসেই নেমেছিলুম। পাহাড়ের দৃশ্য ঠিক একই রকমের। আসবার সময়েও একই পথ বলে মনে হয়েছিল। আবার এও মনে হল যে সে জায়গা নাও হতে পারে।

একটা পায়ে-চলার পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে আমাদের নিচের দিকে নামতে হল। তার পরেই আমরা পাহাড়ে-ঘেরা ছোট একটি উপত্যকায় পৌঁছে গেলুম। কিন্তু এই উপত্যকাটি সমতল নয়। সমুদ্রের তরঙ্গের মতো উঁচু-নিচু। কোথাও একটুখানি উঠেছে, কোথাও নেমেছে একটুখানি। তার পিছনে উঁচু পাহাড়, আর পাইনের বন। দু-একটি ইউকালিপ্টাস গাছও আছে।

কুঁড়েগুলির দিকে তাকিয়ে আমি এবারেও আশ্চর্য হলুম। এ কুঁড়ে আমাদের দেশের মতো নয়, কোন দেশের মতোই নয়। মানুষের বসবাসের ঘর বলেই মনে হয় না। মনে হয় যেন গরুর গাড়ির বড় একটা ছই মাটিতে নামিয়ে রেখেছে। কোন ভিৎ নেই, দেওয়াল নেই, সবটাই অর্ধবৃত্তাকার ছাদ। কোন দরজা জানালাও দেখতে পাচ্ছি না। আমার বিস্ময় দেখে মিস্টার সোমান্না বললেন: দেখছেন তো!

বলে আমাকে একটু এগিয়ে যেতে বললেন। আর নিজেও গেলেন এগিয়ে। দেখলুম যে দু ধারে দেওয়ালের মতো আছে। এক ধারে একটা ছোট দরজার মতো। তার সামনে একটুখানি পরিষ্কার অঙ্গন। আর পাথর সাজিয়ে দেওয়ালের মতো একটু ঘেরা জায়গা। কুঁড়ের দরজা বললে ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাবে না। এ যেন মাটির সঙ্গে লাগানো একটি জানালা। শিশুরা হেঁটে ভিতরে

ঢুকতে পারে, কিন্তু বালকদেরও মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকতে হবে। বড় মানুষদের যে সত্যি সত্যিই হামাগুড়ি দিয়ে যাতায়াত করতে হয়, তাতে কোন সন্দেহ রইলো না।

মিস্টার সোমান্না বললেন: দেখলেন তো, শহরের এত কাছে থেকেও ঘরদোর তৈরি করতে শিখল না!

আশ্চর্য হবার মতো কথা। কিন্তু আমি তখন অন্য কারণে বেশি আশ্চর্য হচ্ছিলুম। এই সব কুঁড়ের কাছাকাছি কোন মানুষজন দেখতে পাচ্ছিলুম না। এখানে কি আজকাল কেউ বসবাস করে না?

মিস্টার সোমান্না বললেন: খবরের কাগজে তাহলে ঠিকই লিখেছে। এদের জনসংখ্যা নাকি খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে।

কেন?

মিস্টার সোমান্না বললেন: এক সময়ে দারিদ্র্যের জন্যে এরা শিশুহত্যা করত। ছেলেরা তবু কিছু করতে পারে বলে বেছে বেছে এরা মেয়েদেরই হত্যা করত। তার পরের অবস্থা তো বলেছি। সমাজে মেয়ের সংখ্যা এমন কমে গেল যে একটা পরিবারের সব কটা ছেলে একটা মেয়েকেই বিয়ে করত। এমন কি বিয়ের পরেও যদি স্বামীদের একটা ভাই জন্মাতো তো সেই ভাইটাও বড় হয়ে বউ বলে দাবি করত নিজের মায়ের বয়সী সেই মেয়েটাকে। তারপর অবস্থা আরও খারাপ হল। মানে, চার-পাঁচটা গ্রামের ছেলেরা একটা মেয়েকে বিয়ে করতে লাগল। আর মেয়েটিকে প্রত্যেক স্বামীর কাছে পালা করে থাকতে হত এক এক মাস।

হঠাৎ কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে হৈহৈ করে ছুটে এল। তাদের দিকে তাকাতে গিয়ে পিছনের দু-তিনটি পাকা বাড়ির দিকে চোখ পড়ল। এরা সব সে দিক থেকেই এসেছে। মনে হল, এরা সব পড়াশুনা করছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছে। একটা ছোট ছেলে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করল: টোডা দেখতে এসেছ?

খুশী হয়ে মিস্টার সোমান্না বললেন : হ্যাঁ।

মাথা দুলিয়ে একটা মেয়ে বলল : এসো।

বলে একটা কুঁড়ের কাছে ডেকে নিয়ে গেল।

দরজার বাইরে থেকেই ডাকল কাউকে। আর তার ডাক শুনে একজন বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। বুড়োর বয়স আমি অনুমান করতে পারলুম না। মুখ-ভরা গোঁফ দাড়ি কাঁচা পাকা। মাথার ঝাঁকড়া চুলও তেমনি। হাতে একটা লাঠি আছে। কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়ালো না। কোমর বাঁকা করে উঠে এসে একটা পাথরের উপরে বসল।

আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম যে এই শক্ত চেহারার মানুষটি দেখতে অভিজাত পরিবারের পুরুষের মতো। গায়ের রঙ খুব ময়লা নয়, আবার গৌর বর্ণও নয়। ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে তামাটে দেখাচ্ছে।

মিস্টার সোমান্না তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করলেন না। আমি এগিয়ে গেলুম কিছু বলবার জন্যে। কিন্তু কোন্ ভাষায় কথা বলব তা ভেবে পাবার আগেই একটি ছোট ছেলে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। সে অন্য ভাষা। সে ভাষায় আমাদের অধিকার নেই। বুড়ো সহাস্যে মাথা নাড়তে লাগল আমার দিকে চেয়ে।

আমি আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলুম—বুড়োর গায়ে একখানা চাদর জড়ানো। আর ঠিক বুকের উপরে এই চাদরের নকশা কাটা আঁচল ওপর থেকে নিচ অবধি নেমেছে। লাঠিটা মাটিতে রেখে লোকটি যেন হাসছে।

অন্য দিকে সেই ছোট মেয়েটি মিসেস সোমান্নাকে টেনে নিয়ে গেছে কুঁড়ের দরজা পর্যন্ত। ভিতরে যাবার জন্যে বোধহয় পীড়াপীড়ি করছে। কিন্তু মিসেস সোমান্না বেশ ভয় পেয়েছেন। নিচু হয়ে বসে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করছেন। দরজার ভিতরে মুখ বাড়াবার সাহস পাচ্ছেন না।

মেয়েটি এবারে আমার কাছে ছুটে এসে ভাঙা ইংরেজীতে বলল : কুঁড়ের ভেতরে যাবে না ?

সেবারে আমি কুঁড়ের ভিতরে যাই নি। তাই বেশ কৌতূহল ছিল আমার। বললুম : যাব।

খুশী হল মেয়েটি। আর তাকে আরও খুশী করবার জন্যে আমি দরজার সামনে গিয়ে উপস্থিত হলুম। নিচু দরজা, বসে বসে ঢুকতে হবে। কিন্তু মুখ বাড়িয়ে দেখলুম যে কুঁড়ের মধ্যে একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক রান্নাবান্নার কাজ করছে। আর কেউ তার কাছে নেই। খানিকটা সঙ্কোচের জন্যে আমি পিছিয়ে এলুম।

মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল : কী হল ?

বললুম : দেখতে পেয়েছি।

বলে আর সেখানে অপেক্ষা না করে অঙ্গনের বাইরে চলে এলুম।

কোথা থেকে দুটি যুবতী মেয়ে এসে মিসেস সোমান্নার কাছে দাঁড়িয়েছিল, তা আগে দেখতে পাই নি। তাদের পোশাক দেখেই আশ্চর্য হলুম বেশি। দুজনেই এমন ভাবে চাদর জড়িয়েছে যে উপরে মুখ আর নিচে পা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বুকের উপরে চাদরের কারুকার্য করা আঁচল। বুঝতে কষ্ট হল না যে এই চাদর তাদের একটি প্রিয় জিনিস। এটি গায়ে না জড়িয়ে তারা অতিথির সামনে বেরোবে না।

কিন্তু এই মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে আমার কেমন খটকা লাগল। ভারি চেনা চেনা মনে হল একটি মুখ। কিছু শুকনো আর এলোমেলো কেশপাশ। তা না হলে মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হল। কিন্তু সে কোন কথা কইল না। মিসেস সোমান্নার প্রশ্নের উত্তর দিল অন্য মেয়েটি।

মিস্টার সোমান্না আমাকে বললেন : পুরুষদের দেখতে পাচ্ছি না কেন জানি নে। বোধহয় মোষ চরাতে গেছে।

আমি চারিদিকে চেয়ে বললুম : এমন শ্যামল উপত্যকা ছেড়ে

কোথায় যাবে!

মিস্টার সোমান্না বুঝতে পারলেন যে কথাটা মিথ্যা নয়। তর্কের খাতিরে তবু বললেন: এর পেছনে হয়তো আরও উপত্যকা আছে। আরও ঘর বাড়ি।

তারপরেই বললেন: আপনারা তো মহাভারতের গল্প জানেন!

বললুম: জানি।

দ্রৌপদীর কথা ভাবুন।

তারপরে একটু কৌতুকের সুরে বললেন: পাঁচটা স্বামীকে এরা কিভাবে সামলায়, সেই কথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়! তাই না?

কোন উত্তর না দিয়ে আমি শুধু হাসলুম।

ভদ্রলোক বললেন: টোডা মেয়েরা প্রত্যেকেই এক একটি দ্রৌপদী।

বলে কটাক্ষে তাকালেন সেই মেয়ে দুটির দিকে।

আমি তাদের ভাল করে লক্ষ্য করলুম। মাঝারি গড়ন। বেশি লম্বা নয়, আবার বেঁটেও নয়। দেহের স্বাস্থ্যও আগাগোড়া ঢাকা পড়েছে তাদের চাদরে। মুখ দেখে ফর্সা বলতে হয়। কিন্তু প্রসাধনের অভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। যে মেয়েটিকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে, সে কথা কইছে না, মুখ টিপে শুধু হাসছে। অন্য মেয়েটি বয়সে ছোট, সে-ই কথা কইছে মিসেস সোমান্নার সঙ্গে।

মিস্টার সোমান্না আমাকে বললেন: বুঝলেন ভাই, সত্যিই এরা একটা অদ্ভুত জাত। দরজা-জানালা বন্ধ করে এরা সভ্যতার আলো আটকে রেখেছে। দেখছেন না কাণ্ড! উটি শহরের এমন কাছে, অথচ আছে কেমন করে!

তারপরেই হেসে উঠলেন।

আমি এই হাসির কারণ বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক বললেন: এদের ছেলে হওয়ার গল্পটা আপনাকে বলিনি তো!

বললুম ঃ না।

ভদ্রলোক বললেন ঃ কোন মেয়ে প্রথম মা হবে, এ কথা জানা-জানি হলেই কে সেই ছেলের বাপ হবে, তা স্থির করার একটা অদ্ভুত পদ্ধতি আছে।

কী রকম ?

মেয়ের সব স্বামীরা একটা বৈঠকে বসবে। পাঁচ-ছটা ভাই হলে বিশেষ অসুবিধে নেই। কিন্তু পাঁচ-ছটা গ্রামের অনাত্মীয় পুরুষ হলে বেশ অসুবিধা। স্বামীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিয়ে আলোচনা হবে। এক পরিবারের হলে বড় ভাই শ্রেষ্ঠ। তা না হলে বিচারে শ্রেষ্ঠ পুরুষই সরকারী ভাবে বাপ হবার সম্মান পাবে। কিন্তু নিজেদের মধ্যেই স্থির করলে হবে না, একটা উৎসব করে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে। অমাবস্যার আগের রাতে সেই পুরুষটি তার স্ত্রীকে নিয়ে বনে চলে যাবে। একটা গাছের কোটরে জ্বেলে দেবে একটি প্রদীপ। তারপর সেই পুরুষটি কাঠ আর লতাপাতা দিয়ে একটি ছোট তীর ধনুক তৈরি করে বউকে উপহার দেবে। আত্মীয়-স্বজনরা দুজনকে ঘিরে থাকবে। প্রদীপটি না নেবা পর্যন্ত তারাও থাকবে সেই বনে। পরদিন দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রী ঘরে ফিরলে হবে একটা বিরাট ভোজ।

মিস্টার সোমান্না হাসতে হাসতেই বললেন ঃ এর পর থেকে সেই মেয়ের যত ছেলে মেয়ে হবে, এই পুরুষটি হবে তাদের সবার সরকারী বাপ।

একখানা বিলেতী বইয়ে আমিও এ গল্প পড়েছিলুম। তবু তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য বললুম ঃ এই উৎসবটি না হলে ?

ভদ্রলোক বললেন ঃ সে ভীষণ কেলেঙ্কারির কথা। সাত মাসে এই অনুষ্ঠান হয়। দেরি হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু না হলে সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না।

মিসেস সোমান্নাও হাসতে হাসতে আমাদের কাছে চলে এলেন।

বললেন : আর দেরি করা ঠিক হবে না।

কেন?

চাঙ্গাপ্পা আমাদের দেখতে না পেলে কুরুক্ষেত্র বাধাবে।

মিস্টার সোমান্না বললেন : দেখতে না পেয়ে চলে গেলেও হবে বিপদ।

এবারেও আমি বললুম : কেন?

বলেছি তো, মার্কারায় পৌঁছে যদি দেখে যে আমরা এই পথে এসেছি, তাহলে ও আবার আমাদের এখানে ফিরিয়ে আনবে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে।

বলে হাসতে লাগলেন।

আমি দেখলুম যে আমার চেনা-চেনা মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেছে অ... অন্য মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আ... মনোযোগ দিয়ে দেখছে আমাদের।

মিসেস সোমান্নাকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আচ্ছা, আমরা কি কুরুক্ষেত্র বাধাতে পারি না?

আমরা!

দু চোখ বিস্ফারিত করে ভদ্রমহিলা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : আমরাও তো বলতে পারি যে তাদের জন্যে আমরা কত সময় এখানে অপেক্ষা করছি!

মিস্টার সোমান্না গম্ভীর ভাবে বললেন : তাহলে বিনামেঘে বজ্রপাত হবে।

মানে?

...নে পাল্টা আক্রমণ না করলে যুদ্ধ থামবার আশা আছে, আ... া করলে আর রক্ষা নেই। এক বজ্রাঘাতেই শত্রু নিপাত।

...ন হাসতে লাগলেন।

আর ঠিক এই সময়ে একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে আমরা চমকে

উঠলুম। তাকিয়ে দেখলুম যে সেই টোড়া বৃদ্ধটি তার লাঠিতে ভর করে আমাদের কাছে এসেছে, আর কথা কইছে সেই মেয়েটির সঙ্গে।

মিসেস সোমান্না বললেন: কী ব্যাপার?

মেয়েটির উত্তর শুনে আশ্চর্য হলুম। একটি বিচিত্র ভাষা। ইংরেজী শব্দ দু-একটা আছে বলে বুঝতে পারলুম যে বৃদ্ধটি আমাদের সম্বন্ধেই কিছু জানতে চাইছে—আমরা কে, কেন এসেছি এখানে, কোন কাজ আছে কি কারও সঙ্গে—এই সব। মেয়েটি হাসতে হাসতেই তাকে সব বুঝিয়ে দিল নিজেদের ভাষায়। তারপরে বুড়োর পরবর্তী কথা শোনাল আমাদের। বুড়ো বলছে, কিছু না খাইয়ে অতিথিদের ছেড়ে দিও না। ঘরে নিয়ে বসাও, খেতে দাও কিছু।

মিসেস সোমান্না এই ঘরে বসার নামে যেন আঁৎকে উঠলেন। বললেন: না না, আমাদের খুব তাড়া আছে, এখুনি যেতে হবে আমাদের।

মেয়েটি বলল: তা তো সম্ভব নয়, এঁর আদেশ আমরা অমান্য করতে পারব না।

তবে?

বলে করুণ চোখে মিসেস সোমান্না তাঁর স্বামীর দিকে তাকালেন।

মিস্টার সোমান্নাকেও উদ্বিগ্ন দেখলুম। আমার দিকে চেয়ে বললেন: আপত্তি করলে কোন বিপদ হবে না তো!

বললুম: আপত্তি করার দরকার কী! দেখি না এদের আতিথ্য কী রকম!

বলেন কি!

বলে মিস্টার সোমান্না আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: মিনিট কয়েক বসব। আর—

যদি তেমন কিছু খেতে দেয়?

মানুষের খাদ্যই তো দেবে!

মেয়েটি আমাদের কথা শুনছিল সকৌতুকে, আর হাসছিল।

মিস্টার সোমান্না বললেন: তার চেয়ে—

ভয়ে ভয়ে মিসেস সোমান্না বললেন: যদি—

আমি সাহস দিয়ে বললুম: ব্যাপারটা দেখাই যাক না!

টোডা মেয়েটি হেসে বলল: আসুন।

ঐ কুঁড়ের মধ্যে ঢুকতে হবে নাকি?

মিসেস সোমান্না আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

ভয় কিসের!

বলে মেয়েটি এগিয়ে গেল।

কিন্তু সেই কুঁড়ে ঘরের দিকে না এগিয়ে এগোল অন্য দিকে। সেদিকে ছোট বড় বাড়ি আছে কয়েকটা। ইঁটের একতলা বাড়ি, তার বারান্দায় কয়েকটা মোড়া পাতা আছে। টোডা মেয়েটি পিছন ফিরে বলল: ওদিকে ভয় থাকলে তোমরা এদিকে এসো।

মিসেস সোমান্না তখন চারি ধারে চেয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন: সে মেয়েটি কোথায় গেল বলুন তো!

কোন্ মেয়েটি?

বলে মিস্টার সোমান্না তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

মিসেস সোমান্না বললেন: আরে, আমাদের সঙ্গী মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করছি। আমাদের পৌঁছে দিয়ে সে গেল কোথায়? তার কোন বদ মতলব নেই তো?

মিস্টার সোমান্না বোধহয় একটু ভয় পেলেন। বললেন: একে জিজ্ঞেস কর না!

কার কথা?

বলে টোডা মেয়েটি আমাদের দিকে চাইল।

মিসেস সোমান্না বললেন: একটি অন্ধকার মেয়ে আমাদের এখানে এসেছিল, কিন্তু তাকে আর দেখতে পাচ্ছি না!

তাই নাকি !

বলে সে ছোট ছেলেমেয়েদের ইশারায় কিছু বলল। তারা এক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বারান্দায় উঠে মেয়েটি আমাদের মোড়ায় বসিয়ে ভিতরে চলে গেল।

মিসেস সোমান্না ভয়ে ভয়ে বললেন : ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না।

মিস্টার সোমান্না গম্ভীর হয়ে গেছেন। কোন কথা কইলেন না।

আমি বললুম : দেখাই যাক না !

মিস্টার সোমান্না বললেন : তিব্বতীদের কথা শুনেছি। ওরা যে চা খায়, তা মুখে দিলেই বমি হয়ে যায়। আর বমি হয়ে গেলে রক্ষে নেই, পেটের ভেতর ছুরি ঢুকিয়ে দেয় তক্ষুণি।

আমি বললুম : এদের তো হিংস্র বলে মোটেই মনে হচ্ছে না ! বেশ হাসি-খুশি এরা। সব কথাতেই মাথা নেড়ে হাসছে।

মিস্টার সোমান্না বললেন : প্রথমটায় এই রকমই মনে হয়। পরে বোঝা যায়, ঐ মাথা নেড়ে হাসির অর্থ কী !

মিসেস সোমান্না বললেন : তাহলে এই সুযোগে—

বলে উঠবার চেষ্টা করতেই একটি বাচ্চা মেয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল : তোমরা আরশোলা খাও ? ককরোচ ?

আরশোলা !

বলে ভয়ার্ত চোখে মিসেস সোমান্না আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি উত্তর দিলুম : না।

এবারে একটি ছেলে বেরিয়ে এসে বলল : টিকটিকি ? লিজার্ড ?

এবারে মিস্টার সোমান্না গম্ভীর স্বরে বললেন : না।

তারপরে আর একটি মেয়ে এল প্রশ্ন করতে : বকের শুকনো মাংস খাও তো ?

আমি বললুম : আমরা ওসব কিছুই খাব না।

সে কি! তোমরা তো সব রকম পশু পাখির মাংস খাও শুনেছি!

কিন্তু এ কথার উত্তর দেবার আগেই একটি বালক একটা টেবল এনে আমাদের সামনে রাখল। তার পিছনেই এল সেই টোডা মেয়েটি, তার হাতে একটা ট্রে। টেবলের উপরে সেই ট্রে নামাতেই দেখলুম যে কফি এসেছে তিনটি পেয়ালায়, আর কয়েক পিস কেক।

সোমান্নারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। আর আমি হাসলুম খানিকটা।

কফির পেয়ালা আমরা তুলে নিয়েছিলুম। কিন্তু কেকের প্লেটের দিকে হাত বাড়াতে সাহস পাই নি। মেয়েটি হেসে বলল : ভয় নেই, এই কেকই বাজারে বিক্রি হয়।

বাড়ির কেক সে বলল না, বলল বাজারের কেক। এই কেক কি এদের বাড়িতে তৈরি হয়ে বাজারে বিক্রি হয়!

চারি দিকে আমি চেয়ে দেখতে লাগলুম। বেশ একটা সন্দেহ-জনক পরিবেশ। টোডা মেয়েটি কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে। আমাদের দেখে আনন্দ পাচ্ছে এই ছেলেমেয়ের দল। এরা কি টোডা নয়! এরা কি ঐ পুরনো কুঁড়ে থেকে এই সব পাকা বাড়িতে উঠে আসছে না! এরা কি আমাদেরই অজ্ঞতা দেখে এই ভাবে হাসছে না!

একখানা কেক তুলে আমি মুখে দিলুম। বেশ তাজা সুস্বাদু কেক। কিন্তু সোমান্না দম্পতি তা পারলেন না। বললেন : আমরা ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়েছি।

৭

ট্যাক্সির কাছে ফিরে এসে আমাদের বিস্ময়ের যেন সীমা রইল না। আমাদের সঙ্গী মেয়েটি পথের উপরে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে গল্প করছে।, তার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন একটা সন্দেহ হল আমার। কিন্তু না, এই মেয়েটির প্রসাধন বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মুখে পাউডারের প্রলেপ আছে, আর ঠোঁটে লিপস্টিক। মাথার চুল বেশ পরিপাটি। দেহের সৌরভও আসছে অল্প অল্প। আগে লক্ষ্য না করলেও এখন দেখতে পাচ্ছি যে মেয়েটি বেশ শৌখিন।

মিসেস সোমান্না তাঁকে আক্রমণ করলেন: কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

মেয়েটি হেসে বলল: এইখেনেই।

আমাদের সঙ্গে রইলেন না কেন?

আমি সঙ্গে থাকলে আপনাদের অভিজ্ঞতা অন্যরকম হত, মানে, আমি যা বোঝাতাম, তাই বুঝতেন আপনারা। নিজের চোখে দেখে বোঝাই ভাল।

মিসেস সোমান্না এ কথা মেনে নিতে পারলেন না, বললেন: আপনি কাছে থাকলে এরকম বিপদে পড়তাম না।

বিপদে পড়েছিলেন বুঝি!

বিপদ নয়! উঃ, খুব বেঁচে গেছি এ যাত্রায়!

এর বেশি মিসেস সোমান্না আর কিছু বলতে পারলেন না।

আমরা গাড়িতে উঠে বসলুম। ছোট ছেলেমেয়েরাও বেরিয়ে এসেছিল। হাত নেড়ে টা-টা বলে তারা আমাদের বিদায় দিল।

এবারেও আমাদের সঙ্গী মেয়েটি ড্রাইভারের পাশে বসেছিল, আর আমি বসেছিলুম মিস্টার সোমান্নার পাশে। গাড়ি ছাড়বার

পরেই তিনি বললেন : এরা খাঁটি টোডা নয়, বুঝলেন! আসল টোডা দেখতে হলে আপনাকে মুকুর্টি পাহাড়ে যেতে হবে। বিরাট গ্রাম, বহু টোডার বাস। আর ঐ পাহাড়ের চূড়াই হল তাদের তীর্থস্থান।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আপনি গিয়েছেন সেখানে ?

না। তবে শুনেছি অনেক কথা। তোমার মনে নেই ?

বলে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

মিসেস সোমান্না বললেন : সে তো খুব ভয়ের কথা।

তাঁর স্ত্রীর মনে আছে দেখে মিস্টার সোমান্না খুশী হয়ে বললেন : সেবারে আমাদের এক বন্ধু মুকুর্টি পাহাড়ে গিয়েছিল টোডাদের বস্তি দেখতে। সে এক অমানুষিক দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। আর নিজেও পড়েছিল বিষম বিপদে।

কী রকম ?

বলে আমি কৌতূহল প্রকাশ করলুম। আর সামনে থেকে মেয়েটিও ফিরে তাকাল।

মিস্টার সোমান্না বললেন : ভারি ইণ্টারেস্টিং সেই গল্প। নেহাৎ ভাগ্যের জোরে সেই ভদ্রলোক ফিরে আসতে পেরেছিলেন।

ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আফ্রিকার জঙ্গলের মতো ব্যাপার নাকি ?

মিস্টার সোমান্না বললেন : না না, সেরকম মানুষখেকো ওরা নয়।

তবে ?

কিন্তু শান্তশিষ্ট হলে হবে কি, মন্ত্রে-তন্ত্রে এমন এক্সপার্ট যে—

মিসেস সোমান্নাকে কেঁপে উঠতে দেখে ভদ্রলোক থেমে গেলেন। তারপর বললেন : প্রথম থেকেই বলছি আপনাকে।

মিসেস সোমান্না বললেন : আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে।

কেন ?

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রমহিলা বললেন : এ গল্পটা আমার একেবারে মনে ছিল না। তাহলে আমি কিছুতেই ওখানে যেতাম না।

এবারে ভদ্রলোকও একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন : ভয় কিসের !

কেন, দেখতে পাওনি ! সেই বুড়োটা কেমন ভাবে তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে ! আর মেয়ে দুটোর চোখও কেমন যেন—

আমি মিসেস সোমান্নার মুখের আতঙ্ক দেখবার পর সামনের মেয়েটির দিকে তাকালুম। মনে হল, তার দু চোখে কৌতুক যেন আর ধরছে না ! বলল : আপনার বন্ধুর সেই গল্পটা বলুন না !

মিস্টার সোমান্না বললেন : আপনি তো উটিতে থাকেন. মকুর্টি পাহাড়ে কোনদিন যান নি ?

যাব একদিন :

বলে মেয়েটি গল্প শোনবার জন্যে পিছনে চেয়ে রইল

মিস্টার সোমান্না বললেন : টোডা দেখবার জন্যেই আমার বন্ধু গিয়েছিল মুকুর্টি পাহাড়ে। খানিক ওপরে উঠেই ও বাজনা-বাদ্যির শব্দ পেল। তখনই তার নেমে আসা অবশ্যই উচিত ছিল। কিন্তু কোডাভাদের জানেন তো ! বীরের জাত। অসম সাহসী বীর তারা। ভয় বলে কিছু জানে না। তাই ঐ বাজনা শুনে ভয় না পেয়ে খুশী হল বেশি। ভাবল, টোডা দেখতে এসে তাদের কোন উৎসব দেখতে পাবে। তাই আরও তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে লাগল।

উপরে উঠে ভদ্রলোক কী দেখলেন, সেই কথা শোনবার জন্যে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলুম। মিস্টার সোমান্না বললেন : আমার বন্ধু কিছুটা বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল। মানে, হুপ করে তাদের কাছে না গিয়ে দূর থেকে তাদের দেখবার চেষ্টা করেছিল। আর তাইতেই ব্যাপারটা দেখতে পেল।

কী দেখল ?

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম.

ভদ্রলোক বললেন : সে প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। একটা

লোককে ঘিরে নাচগান হচ্ছিল। হঠাৎ দেখল যে সে লোকটা আর নেই। তার বদলে—

তার বদলে!

প্রশ্নটা করেই আমি মিসেস সোমান্নার দিকে তাকালুম। দেখলুম, তিনি ভয়ে তাঁর দু চোখ বন্ধ করে আছেন।

মিস্টার সোমান্না বললেন: একটা বাফেলো, মানে মোষ।

সামনের মেয়েটির মুখে রক্ত যেন ফেটে পড়ছিল। মনে হল যে সে হাসি চাপবার জন্যে প্রবল চেষ্টা করছে। আমিও ঠিক বিশ্বাস করতে না পেরে বললুম: এ একেবারে আজগুবি কথা।

আজগুবি কথা!

মিস্টার সোমান্না বুঝি আমার ওপরে রেগে গেলেন। বললেন: দেখেন নি বলেই বলছেন। ওদের এক-একজনের কত মোষ আছে জানেন?

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলুম: আপনি কি বলতে চান যে ওরা মানুষ ধরে ধরে গরু মোষ বানায়!

মিস্টার সোমান্না বললেন: তা না হলে ওদের অত গরু মোষ আসে কোথা থেকে!

সামনের মেয়েটি আর হাসি চেপে রাখতে পারল না, খিল খিল করে হেসে উঠল। কিন্তু কোন মন্তব্য করল না।

এই মেয়েটির হাসিতে আমিই যেন লজ্জা পেয়ে গেলুম। বললুম: এ সব কথায় আপনারা বিশ্বাস করেন!

পুরুষ মানুষকে আমরা সাধারণত সংস্কারমুক্ত বলেই ভাবি। কাজেই মিস্টার সোমান্নার কুসংস্কার যেন সমস্ত পুরুষ জাতিকেই লজ্জা দিয়েছে, আর সামনের মেয়েটি যেন সকৌতুকে পরিহাস করছে পুরুষদের। তাই মিস্টার সোমান্না যদি বিশ্বাস করেন না বলতেন, তাহলেই আমি খুশী হতুম। কিছু না বললেও বোধহয় ভাল লাগত। কিন্তু ভদ্রলোক অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন: এই আদিবাসীদের

আপনারা জানেন না বলেই এ রকম ভাবছেন। আসলে—

সামনের মেয়েটি তখনও হাসছিল। আর তার দিকে চেয়েই ভদ্রলোক যেন খানিকটা অপ্রতিভ হলেন। বললেন: আসলে আমার এক সাহসী বন্ধু স্বচক্ষে দেখেছে বলেই বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য হয়েছি।

আমরা তখন শহরের মধ্যে আবার ফিরে এসেছি। ইচ্ছা করলে স্টেশনের দিকে যেতে পারতুম। কিন্তু ড্রাইভারকে কিছু বলা হয় নি বলে সে আমাদের বটানিকাল গার্ডেনের দিকে নিয়ে চলল। আর সামনের মেয়েটিকে তো সেখানেই নামিয়ে দিতে হবে! কাজেই এখন অন্যত্র যাবার কথাই ওঠে না।

ভদ্রলোক কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন: তারপরে কী হল তাই বলি।

বুঝলুম যে তিনি আরও কিছু অবিশ্বাস্য কথা বলবেন। তবু বললুম: বলুন।

ভদ্রলোক বললেন: আমার বন্ধুটি ভেবেছিল, আর এগিয়ে কাজ নেই, মানুষ থাকতে হলে চুপি চুপি পালানোই উচিত। এই ভেবে যেই পিছু হটতে যাবে, অমনি শুনতে পেল একজনের কথা। একেবারে তার গায়ের কাছ থেকেই কেউ যেন কথা বলে উঠল। আর সেই কথা শুনে বন্ধুর তো হৃৎকম্প উপস্থিত হল।

কী কথা?

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক বললেন: সে কথা কি আর সে বুঝতে পেরেছিল! কিন্তু তাকে যে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল, তা বুঝতে পেরেই চোঁ-চাঁ

মেয়েটি তখনও হাসছিল। কেন জানি না, আমিও হেসে ফেললুম।

কিন্তু মিস্টার সোমান্না রেগে গিয়ে বললেন: এই আপনাদের দোষ। কিছু না বুঝেই হাসেন!

মিসেস সোমান্না এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। এইবারে বললেন: ভগবান আজ আমাদের খুব রক্ষা করেছেন। সেরকম কিছু ঘটলে—

এইটুকু বলেই ভয়ে তিনি চোখ বন্ধ করলেন। আর সামনের মেয়েটি আর একবার হেসে উঠল খিল খিল করে।

মিস্টার সোমান্নার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল যে তিনি মনে মনে বেশ চটে উঠেছেন। কিন্তু মুখে কোন কথা বললেন না।

দেখতে দেখতে আমরা বটানিকাল গার্ডেনে পৌঁছে গেলুম। যেখানে আমরা গাড়িতে উঠেছিলুম, ড্রাইভার ঠিক সেইখানেই এসে দাঁড়াল।

একজন সুবেশ সুশ্রী যুবক একটু ব্যস্ত ভাবে পায়চারি করছিল। মেয়েটি সামনে থেকে নেমে পড়েই তার কাছে ছুটে গেল। পরম কৌতুকে সে কী বলল, তা শুনতে পেলুম না। সেদিকে মন দেবারও অবকাশ ছিল না। ট্যাক্সির ভাড়া দেবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আমি হার মানলুম। মিস্টার সোমান্না আমার চেয়ে অনেক শক্তিমান পুরুষ। ঠেলে আমাকে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।

ততক্ষণে সেই যুবকের সঙ্গে মেয়েটি এগিয়ে এল। পরিচয় বিনিময় হল। ছেলেটি একটি সরকারী অফিসে ভাল কাজ করে। মেয়েটির বয়ফ্রেণ্ড বলে মনে হল। ছেলেটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল: আপনি কি এখানে বেড়াতে এসেছেন?

বললুম: হ্যাঁ।

কতদিন থাকবেন?

কিন্তু এ কথার উত্তর দেবার আগেই মিস্টার সোমান্না বললেন: আজই আমাদের সঙ্গে ফিরবেন।

ছেলেটি আপসোস করে বলল: ইস, এখানে একদিন থাকলে আপনাকে আজই মুকুর্টি পাহাড়ে নিয়ে যেতে পারতাম। খাঁটি টোডা দেখতে পেতেন সেখানে।

বললুম ঃ টোডাদের তো দেখেই এলুম !

সে বলল ঃ তারা কি আর টোডা ! শহরে থেকে বদলে গেছে।

মেয়েটি বলল ঃ এখান থেকে কোথায় যাবেন আপনারা ?

এবারেও উত্তর দিলেন মিস্টার সোমান্না। বললেন ঃ কুর্গে।

কুর্গ !

তুজনেই একসঙ্গে যেন চমকে উঠল।

আমি আরও আশ্চর্য হয়ে বললুম ঃ সে কি, চমকে উঠছেন কেন !

মেয়েটি বলল ঃ ভার হংস্র লোক কুর্গের কোডাভারা। সব সময়ে কোমরে একটা ছোরা গুঁজে রাখে। আর একটু অপছন্দের কথা শুনলেই—

বলে ভয়ে তু চোখ বন্ধ করে যেন দেবতাকে স্মরণ করল।

ছেলেটি বলল ঃ না না, যাবেন না সেখানে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। কুর্গে গিয়ে বেঘোরে প্রাণটা হারাবেন না।

মিস্টার ও মিসেস সোমান্নার মুখের দিকে চেয়ে আমার হাসি পেল। তাঁরা বেশ উপভোগ করছিলেন এই গল্প। মিস্টার সোমান্না বললেন ঃ আর কী করে তারা ?

মেয়েটি বলল ঃ শুনেছি, বিদেশীদের নানারকম খেলা দেখাতে নিয়ে যায়। কোন গাছের উঁচু ডালে একটা নারকেল টাঙিয়ে তীর ছুঁড়ে সেটাকে বিদ্ধ করে। তু-তিনবারে পারল না দেখে যদি সেই বিদেশী হেসে ফেলে, তাহলেই সর্বনাশ ! পরের তীরটা তাহলে তাকেই লক্ষ্য করে ছুঁড়বে।

সত্যি !

বলে আমি ভয় পাবার ভান করলুম।

মিস্টার সোমান্না হেসে বললেন ঃ যত সব পাগলের কথা !

ছেলেটি বলে উঠল ঃ না না, পাগলের কথা নয়। আমাদের এক বন্ধু স্বচক্ষে দেখে এসেছে। কী বীভৎস সেই দৃশ্য ! বুকে তীর লেগে

ছটফট করতে করতে লোকটা মরে গেল।

মেয়েটি বলল : শহরের পথে ঘাটে দেখবেন, বন্দুক কাঁধে করে চলেছে কোডাভারা। কথায় কথায় বন্দুক উঁচিয়ে বলে, হ্যাণ্ড্স্ আপ! আর হাত তুলতে একটু দেরি হলেই গুড়ুম!

মিস্টার সোমান্না এবারে রেগে গিয়ে বললেন : যত সব! চলে আসুন আমার সঙ্গে।

বলে ট্যাক্সির ড্রাইভারকে ডেকে বললেন : স্টেশনে পৌঁছে দেবে?

কিন্তু তার উত্তর শোনবার আগেই একটা কোলাহল শুনতে পেলুম। হৈ হৈ করে উঠল ছেলে মেয়ে দুটি। আর সেই দিকে ফিরেই দেখতে পেলুম যে একটি রঙীন ছাতা মাথায় দিয়ে যেন নাচতে নাচতে একটি মেয়ে আসছে বাগানের উল্টো দিকের পাহাড় থেকে। আমাদের সঙ্গী মেয়েটি ছুটে গেল তাকে আনবার জন্যে।

আমি দেখলুম যে এই নতুন মেয়েটির শাড়ি পরার ধরনটি ঠিক ভারতীয় মেয়ের মতো নয়। এ রকম শাড়ি-পরা মেয়ের ছবি আমি একখানা বিলিতী বই-এ দেখেছি। একটি টোডা মেয়ের ছবি। কৌতূহল নিয়ে আমি তাদের দিকে এগিয়ে গেলুম। আর আশ্চর্য হলুম তাকে দেখে। এ মেয়েটিও যেন চেনা চেনা বলে মনে হল।

তারপরেই মেয়ে দুটি হাত ধরাধরি করে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল : চিনতে পারছেন আমাদের?

মিস্টার ও মিসেস সোমান্না স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর আমি বললুম : চেনা চেনা বলেই তো মনে হচ্ছে।

সহাস্যে ছেলেটি বলল : এরা দুই বোন, জাতে টোডা।

বড় মেয়েটি বলল : নিজের পরিচয় দিলে না?

আমিও তাই। মুকুর্টি পাহাড়ে আমাদের বাড়ি।

বলে ছেলেটি হাসল।

মিস্টার সোমান্না কোন কথা বলতে পারলেন না। মিসেস

সোমান্নাও রইলেন নীরবে। কিন্তু আমার কোন লজ্জা হল না। বললুম : নিজেদের বাড়িতে আপনারা খুব ফাঁকি দিয়েছেন আমাদের। আমার কিন্তু--

বড় মেয়েটি বলল : আপনার চোখে আমি সন্দেহ দেখেছিলাম। আর সেই জন্যেই পালিয়ে গিয়েছিলাম।

মনের আনন্দে আমরা হেসে নিলুম খানিকক্ষণ। কিন্তু মিস্টার ও মিসেস সোমান্না এই হাসিতে যোগ দিতে পারলেন না।

উটির আকাশ এখনও পরিষ্কার আছে। আর চারিদিক ঝলমল করছে উজ্জ্বল আলোয়।

৮

মিস্টার সোমান্না গম্ভীর স্বরে বললেন : এখানে আর সময় নষ্ট করবেন না, চলে আস্থন।

বলে বটানিকাল গার্ডেন থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে মিসেস সোমান্নার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলেন। যে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে তিনি ডেকেছিলেন, সে বোধহয় শোনে নি, কিংবা বুঝতে পারে নি। তাই বেরিয়ে গিয়েছিল। আমাদের তাই পায়ে হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

আমি কাছে আসতেই মিস্টার সোমান্না বললেন : আপনি বোধহয় এদের চিনতে পারেন নি, এরা আদৌ টোডা নয়। আমাদের সঙ্গে একটু রসিকতা করল।

আমি বললুম : পাহাড়ী পরিহাস!

মিস্টার সোমান্না বললেন : পাহাড়ী বলবেন না, আমরাও তো পাহাড়ী লোক, কিন্তু এ রকম করি না। এটা বুনো পরিহাস। একেবারে বন্য, অসভ্য।

মিসেস সোমান্না একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন : এইবারে শক্ত পাল্লায় পড়বেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : শক্ত পাল্লায় মানে? আপনি কি মিস্টার চাঙ্গাপ্পার কথা বলছেন?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা নয়, মিসেস চাঙ্গাপ্পা। তাঁর নাম মুক্তা না হয়ে শক্ত হলেই ভাল হত। শক্তাউয়া চাঙ্গাপ্পা।

বলে মিস্টার সোমান্না প্রবল কণ্ঠে হেসে উঠে আবহাওয়াটা তরল করবার চেষ্টা করলেন।

মিসেস সোমান্না বললেনঃ মহিলাদের সম্মান রেখে কথা বোলো।

কিন্তু এ কথার উত্তর না দিয়ে মিস্টার সোমান্না আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনাদের বাঙলায় শক্ত মানে তো কড়া, তাই না?

আমি বললুমঃ আপনি জানলেন কী করে?

ভদ্রলোক বললেনঃ আপনিই তো আমাদের প্রথম বাঙালী বন্ধু নন, আরও অনেক আছেন। তাঁরা নিজেরা নরম বলে অন্যকে বলেন শক্ত লোক।

'শক্ত লোক' কথাটা বাঙলায় বলে হাসতে লাগলেন।

আমি বললুমঃ শক্ত কথাটা হিন্দীতেও বলে। শক্ত না বলে তারা বলে শখ্‌ৎ, বহুৎ শখ্‌ৎ আদ্‌মি।

মিস্টার সোমান্না বললেনঃ খুব ঠিক কথা। মুক্কাউয়াকে এই জন্যেই আমি শক্কাউয়া বলি। আর চাঙ্গাপ্পাও যদি বিয়ের আগে জানত যে মুক্কাম্মা আসলে শক্কাম্মা, তাহলে বোধহয় প্রেমের ব্যাপারে নিজে থেকে এগোত না!

এই রসিকতা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। মুক্কাউয়া বা শক্কাউয়া হঠাৎ মুক্কাম্মা বা শক্কাম্মা হল কী করে, আমার কাছে তা রহস্যময় হয়ে উঠল।

মিস্টার সোমান্না নিজের কৌতুক উপভোগ করে বললেনঃ ব্যাপারটা তাহলে আপনাকে বুঝিয়েই বলি।

বললুমঃ খুশী হব বুঝতে পারলে।

ভদ্রলোক বললেনঃ এই যে মহিলা এখন আমাদের সঙ্গে চলেছেন, এঁর আসল নাম হল সীতা। কিন্তু শুধু সীতা বলে আপনি তাঁকে অপমান করতে পারেন না। আপনাকে এঁর পেছনে একটা লেজুড় জুড়ে দিতে হবে।

মিসেস সোমান্না বললেনঃ একটু ভদ্রভাবে বল।

মিস্টার সোমান্না বললেনঃ লেজুড় মানে বোঝেন তো!

বললুম ঃ না।

এই লেজুড় মানে মহিলাদের সামাজিক পরিচয়। বিয়ের আগে ইনি ছিলেন সীতাম্মা, বিয়ের পরে হয়েছেন সীতাউয়া। তা হলেই বুঝুন। আমি বলতে চেয়েছি যে চাঙ্গাপ্পা প্রেম করত মুক্তাম্মার সঙ্গে। বিয়ে করে মুক্তাম্মা মুক্তাউয়া হয়েছেন। চাঙ্গাপ্পা যদি ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারত যে মুক্তাম্মা আসলে শক্তাম্মা, তাহলে কি সে এতটা এগোতে সাহস পেত!

আমি হেসে বললুম ঃ মুক্তা এই রকমই হয়। তার বাইরেটা দেখতে বেশ মোলায়েম, কিন্তু ভেতরটা বড় শক্ত। জোর করলে ভেঙে যায়, কিন্তু নরম হয় না।

সোমান্না সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ সাধে কি বলি বাঙালীরা কবির জাত! কবি না হলে এমন সুন্দর কথা কেউ বলতে পারে! তাই না সীতা!

সীতাউয়া সকৌতুকে বললেন ঃ মুক্তাকে আমি বলে দেব।

অপরিসীম আতঙ্কের ভান করে মিস্টার সোমান্না বললেন ঃ খবরদার! আমার সর্বনাশ তুমি কোরো না!

তারপরেই বললেন ঃ তবে একটা কাজ করতে পার।

কী কাজ?

বলে সীতাউয়া তাঁর স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন।

মিস্টার সোমান্না বললেন ঃ চাঙ্গাপ্পাকে আড়ালে ডেকে তুমি তাঁর স্ত্রীর নামটা পালটে নেবার কথা সাজেস্ট করতে পার।

সীতাউয়া হাসতে হাসতে বললেন ঃ তাহলে তো আমার নামটা তোমার আগে পালটাতে হয়। নাম আমার সীতা বলে তুমি ভেব না যে আমি তোমার সঙ্গে বনবাসে যাব। শহরেও বোধহয় বেশি দিন একত্রে বাস করতে পারব না।

মিস্টার সোমান্না বেশ রসিক লোক, বললেন ঃ তোমার নাম পালটাবার ব্যাপারটা কোন সমস্যাই নয়।

কেন ?

মিস্টার সোমান্না তৎপর ভাবে বললেন : সীতা নাম পালটে উর্মিলা রাখলেই চলবে। উর্মিলা তো লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে যান নি, শহরেও বোধহয় সংসার করেন নি।

মানে !

মানে খুব সোজা। কবি বাল্মীকি বনবাসী সীতারও দুটি সন্তানের নাম লিখেছিলেন, কিন্তু উর্মিলার কোন সন্তানের নাম আমাদের জানা নেই।

সীতাউয়া বললেন : তোমার জানা নেই বলে তো প্রমাণ হয় না যে তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

আমি তখন আশ্চর্য হচ্ছিলুম এই ভেবে যে এত বড় একটা দেশের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে অরণ্যময় দেশের অধিবাসীরাও রামায়ণ পড়েছে আমাদেরই মতো। কি আশ্চর্য জনপ্রিয়তা এই কাব্যের ! কয়েক হাজার বছর আগে লেখা এই কাব্যের মতো আর কিছু তো এ যুগে রচিত হল না !

স্টেশনের দিকে চলতে চলতে আমি বললুম : এবারে আপনি কোডাভাদের সম্বন্ধে কিছু বলুন।

মিস্টার সোমান্না আশ্চর্য হবার ভান করে বললেন : কোডাভাদের সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন না ! কোডাভারা আপনাদের দু-দুজন প্রধান সেনাপতি উপহার দিয়েছেন, আর ছোটখাটো অনেক সেনাপতি।

বলে সকৌতুকে বললেন : আমরাই হচ্ছি কুর্গের সেই বিখ্যাত কোডাভা জাতির প্রতিনিধি। এই যে আমার গোঁফজোড়া দেখছেন, এ সেই গৌরবের বারতা বহন করছে।

আমিও সকৌতুকে বললুম : তবে আপনার কোমরে ছোরা আর হাতে বন্দুক কই ?

মিস্টার সোমান্না বললেন : দেখবেন, মার্কারায় পৌঁছে তাও দেখবেন, সেটা আমাদের সেরিমোনিয়াল ড্রেস।

তাহলে আপনিও সেনাদলে আছেন!

মাথা নেড়ে মিস্টার সোমান্না বললেন: আজ্ঞে না। কুর্গের মেয়েরা আজকাল রক্তের চেয়ে লিপস্টিক বেশি পছন্দ করছেন বলে বাপ-পিতামহর পেশা পরিত্যাগ করেছি। আমি একটা বেসরকারী ফার্মের কস্‌মেটিকস্‌ বিক্রয় করি।

বললুম: মহিলা মনোরঞ্জনের এ একটি উত্তম পেশা। আমাদের সমস্ত পেশার শেষ লক্ষ্য তো একই। একদা মিজোরামের যুবকেরা প্রেয়সীর মনোরঞ্জনের জন্য পুরুষের মাথা কেটে আনত। এখন তারা গীটার বাজিয়ে ইংরেজী গান গাইছে।

মিস্টার সোমান্না বললেন: আপনি জ্ঞানী লোক। স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে মনুষ্য চরিত্রে আপনার অগাধ জ্ঞান। আপনাকে তাই আমাদের একটি বিতর্কের বিচারক হতে অনুরোধ করছি।

বললুম: বিতর্কটা বলুন।

চাঙ্গাপ্পারা কাল এল না কেন, এই নিয়েই বিতর্ক।

মিস্টার সোমান্নার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সীতাউয়া বললেন: আমি বলছি, চাঙ্গাপ্পা তার কাজে আটকা পড়েছিল।

মিস্টার সোমান্না বললেন: আর আমি বলছি, মিসেস চাঙ্গাপ্পা ঘুম থেকে উঠতে দেরি করেছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: বাজি কি রাখা হয়েছে?

বাজি!

হ্যাঁ, বাজি। বাজি না রাখলে কি এ রকম একটা গুরুতর বিতর্কের বিচার হয়!

মিস্টার সোমান্না বললেন: ঠিক আছে। হেরে গেলে আমি বিয়ের বাসরে মেয়ে সেজে নাচব।

সীতাউয়া বললেন: আগে ঐ গোঁফজোড়া কামাতে হবে।

মিস্টার সোমান্না কাচুমাচু হয়ে বললেন: গোঁফ! ওটা ঢাকলে চলবে না?

না।

আচ্ছা, তাই হবে। আর তোমাকে তোমার ঐ চুল আমার মতো করে ছেঁটে পুরুষ সেজে নাচতে হবে।

সীতাউয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললেন: আচ্ছা!

তখনই আমি দাঁড়িয়ে দুজনকেই রাস্তার ধারে টেনে আনলুম। আর পকেট থেকে একটা মুদ্রা বার করে বললুম: এইবারে বলুন, হেড না টেল!

মিস্টার সোমান্না বললেন: হেড।

আর সীতাউয়া বললেন: টেল।

মুদ্রাটি মাটিতে পড়তেই দুজনে ঝুপঝাপ করে বসে পড়লেন। আর সীতাউয়া চেঁচিয়ে উঠলেন: কামাও তোমার গোঁফ।

মিস্টার সোমান্না মুদ্রাটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন করুণ ভাবে। আমি তাঁর পিঠ ঠুকে দিয়ে বললুম: কুছ পরোয়া নেহি, আমি আপনার গোঁফ কামিয়ে দেব।

সীতাউয়া সোল্লাসে বললেন: সত্যিই আপনি খুব ভাল বিচারক।

মিস্টার সোমান্না এবারে গম্ভীর ভাবে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। বোধহয় নিজের গোঁফজোড়ার শোকে কাতর বোধ করছিলেন। হঠাৎ তিনি চিৎকার করে বললেন: আপনি ঠকিয়েছেন আমাকে!

আমি হেসে বললুম: আপনি তো নিজেই ঠকলেন!

সীতাউয়া আশ্চর্য হয়ে বললেন: মানে?

মিস্টার সোমান্না বললেন: আমাদের বিতর্কের বিষয় কী ছিল?

সীতাউয়া বললেন: হেড না টেল!

কখনও নয়। আমাদের বিতর্ক ছিল কাল চাঙ্গাপ্পারা আসে নি কেন? তাদের গুরুতর ব্যাপারটা কী ছিল? সেটা কি জানা গেছে যে আমি হেরে গেছি বলে আমাকে গোঁফ কামাতে হবে?

সীতাউয়া স্বীকার করলেন: সত্যিই তো!

তারপরে আমাকে বললেন: খুব ঠকিয়েছেন তো আমাদের!

আমি বোকার মতো বললুম: আপনারা নিজেরাই বাজি ধরলেন, নিজেরাই হারজিৎ স্বীকার করলেন। আমি তো শুধু—

বাধা দিয়ে মিস্টার সোমান্না বললেন: পেটে যে আপনার এত দুর্বুদ্ধি, আমরা তা বুঝব কী করে!

তারপরেই ঘড়ির দিকে চেয়ে তিনি বলে উঠলেন: চাঙ্গাপ্পা নিশ্চয়ই এতক্ষণ স্টেশনে এসে গেছে, আর আমাদের দেখতে না পেয়ে গালাগালি করছে।

আমি বললুম: বেলা তো এখনও বারোটা বাজে নি, কালিকট থেকে কি এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন!

কতক্ষণ আর সময় লাগবে! বাসে তো শুনেছি ঘণ্টা সাতেক সময় লাগে, আর বাস আসে থামতে থামতে।

সীতাউয়া বললেন: মুক্তা হয়তো শেষ রাতেই বেরিয়ে পড়বে। তা না হলে আজ রাতে আর মার্কারায় পৌঁছনো যাবে না।

কাজেই আমরা এবারে পা চালিয়ে ফিরতে লাগলুম।

চলতে চলতেই মিস্টার সোমান্না আমার একটা হাত ধরে রাস্তার এক ধারে টেনে আনলেন। বললেন: সামনের ঐ গাড়িটা লক্ষ্য করুন তো!

সীতাউয়া এই গাড়িটি দেখতে পেয়ে আগেই সরে এসেছিল। গাড়ির বেগ দেখে বলল: ওরাই আছে মনে হয়।

বলতে না বলতেই একখানা ঝকঝকে বিদেশী গাড়ি রাস্তার বাঁ ধারে ধ্যাঁস করে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে গাড়ির চালকের পাশ থেকে এক মহিলা বিদ্যুৎ বেগে নেমে এসে সীতাউয়ার হাত চেপে ধরলেন। তাঁর অনর্গল কথার ধরনে মনে হল যে সোমান্না দম্পতিকে তিনি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করছেন।

তাঁদের ভাষা বুঝি না বলে তাঁদের কথার মর্ম আমি কিছুই বুঝলুম না। কিন্তু মিস্টার সোমান্নার হাসিতে আমি আত্মপ্রসাদের লক্ষণ দেখতে পেলুম। এমন ভাবে আমার দিকে চাইলেন যে মনে হল তিনি বলতে চাইছেন, এই মহিলার সম্বন্ধে সব কথা ঠিক বলেছি কিনা দেখুন।

এর পরেই তিনি রাস্তার ওপারে গিয়ে গাড়ির চালককে কিছু বললেন। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ নেমে পড়লেন। আমার কাছে এসে করমর্দন করলেন আমার সঙ্গে। বললেন: আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন শুনে খুব খুশী হলাম।

আমি এ কথার মৃদু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু ভদ্রলোকের কথার তোড়ে তা ভেসে গেল। তিনি বলে বসলেন: উত্তর ভারতের লোক আমাদের দেশে বড় একটা আসেন না। অথচ মাইসোরের দশেরা দেখতে আসেন দলে দলে, আর বৃন্দাবনে ফোয়ারার বাতি দেখেই দেশে ফিরে যান। হাতের নাগালের মধ্যেই যে—

কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না, তাঁর সহধর্মিণীর কণ্ঠস্বরে সব চাপা পড়ে গেল। নিজের ভাষা ছেড়ে সেই মহিলা ইংরেজীতে বলে উঠলেন: তোমার কি ভব্যতা জ্ঞান কোন দিন হবে না! নিজেই কথা বলে যাচ্ছ, আমার সঙ্গে আগে পরিচয় করিয়ে দেবার কি দরকার নেই ভাবছ!

ভদ্রলোক কিন্তু রাগ করলেন না। শান্ত ভাবে বললেন: আগে আমার নিজের পরিচয়টা দেবার সুযোগ দাও। তারপর তো তোমার পরিচয়!

আমি বললুম: ওঁর পরিচয়েও আপনার পরিচয় দিতে পারেন। মহিলাদের সম্মানই তো বেশি!

ঠিক বলেছেন।

বলে ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে দেখিয়ে বললেন: ইনি হচ্ছেন

মুক্তাউয়া চাঙ্—খুড়ি, বিয়ের পর উনি চাঙ্গাপ্পা হয়েছেন। আর আমিই ওঁর বশংবদ স্বামী চাঙ্গাপ্পা।

একই সঙ্গে যোগ করলেন: প্রথম পক্ষের।

সোমান্না দম্পতি উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পা গম্ভীর ভাবে সবিনয়ে বললেন: আমার মাথার এই কাঁচা পাকা চুল দেখে ইনি আমাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষও ভাবতে পারেন কিনা!

তারপরে আমার দিকে চেয়ে বললেন: উনিও আমার প্রথম পক্ষেরই স্ত্রী।

আবার ছ্যাব্লামো।

বলে মুক্তাউয়া এক ধমক দিতেই মিস্টার চাঙ্গাপ্পা কাতর স্বরে বললেন: এই জন্যেই বলেছি। এই দাপট দেখে উনি নিশ্চয়ই ভুল বুঝবেন, তৃতীয় না হলেও দ্বিতীয় পক্ষের ব্যাপার। কিন্তু বিশ্বাস করবেন—

বলে আমার দিকে চেয়ে আরও গম্ভীর হয়ে বললেন: আমরা তুজনেই তুজনের প্রথম পক্ষ।

আমি তাঁর রসিকতায় খুব সাবধানে হাসলুম। কিন্তু সোমান্না দম্পতি হাসিতে আবার ভেঙে পড়লেন।

কিন্তু আশ্চর্য! মুক্তাউয়া মোটেই চটলেন না। আমাকে বললেন: এরা বীর পুরুষের জাত বলে সারাক্ষণ গর্ব করে। আর তু-চার পক্ষের কথাও বলে। সভ্য সমাজ তো দেখে নি কোন দিন, তাই এই সব অসভ্য রসিকতা।

আমি তাঁর এই মন্তব্য শুনে বিস্মিত হলুম। এই মহিলার নাম যে মুক্তাম্মা থেকে মুক্তাউয়া হয়েছে, একটু আগেই তা শুনেছি। তাই ইনিও যে কুর্গের মেয়ে তাতে আমার সন্দেহ নেই। তবু তিনি এ ধরনের একটা মন্তব্য কেন করলেন তা বুঝতে পারলুম না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমার মুখের দিকে চেয়েই ব্যাপারটা অনুমান

করতে পারলেন। বললেন: রাস্তায় দাঁড়িয়ে নয়, গাড়িতে বসুন। তারপর আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি।

ভদ্রলোকের গাড়ির ভিতরটা দেখে আমি কিছু হতাশ হলুম। বিরাট আকারের বিদেশী গাড়ি নয়। এই গাড়িতে এতগুলো মানুষ নিজেদের মালপত্র নিয়ে এত দূরের পথে কী ভাবে যেতে পারে, সেই সমস্যার কথা ভেবে দমে গেলুম। কিন্তু মুক্তাউয়া আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন: লজ্জা করছেন কেন! উঠে পড়ুন গাড়িতে।

বলে সবাইকে ঠেলে পিছনের সীটে তুলে দিয়ে নিজে সামনে স্বামীর পাশে উঠে বসলেন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা একটু এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু এ সময়টাও তিনি নীরবে ছিলেন না। বলছিলেন: একটা সত্যি কথা বল তো সোমান্না। স্টেশন থেকে বেরিয়ে তোমরা প্রথমে কোথায় গিয়েছিলে? লেকের ধারে, না অন্য কোথাও?

সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাউয়া বললেন: তুমি সত্যি কথা বল তো সীতা, তোমরা এখন বটানিকাল গার্ডেন থেকে ফুল দেখে ফিরছ কিনা!

আমি তৎপর ভাবে মিস্টার সোমান্নার হাতে একটা চাপ দিয়ে বললুম: না। এখানে কোন উত্তর নয়। আগে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব।

মিস্টার সোমান্না বললেন: সাইলেন্স সীতা। বাঙালী দাদার ওপরেই বিচারের ভার দিয়ে দাও। ওঁর অদ্ভুত দক্ষতা!

কিন্তু—

বাধা দিয়ে আমি বললুম: এইবারে মিসেস চাঙ্গাপ্পা বলুন, আপনি কী বলেছিলেন!

মুক্তাউয়া বললেন: আমি বলেছিলাম, ওরা যেমন ভীতু মানুষ, লেকের ধারে কাছে ওরা যাবে না।

আর মিস্টার চাঙ্গাপ্পা কী বলেছিলেন?

আমি বলেছিলাম, ওরা যেমন বেরসিক, ফুল দেখতে ওরা কিছুতেই যাবে না।

কিন্তু ওরা বটানিকাল গার্ডেনের দিক থেকেই আসছিল।

তার আগে ওরা লেকে গিয়েছিল।

সাইলেন্স!

বলে আমি দুজনকেই থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম: বাজি কী আছে?

বাজি!

হ্যাঁ, বাজি।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন, আর মুক্তাউয়া তাকালেন তাঁর স্বামীর দিকে। পিছন থেকে মিস্টার সোমান্না বলে উঠলেন: আমি বাজির শর্ত ঠিক করে দিচ্ছি। যে হারবে, তাকে বিয়ের আসরে নাচতে হবে—চাঙ্গাপ্পা মেয়ে সেজে আর মুক্তাউয়া পুরুষ সেজে।

সীতাউয়া বললেন: একজনকে গোঁফ কামাতে হবে, আর একজনকে ছেঁটে ফেলতে হবে চুল। রাজি?

দুজনের কেউই এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন না। মাথা নেড়ে বললেন: রাজি।

কিন্তু বিচারের রায় দেবার আগে আমি বললুম: আর একটা প্রশ্ন আছে।

দুজনেই একসঙ্গে বললেন: কী প্রশ্ন?

বললুম: কাল আপনারা আসেন নি কেন? মিস্টার চাঙ্গাপ্পার কাজ ছিল, না মিসেস চাঙ্গাপ্পার দেরিতে ঘুম ভেঙেছিল?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: আমার কোন কাজ ছিল না।

আর মিসেস চাঙ্গাপ্পা বললেন: আমিও দেরিতে উঠি নি।

তবে?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তাকালেন তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে। কিন্তু কোন

কথা বললেন না। মুক্তাউয়াও নীরবে রইলেন দেখে আমি বিচারের রায় ঘোষণা করলুম: সবাই হেরে গেছেন।

সবাই কী করে হারবে?

বললুম: বুঝিয়ে বলছি। আমরা বটানিকাল গার্ডেনে গিয়েছিলুম বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হেরেছেন, আর তার আগে আমরা লেকের ধারে গিয়েছিলুম বলে মিসেস চাঙ্গাপ্পাও হেরেছেন।

আমার বিচারের প্রতিবাদে দুজনেই জিতেছেন বলে দাবী করবার আগেই মিস্টার সোমান্না বলে উঠলেন: আপনিও হেরে গেছেন।

কেন?

মার্কারায় পৌঁছে এর জবাব দেব। আর কোন ওজর-আপত্তি চলবে না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: ঠিক কথা। চারজনের নাচ দেখবার জন্যেই আপনাকে যেতে হবে।

মুক্তাউয়া বললেন: আলবৎ যেতে হবে।

মিস্টার সোমান্না হেসে বললেন: আপনার ঋণ শোধ করে দিলাম।

৯

তখন আমরা স্টেশনের কাছাকাছি এসে গেছি। মিস্টার চাঙ্গাপ্পা ডান দিকে ফিরে স্টেশন এলাকায় ঢুকে পড়লেন।

আমি বিনীত ভাবে বললুম : উটিতে আমি বিশ্রাম করতে এসেছিলুম।

মুক্তাউয়া তখনই জবাব দিলেন : মার্কারায় আপনি বিশ্রাম করবেন।

আর—

আর কী ?

বললুম : উটির চার ধারটা একটু ঘুরে দেখতুম !

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : আপনি কি কুন্নুর কোটাগিরির কথা বলেছেন ?

সীতাউয়া বললেন : ইনি তো কুন্নুর থেকেই এসেছেন ; তবে কোটাগিরি বোধহয় এঁর দেখা হয় নি।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা এইবারে স্টেশনের গা ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললেন : বেশ তো, আপনার সমস্ত আপত্তির কথা আমরা মার্কারার পথে শুনে নেব।

বলে নিজেও সকলের সঙ্গে নেমে পড়লেন। আর আমি গাড়ি থেকে নামতেই খপ করে আমার হাত ধরে বললেন : চলুন, আপনার মালপত্র নিয়ে আসি।

এবারে আমি অন্য ধরনের আপত্তির কথা বললুম : এই ছোট গাড়িতে—

থামুন তো আপান !

বলে এক ধমকে মুক্তাউয়া আমাকে থামিয়ে দিলেন।

আর মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন ঃ চলুন আপনার কত বড় গাড়ি দরকার দেখে আসি। গাড়ির ওপরের কেরিয়ারে না ধরলে স্টেশনের ক্লোকরুমে আঁটবে কিনা বোঝা দরকার।

বলে আমায় টেনে নিয়ে চললেন।

উপায় না দেখে আমি করুণভাবে তাকালুম মিস্টার সোমান্নার দিকে। তিনি বললেম ঃ এরই নাম শক্ত পাল্লা।

বলে হাসতে লাগলেন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা নিজেই ডাকাডাকি করে কুলি যোগাড় করলেন। আমার হাত ছেড়ে দিয়ে সীতাউয়ার সঙ্গে রিটায়ারিং রুমে ঢুকে সবার মাল সংগ্রহ করে নিচে নামিয়ে আনলেন। আমার ব্রীফ কেসটা ছিল তাঁর হাতে। সেটা দেখিয়ে বললেন ঃ এর জন্যেই আপনি বড় গাড়ি খুঁজছিলেন !

বলে আমাদের জিনিসপত্র কিছু উপরের কেরিয়ারে আর কিছু বুটের ভিতরে অবলীলাক্রমে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর একখানা প্লাস্টিকের কাপড়ও বেঁধে দিলেন কেরিয়ারের মালপত্রের উপরে। পাহাড়ে বৃষ্টির কোন নিয়মকানুন নেই, তাই নিজেদের জিনিসপত্র এইভাবেই তাঁরা ঢেকে এনেছিলেন। তারপরে বললেন ঃ আপনি সামনে আমার সঙ্গে বসুন, আর সোমান্না মেয়েদের নিয়ে বসুক পেছনে।

ভদ্রলোকের আদেশ অমান্য করবার সাহস একমাত্র মুক্তাউয়াই রাখেন। আমার সে সাহস নেই বলে আমি ইতস্তত করছিলুম। ভদ্রলোক বললেন ঃ আপনার ভালোর জন্যেই এই ব্যবস্থা করছি। এতে আপনি আরামও পাবেন, প্রাণেও বাঁচবেন।

মানে ?

মানে বুঝতে পারলেম না ! পেছনে বসলে আপনাকে পা গুটিয়ে বসতে হত। সামনে পা ছড়াবার জায়গা পাবেন। আর—

আড়চোখে মেয়েদের দিকে চেয়ে গলা নামিয়ে বললেন ঃ খেতে

আজ দেরি হবে তো! মহিলারা পথে আপনাকে খেয়ে ফেলবার সুযোগ পাবে না!

এ কথা শুনতে পেয়ে মিস্টার সোমান্না আর্তনাদ করে উঠলেন: আমার কি সে ভয় নেই?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা গম্ভীর ভাবে বললেন: নেই, তা বলব না। বেহিসেবীর মতো কাজ করলে সে ভয় তোমারও আছে। দুজনের মাঝে না বসে তুমি এক ধারে বোসো। দরকার হলে লাফিয়ে বেরোতে পারবে।

হাসতে হাসতেই আমরা চাঙ্গাপ্পার নির্দেশ মতো গাড়িতে উঠে বসলুম। আর কোন সময় নষ্ট না করেই আমাদের গাড়ি দ্রুত গতিতে সামনের রাজপথে বেরিয়ে এল।

তারপরে আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা সমতল পথ ধরে না এগিয়ে সামনের পাহাড়ের পথ ধরে উপরে উঠতে লাগলেন। এই পথের ধারে একটি বড় হোটেল নিচে থেকে দেখতে পাওয়া যায়। তারপরে আরও হোটেল আছে। এ সব ছাড়িয়ে কী আছে, তা আমার জানা ছিল না। জানতে চাইলুমও না। কিন্তু মিস্টার সোমান্না পিছন থেকে বললেন: এ পথে কেন চলেছ?

সামনে থেকে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: বাঙালী দাদাকে আগে কোটাগিরি দেখিয়ে আনি, তারপরে মার্কারার পথ ধরব।

আমি লজ্জায় যেন মরে গেলুম। সেবারেই আমি স্বাতির সঙ্গে কোটাগিরি গিয়েছিলুম। সেখানে দেখবার কিছু নেই। বললুম: ছি ছি, আমার জন্যে আপনি এখন কোটাগিরি চলেছেন!

কেন! আপনার শখের কথা বলছিলেন না!

অত্যন্ত কাতর স্বরে বললুম: বিশ্বাস করুন আমাকে, এখানে একা থাকলে ঘরের বাইরে আমি এক পাও বেরোতুম না।

মিস্টার সোমান্না আমাকে সমর্থন করে বললেন: এ কথা আমরা

বিশ্বাস করতে পারি। অনেক কষ্টে আমরা এঁকে ঘরের বাইরে বার করেছিলাম।

গাড়ির গতি অব্যাহত রেখেই মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: তাহলে আপনার কোটাগিরি যাবার শখটা কি আমাদের ফাঁকি দেবার জন্যে একটা ছুতো!

নিঃশব্দে এ কথা মেনে না নিয়ে উপায় নেই। প্রতিবাদ করলেই কোটাগিরি যেতে হবে সবাইকে। সবার শাস্তি হবে। আর মেনে নিলে সোজা মার্কারা। আমার উত্তরের জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ভদ্রলোক বললেন: ঠিক আছে। এই পথে যখন এসে পড়েছি, তখন আর ফিরব না।

মুক্তাউয়া বললেন: বহুৎ ঠিক।

কিন্তু সোমান্না দম্পতি আর্তনাদ করে বললেন: কিন্তু আমাদের তোমরা শাস্তি দিচ্ছ কেন! কোটাগিরিতে দেখবার কিছু নেই।

আমি বললুম: সত্যিই তো! আমার পাপে সবার শাস্তি কেন!

তাহলে নিজের পাপ আপনি স্বীকার করছেন!

করছি।

এ রকম পাপ আমাদের কাছে আর করবেন না বলুন।

হাত জোড় করে বললুম: আর কখ্‌খনো না।

মুক্তাউয়া বললেন: তাহলে ঠিক আছে। ওঁকে ডোডাবেট্টার ওপর থেকে সমস্ত এলাকাটা দেখিয়ে দাও।

মিস্টার সোমান্না তৎপর ভাবে বললেন: উত্তম প্রস্তাব।

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। আমাদের গাড়ি তখন পাহাড়ী পথ ছেড়ে কতকটা সমতল পথ ধরেই অগ্রসর হচ্ছিল। এই পথই যে কোটাগিরির পথ, তা বুঝতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল না। আর এই পথের ধারেই যে পাহাড়টি মাথা উঁচু করে আছে, তারই নাম

নিশ্চয়ই ডোডাবেটা। ভূগোলে ডোডাবেটা নাম পড়েছিলুম। এটি নীলগিরির সর্বোচ্চ চূড়া। কিন্তু তা হিমালয়ের মতো তুষারমণ্ডিত নয়। যত দূর মনে পড়ে, এর উচ্চতা ন হাজার ফুটের নিচেই হবে। উটি যদি সাত বা সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচু হয় তো আমাদের হাজার দেড়েক ফুট উপরে উঠতে হবে। কিন্তু এই পথে এখন রৌদ্রালোক নেই। গাছের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে কিছু কুয়াশাও লেগে আছে বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ দেখতে পেলুম যে সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা পাহাড়ে ওঠার পথ ধরলুম।

এই পাহাড়ী পথেও মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তাঁর গাড়ি বেশ বেগে চালাচ্ছিলেন। তাই দেখে মিস্টার সোমান্না বললেন: তোমার অমন তাড়া কিসের?

প্রশ্নটা যে তাঁকেই করা হয়েছে, তা বুঝতে পেরে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: মুক্তার বিরিয়ানি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সবিস্ময়ে সীতাউয়া বললেন: তোমরা কি বাড়ি থেকে বিরিয়ানি নিয়ে বেরিয়েছ?

মুক্তাউয়া বললেন: পাগল! বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে কেউ বেরোয়!

তবে?

গুডালুরে অর্ডার দিয়ে আসা হয়েছে।

মিস্টার সোমান্না নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন: হোটেলের বিরিয়ানি সারাক্ষণই গরম থাকে। তার জন্যে জীবন বিপন্ন করবার দরকার নেই।

কিন্তু—

বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা একবার পিছন ফিরে তাকাবার চেষ্টা করলেন। তারপরেই আবার আঁকাবাঁকা পথের দিকে দৃষ্টি দিলেন।

মিস্টার সোমান্না বললেন: আবার কিন্তু কিসের!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: অন্ধকার হবার আগেই বাঁদীপুরের জঙ্গলে পৌঁছতে হবে।

পৌঁছতে হবে, না পেরিয়ে যেতে হবে?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা ছদ্ম গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন: তুমি বুঝতে পারছ না সোমান্না, কত বড় দায়িত্ব নিয়ে আমি বেরিয়েছি। এক পাল না হোক, অন্তত একটা—

একটা কী?

হাতি, মানে বুনো হাতি। আমরা শুধু হাতির গল্পই করি, কাজের বেলায় আমরা ছুঁচো দেখেই মূর্ছা যাই।

মিস্টার সোমান্না বলে উঠলেন: আমরা!

আমরা নয় তো কি আমাদের বাঙালী দাদা! ওঁরা আর যাই করুন, বীরত্বের বড়াই নিশ্চয়ই করেন না।

আমি প্রতিবাদ করে বললুম: ভাল হবে না, বাঙালীর নিন্দা আপনারা করবেন না। ভারতীয় সেনাদলে আমরাও প্রধান সেনাপতি দিয়েছি। তাঁকে এগোতে দিলে গোটা পাকিস্তানটা তিনি কব্জা করে ফেলতেন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: খুব ঠিক কথা। আপনাকে দেখে সে কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলুম।

আমাকে কি আপনারা ভীতু ভাবছেন! মোটেই না। ছেলেবেলাতেই আমি হাতিকে মাটিতে বসিয়ে তার পিঠে চড়ে বসেছিলুম।

বলেন কি!

মিস্টার সোমান্না বললেন: আপনাদের বাড়ির হাতি?

নিশ্চয়ই না।

মুক্তাউয়া গভীর শ্রদ্ধায় বললেন: তবে বোধহয় জঙ্গলের বুনো হাতি!

আমি বিপুল গর্বের সঙ্গে বললুম: চিড়িয়াখানার।

সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: তবে আপনি দেখছি মুক্তাউয়ার মতো বীরপুরুষের দেশের লোক।

এই মন্তব্য শুনে আমি আবার আশ্চর্য হলুম। স্পষ্টই বুঝতে পারলুম যে মুক্তাউয়াকে এঁরা নিজেদের দেশের মেয়ে ভাবেন না। কিন্তু অসৌজন্য প্রকাশ হয়ে পড়বে ভয়ে আমি কোন প্রশ্ন করবার সাহস পেলুম না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা এক নজরে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন: আমার কথা ঠিক বুঝতে পারলেন না, তাই না?

বললুম: এত বড় একটা কম্প্লিমেন্ট না বুঝে হজম করি কী করে বলুন!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: সোমান্নারা মুক্তাউয়ার বংশ পরিচয় জানে। তাই ওরা বুঝতে পেরেছে। আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে।

তাঁর গাড়ি এখন ক্রমাগত উপরে উঠছে। গোঁ গোঁ করে শব্দ হচ্ছে গিয়ারের। কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পার মুখে কোন উদ্বেগ নেই। পথের দিকে চেয়ে স্বচ্ছন্দে কথা বলছেন। বললেন: তিনি যে আমাদের অসভ্য বর্বর বলে মনে করেন, তা বোধহয় ইতিমধ্যে শুনে থাকবেন। কথাটা সঙ্গত বলেই আমরা কিছু মনে করি না। সোমান্নারাও তাঁর বংশ মর্যাদার কথা জানে বলে ওরাও তা মেনে নিয়েছে। ওঁর মাতৃকুলের বাস রাজস্থানে। একদিন তাঁরা দিল্লীর বাদশাহ আকবরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন হলদিঘাটে। মোগল সেনার বিপুল বাহিনীকে কাঁদিয়ে ছেড়েছিলেন। এ সব তো আমার কথা নয়, এ সব ইতিহাসের কথা। তাই না মুক্তা?

বলে মুক্তাউয়ার দিকে একবার চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন।

মুক্তাউয়া গম্ভীর ভাবে বললেন: এ সব কথা নিয়ে পরিহাস ভাল নয়!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : পরিহাস ! সত্য কথাকে কি পরিহাস বলে ! এই যে তোমার দিদিমারা নিজেদের ইজ্জত রক্ষার জন্যে জহর ব্রতের আগুনে পুড়ে মরেছিলেন, ভারতের আর কোন্ রাজ্যের মেয়েরা পারে এ রকম করতে ! আপনিই বলুন !

বলে আমার দিকে তাকালেন ।

আমি বললুম : সত্যিই ইতিহাসে এ রকম নজির আর নেই ।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : তাহলেই বুঝুন, মুক্তার মা ছিলেন রাজস্থানের রাঠোর বংশের মেয়ে। সামান্য একটুখানি পদস্খলনের জন্যে এই হতভাগা অসভ্য দেশে এসে ছিটকে পড়েছিলেন ।

অতর্কিতে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : কী রকম !

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আরও গম্ভীর হয়ে বললেন : সে একটা সাময়িক দুর্বলতা, বুঝলেন ! সে দুর্বলতা দেহের ভাববেন না, সেটা হৃদয়ের । এ দেশের একটা অসভ্য সৈনিকের গলায় তাঁর স্বয়ম্বরের মালাটি খসে পড়ে গিয়েছিল । আর এই ভুলের জন্যেই তাঁকে এই বর্বর দেশে চলে আসতে হয়েছিল ।

সোমান্না দম্পতি হেসে উঠলেন। কিন্তু আমি গম্ভীর ভাবেই বললুম : তারপর ?

তারপর তো দেখতেই পাচ্ছেন। তিনি সেই ভুল না করলে কি এই মহামূল্য মুক্তা আমার মতো একটা বানরের কণ্ঠে আজ শোভা পেত ! রাজপুতানায় থাকলে ইনি বৃন্দাবনের কোন কৃষ্ণেরই যে কণ্ঠলগ্ন হতেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ।

মুক্তাউয়ার যে পরিচয় আমি পেয়েছিলুম, তাতে সোমান্না দম্পতির হাসিতে যোগ না দিয়ে গম্ভীর হয়ে থাকাই সমীচীন মনে করলুম ।

কিন্তু মিসেস চাঙ্গাপ্পা নীরবে থাকতে পারলেন না। বললেন : আমার মা এই কোডাভাদের বীরের জাত বলে ভাবতেন বলেই ঐ রকম মারাত্মক ভুল করে বসেছিলেন। আর ভুলই বা বলি কী করে !

আমার বাবা যে সত্যিই বীর ছিলেন, সে তো সেনাবাহিনীর খাতায় সোনার অক্ষরে লেখা আছে।

তারপরেই বললেন: ভুল হয়েছে আমার। মা আমাকে অনেকবার সাবধান করেছিলেন। তবু আমি ভেবেছিলাম যে কোডাভা জাতটাই বুঝি বীরের জাত।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: ঠিক একই ব্যাপার। যে রাজপুতেরা একদিন হলদিঘাটায় যুদ্ধ করেছিল, তাদেরই বংশধরেরা এখন কলকাতার বড়বাজারে জাঁকিয়ে বসে ঘি-এর সঙ্গে সাপের চর্বি মেলাচ্ছে। তাই না?

বলে চকিতে একবার আমার দিকে তাকালেন।

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই মিসেস চাঙ্গাপ্পা গর্জে বললেন: তোমাকে আমি একশোবার বলেছি যে তারা রাজপুত নয়, তারা মারবাড়ী বেনের জাত।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা ভয় পাবার ভান করে বললেন: তা বলেছ। কিন্তু কি বিপদ হয়েছে জানো! রাজস্থানের সবাইকেই আমরা মারবাড়ী বলি। আমার বন্ধুদের দেখো না, এখনও তোমাকে মারবাড়ী ভাবে।

মুক্তাউয়া এবারে উত্তর দেবার সুযোগ পেলেন না। আমাদের গাড়ি পাহাড়ী পথ ধরে উঠতে উঠতেই এমন এক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যে আমিও বুঝতে পারলুম, চূড়ায় পৌঁছে গেছি। কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পা থামলেন না। বললেন: আমরা এই পথে কেন মার্কারায় যাচ্ছি, তা তোমাদের বলা হয় নি। মুক্তা তার দেশে বড় বড় দাঁতাল হাতিতে চড়েছে। শুধু চড়া নয়, সেই সব হাতির পিঠে চেপে অনেক বনে জঙ্গলে ঘুরে বহু বাঘ সিংহ মেরেছে তার দাদামশায়ের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের দেশে এসে একটা ইঁদুর মারতেও দেখি নি। তারই ইচ্ছে যে বাঁদীপুর স্যাঙ্কচুয়ারির ভেতর দিয়ে যাই। বাঘ সিংহ না হোক, একটা হাতি কি আর দেখতে পাবে না!

মিস্টার সোমান্না বললেন : একটা হাতি ! সেবারে তো আমরা এক পাল হাতি দেখেছিলুম !

কিন্তু সেই হাতি দেখার গল্পটা তিনি বলতে পারলেন না। তার আগেই আমরা ডোডাবেটার শিখরে পৌঁছে গেলুম।

অপরূপ জায়গা এই ডোডাবেটা। গাড়ির দরজা খুলে আমরা সবাই নেমে পড়লুম। আর চারিদিকের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হল যে উটি শহরটি সত্যিই পাহাড়ের রাণী। পরিচ্ছন্ন আলোয় এই পাহাড়ের উপর থেকে চারিদিক না দেখলে আমার এখানে আসা সার্থক হত না।

কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমাদের মনে করিয়ে দিলেন যে এখানে দাঁড়িয়ে কবিতা রচনার মতো প্রচুর সময় আমাদের হাতে নেই। এখান থেকে এখনই না ছুটলে গুডালুরে বিরিয়ানি শেষ হয়ে যাবে, আর অন্ধকারে বাঁদীপুরের জঙ্গলে হাতি দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে মুক্তাউয়া।

কথাটা মিথ্যা নয়। সূর্য তখন মাথার উপরে আর নেই। মনে হচ্ছে যে পশ্চিমের দিকেই খানিকটা হেলেছে। এই কথা বোঝা গেল সীতাউয়ার কথায়। তিনি বললেন : বিরিয়ানিটা উটিতে খেয়ে বেরোলেই ভাল হত মনে হচ্ছে।

কিন্তু মুক্তাউয়া গাড়িতে বসে বললেন : মুক্তির আনন্দের জন্যে হাতের ঘড়িটা একদিন ব্যাগের মধ্যে বন্ধ করে রাখতে পার না ?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা স্টীয়ারিঙে বসে শান্তভাবে জবাব দিলেন : তা পারি। কিন্তু দুপুরে যে পেটের মধ্যে অ্যালার্ম বাজে !

আর যাই কর, জন্তুর মতো পেটকে প্রশ্রয় দিও না। দেহের মধ্যে মন নামে আর একটা যন্ত্র আছে, তার দাবীও খানিকটা মানতে শেখো।

বলে মুক্তাউয়া তাঁর স্বামীকে থামিয়ে দিলেন।

১০

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে নিচে নামার পথ ধরলেন। খুব সাবধানে চলতে লাগলেন তিনি। মুখে একটাও কথা বলছিলেন না। গড় গড় করে নামতে নামতে আমরা এক সময়ে কোটাগিরি উটির প্রশস্ত রাজপথে পৌঁছে গেলুম। এ পথের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে শুরু করলে সহজে শেষ হবে না। উটি থেকে যে পথ মাইসোরের দিকে গেছে, সে পথও এমনি সুন্দর দেখেছি। পাহাড়ের পথ কোথায় সুন্দর নয়, আমি তা বলতে পারব না। এক এক পাহাড়ে তার এক এক রূপ। কিন্তু রূপের পার্থক্য শুধু শিল্পীর চোখেই ধরা পড়ে। আমাদের মতো মানুষ সব পাহাড়কেই সুন্দর ভাবে। যখন যে পথে যায়, সেই পথটিই বিশ্বের সেরা পথ বলে মনে করে। তার কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি না, তা চোখে পড়ে না।

এই পথের ধারেই আমি ইউকালিপ্টাস গাছ দেখলুম। অসংখ্য গাছ। কর্ণাটকের বনে চন্দন গাছের মতো নীলগিরি পাহাড়ের সম্পদ এই ইউকালিপ্টাস। এই গাছের অনেক জাত আছে বলে শুনেছি। আমাদের দেশেই নাকি একশো রকমের জাত পাওয়া যায়। এই গাছের মাতৃভূমি অস্ট্রেলিয়া ; কিন্তু এখন সমস্ত পৃথিবীতেই এর চাষ হচ্ছে। গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং চির হরিৎ। ধূসর সবুজ আভার পাতায় একটা সুগন্ধ আছে। পেঁয়াজের খোসার মতো এই গাছের ছালও পরতে পরতে জোড়া। এই গাছ থেকে গঁদ রেজিন আলকাতরা প্রভৃতি পাওয়া যায়। গঁদ থেকে ওষুধ তৈরি হয়, চামড়া ট্যানিং-এর কাজেও লাগে। আর এর তেল থেকে পাওয়া যায় মেনথল ও থাইমল। কয়েক জাতের গাছ ভাল কাঠ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ইউকালিপ্টাস তাই একটি মূল্যবান গাছ এবং আজকাল

নানা জায়গায় এই গাছের চাষ হচ্ছে। আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলুম এই গাছের। এই গাছগুলি পাহাড়ের খাদের দিক থেকেও মাথা চাড়া দিয়ে উপরের দিকে উঠেছে। ডালপালা কম, পাতার ফাঁক দিয়ে পরিচ্ছন্ন রোদ এসে পথের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে। হালকা বাতাসে সরু পাতাগুলো দুলছে ঝাউ গাছের মতো।

কতকটা সমতল পথে পৌঁছে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আবার কথা কইতে আরম্ভ করলেন। বললেন: তোমার হাতির গল্পটা আমাদের শোনা হয় নি।

কথাটা যে মিস্টার সোমান্নাকে বললেন, তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় নি। উত্তরটা তিনিই দিলেন: সে সাংঘাতিক ব্যাপার। একটা দুটো নয়, একসঙ্গে এক পাল হাতি।

কোথায়?

বলে মুক্তাউয়া তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

মিস্টার সোমান্না বললেন: এই বাঁদীপুরের পথেই আমরা দেখেছিলাম।

সীতাউয়া বললেন: কই, আমি দেখি নি তো!

তুমি সেবারে আমার সঙ্গে ছিলে না। আমি বাসে যাচ্ছিলাম।

তার পর?

ঘন বনের মধ্যে হঠাৎ আমাদের বাস দাঁড়িয়ে গেল।

কেন?

একটা হাতি। তার পেছনে আর একটা।

মুক্তাউয়া উদ্বিগ্নভাবে বললেন: বাসের একেবারে সামনে?

মিস্টার সোমান্না বললেন: তাহলে তো হয়েই যেত। এ গল্প আর আমাকে বলতে হত না।

উদ্বিগ্ন স্বরে সীতাউয়া বললেন: তাড়াতাড়ি বল।

মিস্টার সোমান্না বললেন: আমরা কেউই দেখতে পাই নি। দেখেছিল শুধু আমাদের বাসের ড্রাইভার। বাস থেমে আছে দেখে

যাত্রীদের অনেকে চেঁচামেচি শুরু করতেই ড্রাইভার সামনে দেখিয়ে দিল। একটার পর একটা হাতি পথের এধারের বন থেকে ওধারের বনে চলে যাচ্ছে।

মুক্তাউয়া বলে উঠলেন: আপনারা খুব ভয় পেয়ে গেলেন তো?

ভয়! তা সত্যি, ভয় অনেকেই পেয়েছিল। ভুল করে হাতিগুলো এদিকে এসে যদি বাসটাকে নিয়ে ফুটবল খেলা শুরু করত, তাহলে আমাদের কাউকেই আর খুঁজে পাওয়া যেত না। তবে তারা অনেক দূরে ছিল বলে আমরা তেমন ভয় পাই নি।

তাচ্ছিল্যের সুরে মুক্তাউয়া বললেন: ব্যাপারটা মোটেই থ্রিলিং হয় নি। কারাপুরের জঙ্গলে বুনো হাতি দেখার মতো টেম ব্যাপার।

আমি প্রশ্ন করলুম: আপনি দেখেছেন বুঝি?

আমি! সে কি আর ও আমাকে দেখাবে! নিজে এমন ভয় পায় যে একটা না আর একটা ছুতো করে আমায় আটকে রাখে।

আমার কৌতূহল দেখে মিস্টার সোমান্না বললেন: কারাপুরের জঙ্গলে হাতি ধরার ব্যাপারটা একটা উৎসবের মতো। হাতির উপদ্রব বাড়লে সরকার হাতি ধরার ব্যবস্থা করেন। হাজার হাজার লোক আসে এই কাজে, টুরিস্টরাও মজা দেখতে আসে। নদীর ওধারে বন, আর এধারে টুরিস্টরা হাতে ক্যামেরা নিয়ে আর চোখে বাইনকুলার লাগিয়ে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করে।

ক্যামেরার কথায় নিজের ক্যামেরা আমি একবার নেড়েচেড়ে দেখলুম। স্বাতি সঙ্গে না থাকলে এই যন্ত্রটা আমি আজকাল সঙ্গে রাখি। প্রয়োজন মতো ছবি নিজেই তুলে নিই।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা এক নজরে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন: সামনে হাতি এসে পড়লে ছবি-টবি নেবেন নাকি?

বললুম: সে সৌভাগ্য কি আর হবে!

সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য?

বিপদ আপদ না ঘটলে সৌভাগ্য।

আর বিপদ ঘটলে ?

দুর্ভাগ্য বলার জন্যে হয়তো বেঁচে থাকব না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : খুব খাঁটি কথা।

কারাপুরের জঙ্গলে বুনো হাতি ধরার গল্প আমি একজন বাঙালী ভদ্রলোকের কাছে শুনেছিলুম। যতদূর মনে পড়ছে, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে সেবারে আমার দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল মাইসোরে। তাঁর নামটা এখন মনে পড়ছে না। তিনি বাইসন শিকারে মাইসোরে আসছেন বলেছিলেন। আর দেখা হতেই আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম।

এই প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন : শিকার এখনও হয় নি, তবে আর একটা শখ মিটেছে। হাতি ধরা দেখে এলুম। এরা বলে খেদা অপারেশন। এখান থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কারাপুর জঙ্গলে গিয়েছিলুম বন্ধুদের সঙ্গে। সে মশাই এক অদ্ভুত দৃশ্য ! আপনি ভাবতে পারবেন না কী করে তারা একটা গোটা দল বুনো হাতিকে একসঙ্গে বন্দী করে ফেলছে ! এ সব আমাদের ধারণার অতীত।

তারপর বলেছিলেন : বিশ্বাস করুন। প্রায় হাজার দুই জংলী লোক। এই কাজের জন্যেই নাকি তাদের ভর্তি করা হয়। সরকারী লোকের সঙ্গে তারাও কাজ করে। শেখাতে কিছুই হয় না। কেননা প্রায় প্রতি বছরই তারা এই কাজ করছে ; কোমরে কাড়া-নাকাড়া খালি টিন ক্যানেস্তারা বেঁধে তারা এগিয়ে আসে।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলুম : হাতির সঙ্গে কি তারা লড়াই করে ?

তিনি বলেছিলেন : তা না হলে আ. রঙ্গ কিসের ! মাইসোরের হাতি দেখেছেন তো, কেমন সুশ্রী সুন্দর গড়ন !

স্বীকার করতে আমার লজ্জা হয় নি যে হাতির সৌন্দর্য আমি

কোন দিন লক্ষ্য করি নি। কিন্তু তিনি মন্তব্য করেছিলেন: আরে ছি ছি, তাহলে করেছেন কী! রূপ কি ভেবেছেন মানুষেরই একচেটে!

তিনি এবারে জানোয়ারের রূপ বর্ণনা করতে শুরু করবেন বলে আমি ভয় পেয়েছিলুম। তা হলে আর রক্ষা থাকবে না। তাই তাড়াতাড়ি বলেছিলুম: না না, তা ভাবব কেন! মাইসোরের হাতি তো খুবই সুন্দর। তা না হলে কি এ দেশের রাজা সেই হাতির পিঠে চড়ে দশেরার শোভাযাত্রায় বেরোন!

তিনি আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে শুধু শোভাযাত্রার জন্যে নয়, চিড়িয়াখানা, সার্কাস পার্টি, দক্ষিণ ভারতের মন্দির, এমনকি শিকারের জন্যেও হাতির দরকার হয়। কিন্তু হাতি ধরবার অন্য কারণটাই প্রধান। দলে দলে বুনো হাতি এসে ধান ও আখের ক্ষেতের খুব ক্ষতি করে। তাই দেশের গরিব প্রজাকে হাতির উৎপাত থেকে রক্ষা করতে হয়।

তারপর তিনি বললেন: কারাপুরের জঙ্গলে গাছের চেয়ে হাতি বেশি। বাঁশের পাতা খেয়ে তারা বাঁচে, আর মাঝে মাঝে লোকালয়ে নেমে আসে মুখ বদলের জন্যে। হাতি ধরার ওস্তাদেরা সব ওঁৎ পেতে বসে থাকে, শুয়ে শুয়ে বুনো লোক রোজ তাদের লক্ষ্য করে। কোথা থেকে লক্ষ্য করবে, তাও ছকে বাঁধা। হাতির দলের সন্ধান যেই পাওয়া যায়, অমনি দেওয়া হয় সঙ্কেত। আর কথা নেই, চারিদিক থেকে সেই বুনো লোকগুলো বীভৎস আওয়াজ করে হাতির দিকে এগোতে থাকে। ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়া টিন-ক্যানেস্তারা, তার সঙ্গে অমানুষিক চিৎকার। এ যে কী শব্দ, কানে না শুনলে কল্পনা করা যায় না! ভয়ে হাতিরা পালাবার চেষ্টা করে। তার জন্য একটি মাত্র পথ। সেই পথে গেলেই তারা খোঁয়াড়ে আটকা পড়ে। চারিদিকে খাল কাটা, তার একটি গেট। ঢুকলে আর বেরোবার পথ নেই। লক্ষ্য রাখতে হয় ওদের দলপতির ওপর।

সে বেচারা কাবু হলেই আর সবাই কাবু। তাকে অনুসরণ করে সবাই একদিকে যায়'।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলুম : তারপর ?

তারপরেই সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপার। হাতির গলায় দড়ি পরানো। মাহুতগুলো অদ্ভুত কুশলী। পুরনো পোষমানা হাতির পিঠে চড়ে এক একটাকে ভুলিয়ে আনে ছোট খোঁয়াড়ে, আর দড়ি পরায়। তারপর আর কী! তাদের চরিয়ে চরিয়ে পোষ মানানো।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বেশ জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। কখন যে তিনি উটির পথ ছেড়ে মাইসোরের পথ ধরেছিলেন, আমি তা বুঝতেই পারি নি। এই পথেই নিচের দিকে নেমে গেলেই আমরা গুডালুরে পৌঁছব। সেখানে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন। তারপর বাঁদীপুরের অভয়ারণ্য পেরোব সন্ধ্যার আগেই। এঁদের কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছিলুম যে আজ মার্কারায় পৌঁছনো সম্ভব হবে না, মাইসোরে রাত্রি বাস করতে হবে। মার্কারায় যাত্রা কাল সকালে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হঠাৎ তাঁর পুরনো কথায় ফিরে গেলেন। আমাকে প্রশ্ন করলেন : জঙ্গলে বাঘ ভালুক দেখার শখ আপনার আছে নাকি ?

আমি আর্তনাদ করে ওঠার মতো বললুম : শখ! বাঘের নামেই আমার হৃৎকম্প হয়।

কী রকম ?

বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা সকৌতুকে আমাকে দেখে নিলেন আড়চোখে।

আমি কিছু কৌতুক পরিবেশের জন্যে আমার এক সরকারী বন্ধুর গল্প নিজের বলে চালিয়ে দিলুম। বললুম : একবার আমার এক 'বসে'র পাল্লায় পড়ে বাধ্য হয়ে শিকারে যেতে হয়েছিল। বাঘ

শিকার। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, ভয় যতই পাই না কেন, ওপর-ওয়ালার অনুরোধ মানেই হুকুম, না মেনে উপায় নেই।

পিছন থেকে মুক্তাউয়া বললেন: আপনি বাঘ শিকারে গেলেন!

গেলুম বৈকি।

সীতাউয়া বললেন: সত্যি?

এখন আর সত্যি নয় বলা চলে না, তাই মিথ্যে কথাই বললুম: একেবারে খাঁটি সত্যি।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: শিকারের নিয়মকানুন জানেন তো!

বললুম: যারা আয়োজন করেছিল, তারাই শিখিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, প্রথমে গুলি ছুঁড়বেন আমার সাহেব, তারপর আমি। তারপরেও যদি দরকার হয়, তবে যারা আয়োজন করেছে তাদের দলপতি গুলি ছুঁড়বেন। নিজের দাবী আমি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলুম, অনেক কাকুতি মিনতি করেছিলুম সবাইকে। কিন্তু ভদ্রতা করছি মনে করে কেউই আমার কথা কানে তুললেন না।

তারপর?

তারপর আবার কী! দিনের আলো থাকতে থাকতেই আমরা বনে গিয়ে মাচার ওপরে উঠে বসলুম। গাছের মগডালে বাঁধা বিরাট উঁচু মাচা। তার উপরে উঠতে প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল আমাদের। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে আর কখনও নয়। চাকরি গেলেও 'বসে'র মন রাখার জন্যে এমন কাজ আর করব না।

আমার কথার ধরনে মিস্টার সোমান্না হেসে উঠলেন। আর মুক্তাউয়া বললেন: বলুন আপনি।

বললুম: কিন্তু আশ্চর্যের কথা, হাঁচড়পাঁচড় করে কোন রকমে মাচার ওপরে উঠে বসতেই আমার 'বসে'র মেজাজ খুলে গেল। ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে মিলিয়ে দু-তিন পেগ হুইস্কি খেয়ে নিলেন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি খেলেন না?

পারলুম না খেতে।

কেন ?

আমাদের দলপতি খাবার জন্যে আমাকেও জোর করেছিলেন খুব। কিন্তু মাচার ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে যাবার ভয়ে আমি কিছুতেই রাজী হলুম না।

আমার কথা শেষ হবার আগেই সবাই হেসে উঠলেন। আমি নিতান্ত অপ্রতিভ হবার ভান করে বললুম ঃ থাক এ গল্প।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন ঃ থাকবে কেন, বলুন আপনার গল্প।

বললুম ঃ গল্প তো নয়, এ একেবারে সত্যি ঘটনা।

মুক্তাউয়া বললেন ঃ সত্যি ঘটনাই তো। বলুন তারপরে কী হল।

তারপর আমার 'বস' শিকারের গল্প শোনাতে লাগলেন আমাদের—কোথায় কেমন করে কটা বাঘ মেরেছিলেন সেই সব গল্প।

মুক্তাউয়া ধমক দিয়ে বললেন ঃ আপনাদের বাঘের গল্প বলুন।

তাড়াতাড়ি বললুম ঃ অন্ধকার গভীর হবার পর—

বাঘ বেরোল ?

বেরোল মানে ? একটা ঝোপের আড়ালে এক জোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে দেখে আমাদের হোস্ট্ ফিসফিস করে সাহেবকে বললেন, মারুন এইবারে।

তারপর ?

'বস' তাঁর রাইফেল বাগিয়ে ধরে বললেন, দাড়ান একটু। বসা বাঘ আমি মারি নে, বাঘ লাফালেই গুলি ছুঁড়ব।

বাঘ লাফালো ?

লাফালো মানে ! একেবারে আমাদের মাথা লক্ষ্য করে বিরাট এক লাফ।

সাহেব গুলি ছুঁড়লেন তো ?

বললুম ঃ সাহেবকে এক ঠেলা দিয়ে আমাদের হোস্ট্ বললেন, মারুন এইবারে। কিন্তু মারবে কে ? সাহেব তাঁর বন্দুক নিয়ে

একেবারে আমার ঘাড়ের ওপরে। তাই দেখে আমাকেই এক ঠেলা দিয়ে আমাদের হোস্ট্ বললেন, আপনি মারুন।

পিছন থেকে মুক্তাউয়া চেঁচিয়ে উঠলেন : মারলেন আপনি ?

বললুম : মারব কী করে! আমার হাতের বন্দুক তো তখন ওপর থেকে মাটিতে পড়ে গেছে!

হো হো করে হেসে উঠলেন মিস্টার চাঙ্গাপ্পা। আর মুক্তাউয়া জিজ্ঞাসা করলেন : বাঘের কী হল ?

বাঘের ?

হ্যাঁ হ্যাঁ বাঘের। আপনাদের হোস্ট্ বাঘটাকে মারতে পারলেন না ?

বললুম : কী করে মারবে! বাঘটা যেই ভাবল যে সাহেব শেষ হয়ে গেছে, তখনই সে ভয়ে পালিয়ে গেল।

ভয় কিসের ?

বললুম : জানেন না বুঝি! বাঘ ভেবেছিল, সবাই মরে গেছে। সুন্দর বনের রয়াল বেঙ্গল টাইগার তো মরা মানুষ খায় না, বরং ভয় পায় যে মানুষ ভূত হয়ে বাঘের ঘাড়ই মট্‌কে দেবে। তাই পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে ছিল।

এবারে এক সঙ্গে সবাই হেসে উঠলেন।

১১

পথের উপরে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। চারিদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতেই আমি চলেছিলুম। হঠাৎ ডান দিকে একটি পথ বেরিয়ে গেছে দেখলুম। তখনই আমার পাইকারার কথা মনে পড়ে গেল। পাইকারা জলপ্রপাত। সেবারে জেনেছিলুম যে এই অঞ্চলেই পাইকারা নামের একটি পার্বত্য নদী ঝর্ণার মতো ঝরে পড়েছে। উটির যাত্রীদের কাছে এটি একটি দ্রষ্টব্য স্থান। কিন্তু আমাদের দেখা হয় নি। শুনেছি যে উটি থেকে এই স্থানের দূরত্ব বারো-চোদ্দ মাইল। বোধহয় এই মোড় থেকে সামান্য দূরে। পাইকারা নদী নাকি হাজার তিনেক ফুট নিচে নেমেছে। তাকে কাজে লাগাবার জন্য তৈরি হয়েছে দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। এখানকার পাওয়ার হাউসে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তা কোইম্বাতুরে নিয়ে দেশের নানা জায়গায় সরবরাহ করা হয়। এখানকার সুন্দর দৃশ্য দেখবার জন্য নাকি একটি সংক্ষিপ্ত পথেও এখানে এসে মাইসোরের পথ ধরা যায়।

এই বিরাট দেশে কত সুন্দর জায়গা আছে তার কোন হিসেব নেই। হয়তো হিসেব রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি আশ্চর্য হই এই ভেবে যে এই সব জায়গার সম্বন্ধে কৌতূহল আছে, এমন মানুষও কম দেখা যায়। এ দেশ দরিদ্র হলেও পয়সার অভাব অনেকেরই নেই, পয়সা উপচে পড়ছে এমন লোকও আছে অনেক। তাঁরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে উটি বেড়াতে আসেন, বেড়াতে যান নানা জায়গায়। কিন্তু সুন্দর জায়গা খুঁজে বেড়ান না, সুন্দর জায়গার খবর পেয়েও সব সময় দেখতে যান না। যাঁদের সঙ্গতি নেই বা সুযোগ সুবিধে সামান্যই, তাঁরাই এই সব খবরের জন্যে ব্যগ্র হয়, খবর পেয়েও দেখবার ব্যবস্থা করতে পারেন না।

আমি বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। তা লক্ষ্য করে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন : কেমন লাগছে বলুন তো!

আমি চমকে উঠেছিলুম, বললুম : আমাকে বলছেন?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হেসে বললেন : আপনি গম্ভীর হয়ে আছেন বলেই জানতে চাইছি।

পিছন থেকে মিস্টার সোমান্না বললেন : আমাদের ওপর রেগে আছেন বলে মনে হচ্ছে।

কেন?

বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা একবার পিছনে চেয়ে দেখলেন।

মিস্টার সোমান্না বললেন : ওঁর সঙ্গে কথাবার্তায় মনে হয়েছে যে আলস্যে জীবন যাপনই ওঁর কাছে আদর্শ জীবন। অথচ আমরা জবরদস্তি ওঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি।

বললুম : ঠিক তা নয়। আপনারা যাচ্ছেন একটা সামাজিক কাজে যোগ দিতে, আর আমি আপনাদের বিব্রত করছি বলেই এই সঙ্কোচ।

মুক্তাউয়া বললেন : আমাদের সামাজিক কাজ বলেই আপনার সেখানে উপস্থিত থাকা বেশি দরকার।

কেন?

কোডাভাদের বিয়ে দেখবার সুযোগ কি আপনি আর কোথাও পাবেন!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : কোডাভারা কি দেশের বাইরে বিয়ে করেন না?

মুক্তাউয়া একটা মুখভঙ্গি করে বললেন : এঁরা যত বড় লোকই হোন, আর যেখানেই থাকুন, দেশে এসেই ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবেন। এঁরা বলেন, দেশাত্মবোধ। এঁদের দেশ মানে কুর্গ, ভারত নয়। প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক এঁরা।

মুক্তাউয়া যেন এ দেশের মেয়ে নন, এমনি ভাব। কিন্তু তাঁর কথায় রাগ করলেন না কেউ। মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : তোমার মায়ের বেলায় তো তা হয় নি!

কিন্তু আমার বেলায় তা হয়েছিল।

বলে মুক্তাউয়া তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

এখনও আমরা নেমে চলেছি। উটি থেকে এই পথ ধীরে ধীরে নেমে চলেছে। এমনি করে নামতে নামতেই আমরা গুডালুরে পৌঁছে গেলুম।

নীলগিরি পাহাড়ে গুডালুরও একটি ছোট পার্বত্য শহর। সড়ক পথের চৌরাস্তায় এটি অবস্থিত। আমরা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উটি থেকে এলুম, যাব উত্তর-পূর্বে অরণ্যের ভিতর দিয়ে মাইসোরের দিকে। দক্ষিণ-পশ্চিমে মাইল আষ্টেক দূরে নাডাঙ্গি নামে একটি জায়গা থেকে পথ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। দুটি পথেই কালিকটে যাওয়া যায়; কিন্তু শোরানুর হয়ে ত্রিচুর বা পালঘাটে যেতে হলে দক্ষিণের পথ ধরতে হয়। গুডালুর থেকে চতুর্থ পথটি উত্তরে সুলতান্‌স্ ব্যাটারি গেছে। তার উচ্চতা তিন হাজার ফুট। আমরা যে অরণ্যের মাঝখান দিয়ে যাব তার উচ্চতা আরও বেশি, প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট। মাইসোরের উচ্চতা প্রায় এক হাজার ফুট কম।

যেখানে এসে আমরা নামলুম, সেখানেই একটি প্রাঙ্গণের মধ্যে শহরের বাস স্ট্যাণ্ড, আর তার চারি ধার ঘিরে দোকান পাট হোটেল ও রেস্তোরাঁ। এরই মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হোটেলে আমরা মাংসের বিরিয়ানি খেয়ে নিলুম।

এখানেও তাড়াহুড়ো। মাইসোর এখান থেকে অনেকটা পথ। অন্ধকার হবার আগেই আমাদের মুত্তুমালাই ও বাঁদীপুরের অরণ্য এলাকা পেরিয়ে যেতে হবে। তার উপরে আকাশে মেঘও দেখা দিয়েছে। উটির আকাশের মতো সেই ছাড়া-ছাড়া কালো মেঘ এখানে এসে জড়ো হয়েছে বলে মনে হল। আমাকে সেই মেঘের

দিকে তাকাতে দেখে মিস্টার সোমান্না বললেন: ভয় পাচ্ছেন নাকি?

বললুম: ভয় তো নয়, পথে বৃষ্টি নামলে নাস্তানাবুদ হতে হবে।

মিস্টার সোমান্না বললেন: এখানে ঠিক আপনাদের মতো বর্ষা হয় না, এদিকে বৃষ্টি হয় বছরে দুবার। শীতের বর্ষা এখনও শুরু হয় নি।

সীতাউয়া বললেন: আপনার ভাগ্যের জোরেই উটিতে আজ সকালটা পরিষ্কার ছিল। ডোডাবেট্টাতেও আমাদের ভিজতে হয় নি।

মুক্তাউয়া বললেন: তাহলে পথেও আমাদের ভিজতে হবে না।

গাড়িতে উঠবার আগে মিস্টার সোমান্না বললেন: তুমি আজ সারাদিন গাড়ি চালিয়েছ, আমাকে এবারে স্টিয়ারিঙে বসতে দাও।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: ক্লান্ত বোধ করলেই তোমাকে ছেড়ে দেব।

বলে নিজেই সকলের আগে উঠে বসলেন।

মুক্তাউয়া বললেন: ক্লান্ত হলেও তুমি তা স্বীকার করবে না। তোমার অহঙ্কারই আমাদের বিপদের কারণ হবে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা গম্ভীর ভাবে বললেন: এ পথে আর কাউকে চালাতে দেওয়া সম্ভব নয়।

কেন?

হাতি দেখবার জন্যে দরকার হলে আমাদের বনের মধ্যে ঢুকতে হবে। বনের পথ ঘাট তো তোমাদের চেনা নয়!

তোমারই কি এ সব পথ চেনা?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: চিনি কিনা তা একটু পরেই দেখতে পাবে।

সবাই উঠে বসতেই তিনি গাড়ি চালাতে শুরু করলেন। বাজার হাট পেরিয়ে সোজা রাস্তায় পড়েই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি ব্রাহ্মণ?

বললুম : শুনেছি আমার জন্ম ব্রাহ্মণ বংশে।

তার মানে ?

নিজে ব্রাহ্মণ বলে দাবী করতে পারি কি না জানি না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : জন্ম যখন ব্রাহ্মণ বংশে তখন সগৌরবে একটা কাজ করতে পারেন।

কী ?

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

আমাকে একটা আশীর্বাদ।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম : আশীর্বাদ !

চাঙ্গাপ্পা বললেন : আপনার আশীর্বাদে আজ যদি একটা বুনো হাতি মুক্তাকে দেখাতে পারি তো চিরকাল আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

আমি দু হাত জুড়ে বললুম : রক্ষে করুন, আপনার মতো গোলাম আমি রাখতে পারব না।

মিস্টার সোমান্না বললেন : তাল-বেতালের মতো গোলাম রাখতে পারবেন। খাওয়া পরা দিতে হবে না, স্মরণ করলেই এসে উপস্থিত হবে।

তবু আমি ভয় পেয়েছি, এমন ভাব দেখিয়ে বললুম : কিন্তু—

কিন্তু আবার কী ?

এ রকম একটা আশীর্বাদ করে নিজের প্রাণটাই কি খোয়াব !

কেন ?

ভয়ে কাতর হয়েছি ভান করে বললুম : এই জানালা দিয়ে শুঁড় বাড়িয়ে হাতি যদি আমাকেই তুলে নেয় !

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হো হো করে হেসে উঠে বললেন : ভয় পাবেন না, আমি আপনাকে রক্ষা করব, নিজের জান দিয়ে দেব আপনার জন্যে। এই বারে হাতে পৈতে জড়িয়ে বলুন—

কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললুম : তথাস্তু।

পিছন থেকে মিস্টার সোমান্না বলে উঠলেন: জয় হোক বাঙালী ব্রাহ্মণের!

আমি করুণ ভাবে বললুম: হাতি দেখে মূর্ছা গেলে আপনারা ভয় পাবেন না। ভয়ের ব্যাপার মিটে গেলেই আমার জ্ঞান ফিরে আসবে।

মুক্তাউয়া বললেন: আপনি এমন ভীতু কেন বলুন তো! রাজস্থানের মরুভূমিতে বাহেড়াদের হাতে পড়লে আপনি কী করতেন!

বাহেড়া! সে আবার কী?

বলে আমি পিছন ফিরে তাকালুম।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বলে উঠলেন: আপনি বাহেড়া জানেন না! সে কি, বাহেড়াদের নামও শোনেন নি বুঝি!

বললুম: না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: হিমালয়ে যেমন তুষার মানব, মরুভূমিতে তেমনি বাহেড়া। মস্ত বড় বড় তাদের পায়ের ছাপ। আর মরুভূমি পেরোবার সময় সেই পায়ের ছাপ দেখতে পেলেই লোকের আত্মারাম খাঁচাছাড়া।

আমি সবিস্ময়ে বললুম: আপনারা দেখেছেন তাদের?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা জোর করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: মুক্তার যেমন বুনো হাতি দেখবার সৌভাগ্য আজও হয় নি, তেমনি আমারও বাহেড়া দেখার—

সৌভাগ্য বোলো না।

বলে বাধা দিলেন মুক্তাউয়া।

তবে কি দুর্ভাগ্য বলব?

মুক্তাউয়া বললেন: বাহেড়া দেখে আর ফিরে আসতে হবে না।

বললুম: আশ্চর্য তো! এই সেদিন আমরা রাজস্থানের মরুভূমি দেখে এলুম, বাহেড়া নামে কোন প্রাণীর নামই আমরা কারও মুখে শুনি নি।

মুক্তাউয়া বললেন : মরুভূমির কোথায় গিয়েছিলেন ?

বললুম : জয়সলমেরে ।

মুক্তাউয়া তাচ্ছিল্য ভরে বললেন : জয়সলমেরে বাহেড়া দেখবেন কোথায় ! আশেপাশে মানুষ থাকলে তো বাহেড়া আসবে না, তাদের দেখতে হলে দিনের পর দিন মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চলতে হবে। চারি দিকেই মরুভূমির পথ কয়েক দিনের। জল নেই, জনমানব নেই, গাছপালা মাটি কোথাও কিছু নেই।

তবে ওরা থাকে কোথায় ?

নিচু নিচু পাহাড়ের গুহায়।

কী খায় তারা ?

মুক্তাউয়া এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন : বড় বড় উট হাতি—

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা খুব গম্ভীর স্বরে বললেন : ছোটখাটো মানুষ খেয়ে ওদের পেট ভরে না তো !

আমি বললুম : তবে মানুষ দেখলে ওরা কী করে ?

মুক্তাউয়া বললেন : ধরে নিয়ে যায়। পুরুষ বাহেড়ারা মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়, আর পুরুষদের নিয়ে যায় মেয়ে বাহাড়েরা।

তারপর ?

নিজেদের গুহায় তাদের রেখে দেয়।

বিয়ে করে বুঝি ?

পাগল হয়েছেন ! খেতে না পেয়েই তারা মরে যায়। বাহাড়েরা ধরে নিয়ে গেলে বেঁচে ফিরে আসবার আর কোন উপায় নেই।

ছদ্ম গাম্ভীর্যে মুখখানা থমথমে করে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : বুঝতে পারলেন তো, আর কখনও মরুভূমিতে একা বেড়াতে যাবেন না। নিতান্ত দরকার পড়লে মুক্তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

মুক্তাউয়া কঠিন স্বরে বলে উঠলেন : ওঁকে বলছ কেন ! নিজেই একবার চল না, কত সাহস দেখা যাবে !

আকাশ তখনও মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি। মাঝে মাঝেই রৌদ্র উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য। এই প্রসন্ন পথে ছুটে চলার সময় সামনের অরণ্যের কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলুম। বেশ হালকা মেজাজে চলেছিলুম আমরা। আমি পাশ ফিরে অত্যন্ত মৃদু স্বরে মিস্টার চাঙ্গাপ্পাকে জিজ্ঞাসা করলুম: সত্যি সত্যিই মরু-মানব বলে কোন প্রাণী আছে নাকি?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পাও চুপিচুপি জবাব দিলেন: থাকলে বইপত্র পড়ে নিশ্চয়ই জানতে পারতেন।

তবে?

এ সব মরুভূমি অঞ্চলে প্রচলিত গল্প বলে মনে হয়। ছোট ছেলে-মেয়েদের ভয় দেখাবার জন্যে তৈরি গল্প।

তারপরেই বললেন: আমার কথা বিশ্বাস না হয়, বই পুঁথি ঘেঁটে দেখতে পারেন।

১২

দুপুরের আহারে যেন খানিকটা নেশা মেশানো থাকে। খাবার পরে একটু আরাম করে পা ছড়িয়ে বসবার সুযোগ পেলেই দু চোখে ঘুম আসে ভরে। স্কুল-কলেজেও আমার ঘুম আসত। বসে বসেই ঢুলতে হত। পড়বার বিষয়টি মনোমত না হলে জেগে থাকবার জন্য ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হত। শুধু আমার নয়, অনেকেরই এই রকম হয়। আজও সবাই নীরবে চলছিলেন। শুধু মিস্টার চাঙ্গাপ্পার দৃষ্টি খুব সজাগ ছিল। তিনি বেগে গাড়ি চালিয়ে চলেছিলেন।

সেবারে আমরা বাসে যাচ্ছিলুম। স্বাতি হঠাৎ কথা বলতে শুরু করে বলেছিল : বুঝলে মা, গোপালদার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে।

কী ক্ষমতা মামী তা জানতে চান নি, কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি তা জানবার জন্য। কিন্তু স্বাতি থেমে রইল না, বলল : কন্যাকুমারীতে গোপালদা বলেছিল উটি দেখব, সেই উটি দেখে ছাড়ল। তুমি দেখে নিও মা, গোপালদা যা দেখতে চায়, সবাইকে তাই দেখিয়ে ছাড়বে।

মামা শুনতে পেয়েছিলেন স্বাতির কথা, বললেন : গোপালের একার আর কতটুকু ক্ষমতা !

কিন্তু তারপর আর কিছু বললেন না। স্বাতি এইবারে নীরব হল। বুঝতে পারল যে আর কিছু বললে মামা তাকেও আমার দলে ফেলবেন।

আমাদের বাস তখন বিরাট এক অরণ্যময় এলাকার দিকে ছুটেছিল। এই বাসেরই যাত্রীদের কাছে আমি মুতুমালাই নাম শুনেছিলুম, শুনেছিলুম বাঁদীপুর নাম। বেণুগোপাল ন্যাশনাল পার্কের নামও শুনেছিলুম। কিন্তু এই এলাকার সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা হয় নি।

পরে আমি মানচিত্র দেখে ও কিছু কাগজপত্র সংগ্রহ করে অনেক কিছুই জেনেছিলুম। সে ভারত স্বাধীন হবার আগের ঘটনা, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। মহিসুর রাজ্যের তৎকালীন মহারাজা তাঁর নিজের সখে বেণুগোপাল ওয়াইল্ড্ লাইফ পার্কের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার আয়তন ছিল আটশো বর্গ কিলোমিটার। এটিকেই ভারতের প্রথম ন্যাশনাল পার্ক বলা যেতে পারে। এখন এই দেশে অনেক ন্যাশনাল পার্ক। ঘন অরণ্য ও তার মধ্যে বিচরণকারী বন্য পশু-পাখী সংরক্ষণের জন্য এই সব এলাকাকে ন্যাশনাল পার্ক বলা হচ্ছে। এসব বনে শিকারের অনুমতি নেই। আত্মরক্ষার জন্যই বন্দুক তোলা যেতে পারে। কিন্তু তার প্রয়োজন হয়েছিল, এ কথা প্রমাণ করতে না পারলে শাস্তি পেতে হবে। তাই ন্যাশনাল পার্কে বন্দুকের ব্যবহার অচল। সেখানে পশুপাখি দেখতে যাওয়াই একমাত্র কাজ। স্থানে স্থানে বাসস্থান নির্মিত হয়েছে। সরকারী অনুমতি নিয়ে আশ্রয় পাওয়া যায়। আহারের ব্যবস্থাও হতে পারে। পশুপাখি দেখানোর ব্যবস্থাও আছে। হাতির পিঠে চড়ে বা মোটর ভ্যানে বনের পশুপাখি দেখা যায় নির্দিষ্ট সময়ে গেলে।

নীলগিরি পাহাড়ের উত্তরের ঢালুতে একটি বিশাল অরণ্য ।৩নটি রাজ্য জুড়ে অবস্থিত। এই অরণ্যটিই নানা নামে চিহ্নিত। তামিলনাড়ু রাজ্যে তার নাম মুতুমালাই বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ,, বাঁদীপুর ন্যাশনাল পার্ক নাম কর্ণাটক রাজ্যে এবং কেরালা রাজ্যে এই অরণ্যের অংশই ওয়াইনাড্ বণ্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য নামে পরিচিত। এ ছাড়াও কর্ণাটক রাজ্যের কুর্গ জেলার দক্ষিণে এই অরণ্যেরই আর একটি অংশের নাম নাগরহোলে ন্যাশনাল পার্ক। মুতুমালাই-এর আয়তন তিনশো কুড়ি বর্গ কিলোমিটার, ওয়াইনাড্ অঞ্চলের আয়তন আমার জানা নেই। তবে বাঁদীপুরের টাইগার প্রজেক্ট যে প্রায় সাতশো বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত তা জানতে পেরেছি।

এই সব হিসেবে অরণ্যের অবস্থান সঠিক বোঝা যাবে না। তার চেয়ে সহজে বোঝা যাবে অন্যভাবে বললে। গুডালুর থেকে মাইল বারো দূরে তেপ্পাকাড়ু নামে একটি জায়গা মুদুমালাই, অরণ্যের উপকণ্ঠে। এইখান থেকেই বনের আরম্ভ। যাঁরা বন দেখতে আসেন, দেখতে চান বনের পশুপাখি, তাঁরা এখানেই রাত্রিবাস করেন। তার জন্যে অনেকগুলি ভাল রেস্টহাউস আছে। তার মধ্যে প্রধান হল কারওড়ি, অভয়ারণ্যম ও সিল্‌ভান লজ। উটাকামণ্ডে নীলগিরি ডিভিসনের ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসারের কাছে সব রকমের খবর ও সাহায্য পাওয়া যায়। সেখান থেকে এই জায়গার দূরত্ব চল্লিশ মাইল। মাইসোর থেকে এই স্থানের দূরত্ব মাইল কুড়ি বেশি। এই পথে বাস যাতায়াত করে। তেপ্পাকাড়ু থেকে ময়ার নামে একটি জায়গা দশ মাইল পূর্বে বনের বাহিরে।

বাঁদীপুর নামেও একটি জায়গা আছে মাইসোরের দিকে অরণ্যের প্রায় শেষ প্রান্তে। এই পথের মাঝামাঝি ময়ার নদী পেরোলেই বাঁদীপুর অরণ্যের আরম্ভ। দশ মাইল পথ এই দুটি অরণ্যের মধ্য দিয়ে গেছে। তেপ্পাকাড়ু থেকে বাঁদীপুরের দূরত্ব ন মাইলের বেশি নয়। এখানেও রাত্রিবাসের ভাল ব্যবস্থা আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাইসোর গেস্ট হাউস, বম্বে টুরিস্ট লজ, পি. ডব্লু. ডি. ইনস্পেক্সন বাংলো, হিমবত. গোপালস্বামী গেস্ট হাউস ও হায়দ্রাবাদ লজ। মাইসোর থেকে এই স্থানের দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল। মাইসোর শহরেও ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার আছে।

সেখানে ব্যবস্থা করে নাগরহোলেও যাওয়া যায়। এই জায়গাটি কুর্গের দিকে মাইসোর থেকে বিয়াল্লিশ মাইল পশ্চিমে। বাঁদীপুরের সমস্ত প্রাণীও এই অরণ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এটি বাঁদীপুর থেকে বিচ্ছিন্ন।

বাঁদীপুর থেকে গুন্দ্‌লুপেট নামে একটি ছোট শহর—মাইসোরের দিকে বারো মাইল দূরে। গুডালুর থেকে যে পথ সুলতান্‌স্ ব্যাটারি

গেছে, সেখান থেকে আর একটি পথ ওয়াইনাড্ বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্যের ভিতর দিয়ে গুন্দ্লুপেট এসেছে।

এই অঞ্চলে পাখিরও একটি অভয়ারণ্য আছে। তার নাম রঙ্গনাতিট্টু। এটি মাইসোরের উত্তরে শ্রীরঙ্গপাটনার পথে দেখে নেওয়া সম্ভব।

কিন্তু এই সব খবর না জেনেও আমরা এই অরণ্য নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গিয়েছিলুম। জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলুম বলেই মনে পড়ছে। শুনেছিলুম যে মুদুমালাই অরণ্যে বাঘ ভালুক ও চিতাবাঘের সঙ্গে নানা জাতের হরিণ আছে—সাম্বর স্পটেড ডিয়ার বার্কিং ডিয়ার ও মাউস ডিয়ার। বাইসন হায়না ও শুয়োর আছে। আছে হাতি বুনো কুকুর ও বাঁদর। মালাবারের কাঠবেরালি কেমন তা জানি নে, তাও আছে। আর নানা জাতের পাখিও আছে—ময়ূর, সবুজ পায়রা, মুরগি আর ঘুঘু। সাপখোপ অজগরেরও অভাব নেই। পরে অনেক পশুপাখির ইংরেজী ও ও দেশী নামও জেনেছিলুম। গ্রীষ্মে দেখা যায় চিতাবাঘ, রাক্ষুসে কাঠবেরালি, হাতি, গৌর বা বাইসন, সাম্বর, চিতল, মাউস ডিয়ার ও শুয়োর। বাঁদর দুরকমের—বনেট মাঙ্কি ও কমন লাঙুর। হনুমানকে লাঙ্গুর বলে। পাখিদের ইংরেজী নাম গ্রেট ব্ল্যাক উডপেকার, বার্বেট, মালাবার গ্রে হর্নবিল, মালাবার ট্রোগান, ড্রঙ্গো, কুকু-শ্রাইক্স, মিনিভেট, হক্ঈগ্ল, প্যারাকীট্স, এমারেল্ড্ ডাভ। সবুজ পায়রা ও বুনো পেঁচাও আছে।

ময়ার নদী পেরোলেই একই অরণ্যের নাম হয় বাঁদীপুর। গৌর ও হাতি দেখা যায় প্রায় একই সঙ্গে। বনের ভিতর পথের জাল বিছানো আছে জলাশয়ের আশপাশ দিয়ে। সে সব পথে গেলে নাকি খুব কাছ থেকে পশুপাখি দেখা যায়। সমস্ত লজগুলি একই ব্লকে এবং দিনে রাতে প্রায় সব সময়েই চিতলের পাল দেখতে পাওয়া যায়। বনের পশুপাখি দেখার ব্যবস্থাও এখানে খুব ভাল।

রাত্রিবাসের মাশুল উঠে আসে খুব সহজে।

কিন্তু বাস থেকে পথের দিকে চেয়ে থেকেও তেমন নজরে পড়ার মতো কোন পশুপাখি আমরা দেখতে পাই নি। ঘন পাতায় আচ্ছন্ন ছিল গাছপালা এবং নিচে উঁচু ঘাস। গ্রীষ্মের সময় গাছের প্রায় সমস্ত পাতাই ঝরে যায়, মাটির ঘাসও খুব বড় থাকে না। তাই নানা রকমের ছোট জানোয়ার ও পাখি দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য একজন যাত্রী বলেছিলেন যে শরৎকালেও যে পশুপাখি দেখা যায় না তা নয়। ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত যেমন, তেমনি বর্ষার পরে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেও মুতুমালাই অরণ্য দেখার প্রশস্ত সময়। সামনের তেপ্পাক্কাড়ু এলাকায় আছে সেগুন গাছের বন, আর তার নিচে বড় গাছপালা নেই। বাইসনকে এখানে গৌর বলে। এই গৌরের পাল এখানে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসে। দলবদ্ধ হয়ে বুনো হাতিও বেরোয় এখানে, আর পার্শ্ববর্তী ময়ার অঞ্চলে। মাসিনাগুড়ি ময়ার অঞ্চলে একসঙ্গে শখানেক চিতলও দেখতে পাওয়া যায়। স্পটেড ডিয়ারকে চিতল বলে। ছোট বড নানা আকার ও আকৃতির এত চিতল একসঙ্গে দেখে বিস্মিত হতে হয়। বুনো কুকুরও দেখা যায়, তাদের বলে ঢোলে। আর একটি আশ্চর্য প্রাণী হল উড়ুক্কু টিকটিকি বা ফ্লায়িং লিজার্ড। তার নাম ড্র্যাকো ডুসুমিয়ার।

কিছু দেখতে পাব এই আশা নিয়েই সেবারে আমরা এগোচ্ছিলুম। মামী চোখ বুঁজে ছিলেন, আর মামা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু স্বাতি দেখছিল সব কিছু। বলেছিল: গোপালদা কি ভয় পেলে নাকি?

আমি হেসে বলেছিলুম: ভয় পাব কেন!

এই বনের ভেতর বাঘ আছে বড় বড়।

বলেছিলুম: বনের বাঘকে তো ভয় নেই—

তবে কি—

বলে স্বাতি থেমে গিয়েছিল।

আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে মামা মামী জেগে আছেন বলে তার সন্দেহ হয়েছে। তাঁদের কানে এ রকম কথা অশোভন শোনাবে। আমি তাই মেনে নিয়ে বলেছিলুম: এসব জায়গায় বেড়াতে এলে পোষা হাতি পাওয়া যায়। হাতির পিঠে চেপে বনের বাঘ দেখতে হয়। একদিন থাকলে বনের রেস্টহাউসে থেকে সবকিছু দেখার ব্যবস্থা করা সম্ভব।

এর পরে স্বাতি আর কথা কইল না, আমিও চুপ করে ছিলুম। কিন্তু আমার মন চলে গিয়েছিল সুদূর অতীতে। তখন দেশের বিশাল অঞ্চল জুড়ে ছিল এই রকমের ঘন অরণ্য। কিন্তু সে অরণ্যে মানুষ বাঘের ভয় পায় নি, পেয়েছে রাক্ষসের ভয়। তখন কি বাঘের মতো হিংস্র জন্তু ছিল না, না রাক্ষসেরাই বনের জীবজন্তু সব খেয়ে ফেলত!

সত্য যুগের কথা মনে পড়ছে। মুনি ঋষিরা বনে বাস করতেন, তপস্যা করতেন গভীর অরণ্যে। মেয়েদের তপস্যার কথাও শোনা যায়, শোনা যায় শিশুদের তপস্যার কথা। গৃহস্থরা বানপ্রস্থে যেতেন, সেও অরণ্যে বাস। সস্ত্রীক বনে যেতেন। ত্রেতা যুগেও আমরা এই রকম দেখি। পিতার সত্য রক্ষার জন্য সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে রাম চোদ্দ বছর বনবাসের জন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু এঁরা কেউই বনকে ভয় পান নি, চিন্তা করেন নি হিংস্র জীব-জন্তুর কথা। রাম লক্ষ্মণের হাতে ধনুর্বাণ ছিল। কিন্তু মুনি ঋষিরা বা গৃহস্থরাও কি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বনে বাস করতেন! তা মনে হয় না। মুনি ঋষিদের আশ্রমে হিংস্র পশুর কথা যে একেবারেই শোনা যায় না তা নয়। কিন্তু তারা নাকি শান্ত স্বভাবের হয়ে যেত। শুধু মানুষ নয়, হরিণও নিশ্চিন্তে থাকত ঋষিদের আশ্রমে।

এই আশ্চর্য বিষয়টি আমি অনেকদিন ভেবেছি। দেশ যখন অরণ্যে পূর্ণ ছিল, তখন হিংস্র শ্বাপদ ছিল না সেই অরণ্যে। অথচ

অরণ্য ধ্বংস করে যখন বসতি স্থাপন করা হচ্ছে, তখনই আমরা সেই সব পশুর কথা ভাবতে শুরু করেছি আর ভয় পাচ্ছি। কখন থেকে কেমন করে এই সব হিংস্র জীবজন্তু মানুষের শত্রু হয়ে উঠল, তার কোন বিবরণ আমাদের জানা নেই।

রাক্ষসরা এই সব হিংস্র জীবজন্তু খেয়ে ফেলত, এ কথা সত্য বলে আমার মনে হয় না। জন্তু যদি হিংস্র হত, তাহলে তারা মুনি ঋষিদেরও আক্রমণ করত। মুনি ঋষিরা রাক্ষসদের অত্যাচারের কথা বলেছেন, কিন্তু জানোয়ারের উপদ্রবের কথা বলেন নি। সে যুগে জানোয়ারেব উপদ্রব ছিল না, এ কথা যদি সত্য হয় তো আরও একটা সত্য মানতে হবে। সেটি আরও মর্মান্তিক সত্য। মানুষই যে শত্রুতা করে জানোয়ারকে হিংস্র করেছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় থাকে না।

এ কোন অসম্ভব ধারণা নয়। এখনও আমরা বিশ্বাস করি যে সাপ খুব নিরীহ প্রাণী। অনেক সাপের মারাত্মক বিষ আছে ঠিকই, কিন্তু সে বিষ তারা শুধু আত্মরক্ষার জন্য ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহার করে না। মাটিতে মাথা নিচু করে তারা দ্রুত গতিতে চলে, মাথা তুলে দেখে না কিছু। কানেও কিছু শোনে না। সাপুড়েরা বাঁশি বাজায়, কিন্তু সে বাঁশির সুর তাদের কানে যায় না। কিন্তু চোখে দেখে যে সাপুড়ে তার দিকে চেয়ে হেলেদুলে বাঁশি বাজাচ্ছে। তাই তারা নিজেরাও ফণা তুলে হেলেদুলে নাচে। ফোঁস করে ভয় পেলে। কেউ তাকে আক্রমণ করছে ভাবলেই সেও আক্রমণ করে আত্মরক্ষার চেষ্টায়। এটাই জগতের নিয়ম। এই নিয়ম বোধহয় সমস্ত বন্য জন্তুর বেলাতেও খাটে। তারা নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে চায়, কারও সঙ্গে শত্রুতার কথা তারা ভাবে না। এই ভাবেই বোধহয় অরণ্যের সমাজটা চলতে পারত। কিন্তু তারা দেখল যে ব্যাধ এসে হরিণ স্বীকার করছে আহারের জন্য, রাজা মৃগয়ায় এসে মৃগবধ করছেন খেলার জন্য। তাই দেখে বনের বাঘ ভাবল, সেও

তো হরিণ মেরে আহার করতে পারে! একদিন তাই করল, তারপর তার লোভ গেল বেড়ে। হরিণ ধরতে না পারলে গৃহপালিত পশুর দিকে তার নজর পড়ল। অস্ত্র দেখলে মানুষকেও আক্রমণ করতে দ্বিধা করল না। মানুষ যে জানোয়ারের চেয়েও ভয়াবহ, খেলার ছলেও তারা প্রাণী হিংসা করতে পারে।

সেকালে ভারতের সমগ্র মধ্যাঞ্চল জুড়ে ছিল দণ্ডকারণ্য। মধ্যাঞ্চল বললে এই অরণ্যের অবস্থান ঠিক বোঝা যাবে না। সঠিক ভাবে বলতে হলে বলা উচিত দাক্ষিণাত্যেরই বিশাল অরণ্যকে দণ্ডকারণ্য বলা হত। রামায়ণে এর উল্লেখ আছে। বনবাসের সময়ে রাম এই অরণ্যেই বাস করেছিলেন এবং রাবণ সীতাকে এখান থেকেই অপহরণ করেন। নর্মদা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করতেন দণ্ডক নামে এক রাজা। শুক্রাচার্যের শাপে এই রাজ্য অরণ্যে পরিণত হয়। এরই নাম দণ্ডক বন বা জনস্থান। স্থানে স্থানে এই অরণ্য ছিল পরম রমণীয়।

মনোযোগ দিয়ে রামায়ণ পড়লে মনে হবে যে যমুনা নদী পেরোলেই দণ্ডকারণ্যের আরম্ভ এবং এই অরণ্য গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই অরণ্যে রাজত্ব করত রাক্ষস বানর প্রভৃতি অনার্য জাতি। তারা বাস করত পর্বতের গুহায়। কুঞ্জ ছিল ফলের গাছের। তাদের মধ্যেও রাজা ছিল, সামন্ত পাত্র মিত্র ও রাজ্য পরিচালনার উপযোগী বিধি ব্যবস্থাও ছিল। আর্য ঋষিরাও তাদের বল বিক্রমের জন্য ভয় পেতেন এবং প্রয়োজন হলে ক্ষত্রিয় রাজাদের সাহায্য চাইতেন। রামায়ণে এই অনার্যদের উপদ্রবের কথাও আছে। আবার সীতার স্বয়ম্বরে রাজর্ষি জনক যে এদের রাজাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সে কথাও আছে রামায়ণে।

অগস্ত্য ঋষিই এই দণ্ডকারণ্য অতিক্রম করে বিন্ধ্য পর্বত ডিঙিয়ে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন আর্য সভ্যতা বিস্তারের জন্য। তাঁর পরে গিয়েছিলেন পরশুরাম। অগস্ত্যের শেষ জীবনের কথা আমরা

জানি না, কিন্তু পরশুরাম তাঁর জীবনের শেষ ভাগ কাটিয়েছেন মহেন্দ্র-পর্বতে। এই পর্বত দক্ষিণ ভারতে নয়, আধুনিক পণ্ডিতরা পূর্ব-ঘাটের কোন অংশকেই মহেন্দ্র পর্বত বলে চিহ্নিত করেছেন। তার অবস্থান উড়িষ্যা রাজ্যে। দক্ষিণ ভারতে তিনি গিয়েছিলেন ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে পশ্চিমঘাট পর্বতের পথে। সে পথের নানা স্থানে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন আজও বর্তমান। এই দক্ষিণ ভারতে রামের অবদানও কিছু কম নয়। আর্য সভ্যতার প্রসারে না গেলেও বনবাস যাপনের সময়েই তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই সেখানে উত্তর ভারতের সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিলেন।

আজও এই দণ্ডকারণ্যের বহু অংশ অক্ষত আছে। পূর্বে ওড়িশা থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত এই অরণ্যের বিস্তার। ওড়িশা অন্ধ্র মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র এই চারটি রাজ্যের দু লক্ষেরও বেশি বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এই অরণ্যের বিশালতা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। ভারত সরকারের দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সমগ্র অরণ্য নিয়ে নয়, এর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল ওড়িশার কোরাপুট ও কালাহাণ্ডি জেলা এবং মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা। এর প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন ছিল দ্বিধাবিভক্ত পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন। পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটিহীন উদ্বাস্তু পরিবারকে সেখানে নিয়ে গিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আরও একটি কাজ এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল—তা হল এই অরণ্যবাসী আদিবাসীদের উন্নতি বিধান। এই পরিকল্পনার আওতায় এসেছিল প্রায় আটাত্তর হাজার বর্গ কিলোমিটার ভূমি। সেখানে যাবার পথ ছিল দুটি—একটি নাগপুরের পথে রায়পুর ও দ্বিতীয়টি ওয়াল্টেয়ারের পথে বিজয়নগরম থেকে। রায়পুর থেকে বিজয়নগরম এখন রেলপথে যুক্ত। নূতন রেলপথ তৈরি হয়েছে ওয়াল্টেয়ার থেকে কিরাণ্ডুল পর্যন্ত। এই পথে কোরাপুটে এই পরিকল্পনা কেন্দ্রের সদর দপ্তর।

কিন্তু এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পশুপাখির অভয়ারণ্য বেশি নেই।

মধ্যপ্রদেশে কান্‌হা একটি পশুর অভয়ারণ্য ও মহারাষ্ট্রের তাড়োবায় পশু ও পাখি দুই-ই আছে। কান্‌হা নাগপুর থেকে একশো সত্তর মাইল দূরে, জবলপুর ও গোণ্ডিয়া রেলস্টেশন থেকে সড়ক পথে গেলে দূরত্ব অনেক কম হয়। চিরাডেঙ্গৈরি থেকেও যাতায়াত করা যায়। কান্‌হা ও কিস্‌লিতে পাঁচটি রেস্টহাউস আছে। মান্দ্‌লার ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসারের কাছে অনুমতি পাওয়া যায়।

কান্‌হা একটি আশ্চর্য সুন্দর বন। বড়া শিঙ্গা নামে এক জাতের সুন্দর হরিণ এখানকার প্রধান আকর্ষণ ছিল। এরা কমে কমে এখন শ খানেকে দাঁড়িয়েছে বলে ১৯৫৫ সালে এদের রক্ষণের জন্য আড়াইশো বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে অভয়ারণ্যে পরিণত করা হয়েছে। এখানে একটি টাইগার প্রজেক্টও আছে। বাঘ চিতা হায়না গৌর শুয়োর চিতল ও কালো হরিণও এই অরণ্যে আছে। পাখির মধ্যে আছে শকুন সার্পেণ্ট ঈগ্‌ল ও কালো আইবিস। এই অরণ্যের পশুপাখি দেখবার প্রশস্ত সময় হল ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত।

তাড়োবা ন্যাশনালপার্ক মহারাষ্ট্রে। চন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে আটাশ মাইল দূরে। এটি দেখবার ভাল সময় মার্চ থেকে মে মাস। চন্দ্রপুরের ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসারের অনুমতি নিয়ে তাড়োবার সার্কিট হাউসে থাকা যায়। তাড়োবা লেকের ধারে এর বিস্তৃতি একশো দশ বর্গ কিলোমিটার। এই সেগুনের বনে চিতা গৌর নীল গাই সাম্বর চিতল শুয়োর ও হনুমান দেখতে পাওয়া যায় রাতে। কখনও-সখনও বাঘও বেরোয়। গ্রীষ্মের সময় চারিদিকের জল শুকিয়ে গেলে তারা লেকের জল খেতে আসে। লেকের জলে কুমীর আছে, আর আছে নানা জাতের পাখি।

দণ্ডকারণ্যের কথায় আর একটি কথা আমার মনে পড়ল। কোথাও পড়েছিলুম যে প্রাচীন দণ্ডকারণ্যের অবস্থান ছিল গোদাবরী ও কাবেরী নদীর মাঝখানে। আমরা এখনও কাবেরী নদীর দক্ষিণে।

আছি, মাইসোরের দশ মাইল উত্তরে শ্রীরঙ্গপাটনায় দেখা যাবে কাবেরীকে। এই মত যদি সত্য হয় তো আমরা দণ্ডকারণ্যে এখনও প্রবেশ করি নি। তবে এ কোন্ অরণ্যে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি? এ অরণ্যের উল্লেখ কি রামায়ণে নেই?

১৩

অত্যন্ত দ্রুতবেগে গাড়ি চালাচ্ছিলেন মিস্টার চাঙ্গাপ্পা। মনে হচ্ছিল যে তিনি বোধহয় চক্ষের নিমেষে এই বিশাল অরণ্যটা পার হয়ে যেতে চান। কিন্তু দশ মাইল পথ তো কম নয়, সময় যে অনেকটা লাগবে তাতে সন্দেহ নেই। পিছন থেকে হঠাৎ মিস্টার সোমান্না আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: অরণ্যের অভিজ্ঞতা তো আপনার আছে, তাই না?

বললুম: অরণ্যের অভিজ্ঞতা কী রকম তা তো জানি নে। তবে অরণ্যের ভেতরে ঢোকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

তার মানে কিছুই দেখতে পান নি!

সেটা কি সৌভাগ্যের কথা?

মিস্টার সোমান্না বললেন: কিছু দেখতে পাওয়া মানেই তো দুর্ভাগ্য! প্রাণ নিয়ে টানাটানির ভয়!

কন্তু ফিরে এসেই তো বলব সৌভাগ্য। ভাগ্য ভাল ছিল বলেই তো বাঘের মুখে পড়েও প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি। আর বনের ছাড়া বাঘ দেখেছি একেবারে সামনে থেকে।

মুক্কাউয়া বললেন: তর্ক নয়, কোন্ অরণ্যে গিয়েছিলেন বলুন।

বললুম: সেবারে কেরালার পেরিয়ার স্যাঙ্কচুয়ারি দেখেছি।

মুক্কাউয়া বলে উঠলেন: দেখেছেন! বুনো হাতি দেখেছিলেন নিশ্চয়ই!

আমি তাঁর আগ্রহ দেখে না বলতে পারলুম না, তাঁকে খুশী করবার জন্তেই বললুম: দেখেছি বৈকি! এক সঙ্গে এক পাল হাতি দেখেছি!

মুক্কাউয়া উল্লসিত হয়ে বললেন: কী করছিল তারা?

সত্যি কথা আমার মনে পড়ছে। নৌকোয় চেপে পেরিয়ার লেকে ঘুরে ঘুরে অরণ্য দেখবার সময় অনেক দূরে আমরা গোটা কয়েক হাতি দেখতে পেয়েছিলুম। কিন্তু কাছে থেকে একটা প্রাণীও দেখতে পাইনি। সেই শিকারী ভদ্রলোক নৌকোয় আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি মোটর লঞ্চের ব্যবস্থা করে আমাদের সব দেখাচ্ছিলেন। হ্যাঁ, তাঁর নামটাও এখন মনে পড়ছে। বিষ্টু ভাদুড়ী। মাদুরার প্ল্যাটফর্মে প্রথম দেখা হয়েছিল, তারপরে এই পেরিয়ার অভয়ারণ্যে। ফেরার পথে আর একবার দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। হাতিগুলোকে দূরে দেখে বলেছিলেন : সকাল বা বিকেল হলে আপনারা এই হাতিদের জল খাওয়া দেখতে পেতেন। জলে নেমে জল খেত, আর আমাদের দেখে শুঁড় দিয়ে জল ছেটাত।

কিন্তু মুক্তাউয়ার আগ্রহ দেখে সত্যি কথা আমি বলতে পারলুম না। তার বদলে বললুম : কত কাছে থেকে দেখেছিলুম তা বললে আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না।

না না, বিশ্বাস করব আমরা। আপনি নির্ভয়ে বলুন।

বললুম : ছোট বড় অনেকগুলো হাতি জলে নেমে জল খাচ্ছিল। আর হাতির মায়েরা স্নান করিয়ে দিচ্ছিল তাদের বাচ্চাদের। আমাদের সঙ্গে ছিলেন বিষ্টু ভাদুড়ী নামে এক শিকারী ভদ্রলোক। খুব সাহসী তিনি। আমাকে বললেন, ঐ বাচ্চাদের গায়ে একটু হাত বুলোবেন? আমি বললুম, খুব মজা হবে তাহলে। ভদ্রলোক অমনি আমাদের মাঝিকে বললেন, আর একটু কাছে নিয়ে চল নৌকো। আর আমাকে বললেন, ওদের মায়ের দিকে একটু নজর রাখবেন। বাচ্চাদের গায়ে হাত দিলে ওরা অনেক সময়ে মারাত্মক ভাবে আক্রমণ করে।

রুদ্ধশ্বাসে মুক্তাউয়া বলে উঠলেন : তারপর?

বললুম : একটু একটু করে আমরা এগোতে লাগলুম। জলের ধাক্কা লাগছিল নৌকোর গায়ে। হঠাৎ দেখি একটা হাতির শুঁড় একেবারে—

আপনার গায়ে ?

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম : একেবারে চোখের সামনে—

গলা জড়িয়ে ধরল আপনার ?

না, তার আগেই চোখ বুজে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলুম। আর আমাদের মাঝি বিদ্যুৎবেগে আমাদের নৌকোটা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

মুক্তাউয়া বলে উঠলেন : খুব বেঁচে গেছেন জানেন! এ তো আমাদের মতো পোষা হাতি নয় যে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে পিঠে তুলে নেবে! ধরতে পারলে তার বাচ্চাকে আক্রমণ করছেন ভেবে পায়ের তলায় ফেলে পিষে ফেলত।

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললুম : কিন্তু সাহস দেখলুম বিষ্টু ভাদুড়ীর। ঠিক সেই মুহূর্তের একখানা ছবি তুলে নিয়েছিলেন। আর আমাকে বলেছিলেন যে সেই ছবিটা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেবেন।

মুক্তাউয়ার কৌতূহল প্রবল। জিজ্ঞাসা করলেন : ছবিটা দেখেছিলেন খবরের কাগজে ?

বললুম : না।

কেন, ছাপা হয়নি ?

কোন্ কাগজে ছাপতে দিয়েছিলেন, তা আমাকে বলেননি।

ইস্! সেকথা জেনে নেওয়া আপনার উচিত ছিল। তার চেয়েও ভাল হত একটা কপি চেয়ে নিয়ে আপনার অ্যালবামে রেখে দিলে। এই রকমের একটা ঘটনা ভাগ্য প্রসন্ন থাকলেই ঘটে।

বললুম : সেই জন্যেই তো বলছিলুম, এরই নাম সৌভাগ্য।

মিস্টার সোমান্না এতক্ষণ একটি কথাও বলেননি। এই বারে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলেন : গল্পটা বানিয়ে বললেন না তো!

আমি খুব গম্ভীর হয়ে বললুম : ছি ছি, বানিয়ে আপনাদের গল্প বলব কেন!, তাহলে তো বলতেই পারতুম যে হাতির একটা

বাচ্চা নৌকোয় তুলে নিয়ে এসেছিলুম, সেই বাচ্চাটা এখন আমার বাড়ির পুকুরে জল খায় আর আমার গায়ে জল ছেটায়।

মুক্তাউয়া বললেন ঃ ঠিক বলেছেন। এঁরা নিতান্ত ভীরু কিনা, তাই সত্যি ঘটনাও বিশ্বাস করতে পারেন না।

মুক্তাউয়ার এই কথায় আমার মনে একটা অপরাধ বোধ জাগল। মনে হল, আমি তার সরল বিশ্বাসেরই সুযোগ নিয়েছি। কিন্তু তবু আমি সত্য কথা স্বীকার করতে পারলুম না।

দিনের আলো তখন নিবে এসেছিল। কিন্তু ঘড়ির দিকে চেয়ে বুঝতে পারলুম যে সূর্যাস্তের এখনও অনেক দেরি আছে। মাথার উপরের আকাশ দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে সামনের মেঘ। মেঘে মেঘে সমস্ত আকাশটা কালো হয়ে যেন মাথার উপরে নেমে এসেছে। মনে হল যে দুর্যোগের আভাস পেয়েই মিস্টার চাঙ্গাপ্পা নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের কথায় তাঁর মন আছে কিনা তাও বুঝতে পারলুম না।

মিস্টার সোমান্না আমাদের পেরিয়ারের গল্প শেষ হতে দিলেন না, বললেন ঃ হাতির সাঁতার কাটা দেখেন নি ?

পিছনে এক নজরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করলুম যে তিনি তামাসা করছেন, না সত্যিই জানতে চাইছেন। হাতি সাঁতার কাটে বলে শুনেছি, কিন্তু নিজের চোখে কখনও দেখি নি। তাই মিথ্যে কথা বলার সাহস পেলুম না। সংক্ষেপে বললুম ঃ না।

দেখেন নি! আশ্চর্য!

আশ্চর্য কেন ?

পেরিয়ার লেকে ঘুরে বেড়ালেন, অথচ হাতির সাঁতার দেখেন নি ভাবতেই আশ্চর্য লাগছে। লোকে তো হাতির সাঁতার দেখতেই সেখানে যায়।

এবারে সীতাউয়া বললেন ঃ তুমি আবার এ সব কোথায় শুনলে ?

মিস্টার সোমান্না বললেন ঃ আমার কি কিছু শুনতেও নেই নাকি ?

মুক্তাউয়া বললেন : বলুন আপনি।

সোমান্না বললেন : আমি শুনেছি যে যেখানে জলের স্রোত বেশি, হাতি সেখানেই সাঁতার কাটে। মনে হয় যে জলে স্রোত না থাকলে তার অসুবিধা হয়। হাতির সাঁতার দেখতে নাকি ভারি মজা লাগে।

কী রকম ?

বলে আমি পিছন ফিরে তাকালুম।

মিস্টার সোমান্না বললেন : তার সমস্ত শরীরটা থাকে জলের নিচে, জলের ওপরে জেগে থাকে তার পিঠের শিরদাঁড়া আর মাথার ওপরটা।

শুঁড় ?

শুঁড় জলের নিচেই থাকে। তবে মাঝে মাঝে ওপরে তোলে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে। এই ভাবে সাঁতার কেটেই হাতি নদী পেরোয়।

সীতাউয়া বললেন : কিন্তু সাঁতার কাটা হাতি শেখে কেমন করে ?

মিস্টার সোমান্না এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না, বললেন : পেরিয়ারে গেলে হাতিকেই এ কথা জিজ্ঞেস করব।

তারপরে আমাকে বললেন : সেখানে আর কি কি জন্তু জানোয়ার দেখেছিলেন ?

বললুম : বাঘ বা হরিণ দেখতে পাই নি বলে আপসোস করেছিলুম। কিন্তু তখন জানতুম না যে সেখানে আরও নানারকমের পশুপাখি আছে।

মুক্তাউয়া বললেন : এখন নিশ্চয়ই জানেন ?

বললুম : ফিরে আসার পর একখানা বই পড়ে অনেক কিছুই জেনেছি। তার মধ্যে প্রথম কথা হল যে এটি দেশের সবচেয়ে বড় অভয়ারণ্যের মধ্যে একটি। একশো বছর আগে পাহাড়ে ঘেরা একটি

উপত্যকায় পেরিয়ার নদীকে বেঁধে হাইডেল প্রজেক্ট তৈরির কাজে যে কৃত্রিম জলাশয়টি তৈরি হয়েছিল, তারই নাম পেরিয়ার লেক। এর আয়তন ছাব্বিশ বর্গ কিলোমিটার। আর একে ঘিরে যে সাতশো বর্গ কিলোমিটার অরণ্য তাই এখন পেরিয়ার স্যাঙ্কচুয়ারি নামে পরিচিত। এখানকার হাতি রক্ষার জন্যই এই অরণ্যকে অভয়ারণ্যে পরিণত করা হয়। এত কাছে থেকেও এমন সুন্দর পরিবেশে ভারতীয় বা এশিয়াটিক হাতি দেখা বা তার ছবি নেওয়া আর কোথাও সম্ভব নয়। যাঁরা দেখতে আসেন তাঁরা মোটর বোটে চেপে এই লেকে ও খালে ঢুকে শুধু অরণ্যের সৌন্দর্য দেখেই মুগ্ধ হন না। নানা জাতের পশুপাখিও দেখতে পান। হাতি ছাড়াও এখানে সাম্বর দেখতে পাওয়া যায় খুব সকালে ও সন্ধ্যায়। শুয়োর ও ঢোলে নামের বুনো কুকুরও দেখা যায়, আর নীলগিরির হনুমান। আইয়াপ্পান কুরুক্কু এডাপালাইয়ামে গৌরের পাল চরে বেড়ায়। এ ছাড়াও কাছিম হেরণ এগ্রেট ডার্টার, কিং ফিসার গ্র্যাক্ল্স, মালাবার গ্রে হর্নবিল ও পাইড গ্রেট হর্নবিল ফিশ-আউলও অনেক দেখা যায়।

মুক্তাউয়া বললেন: ফিশ-আউল কী?

আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলুম: আমাকে এ সব জিজ্ঞেস করবেন না। অনেক কষ্টে এই সব নাম মনে রেখেছি বলে ভাববেন না যে আমি এদের দেখেছি বা কিছু জানি এদের সম্বন্ধে। আমার দৌড় ঐ হাতি পর্যন্ত। দেখেছি বলেই মনে আছে।

মিস্টার সোমান্না বললেন: এইবারেই গিয়েছিলেন?

বললুম: না। এর আগের বারে। কন্যাকুমারী থেকে ফেরার পথে কোট্টায়াম নামের একটা শহর পর্যন্ত রেলগাড়িতে এসে পঁচাত্তর মাইল পথ ট্যাক্সিতে যাতায়াত করেছিলুম। বাসেও যাওয়া আসা যায়, তাতে একদিন থাকতে হয় সেখানে। থাকবার জায়গার যে অভাব নেই, তা দেখে এসেছিলুম। অরণ্যনিবাস হোটেল, হোটেল

পেরিয়ার ভিউ, পেরিয়ার হাউস, কুমিলিতে রিজ হোটেল, এড়াপালাইয়াম টুরিস্ট বাংলো—এ সবই ভাল বাসস্থান। ওয়াইল্ড্ লাইফ প্রিজার্ভেশন অফিসার থাকেন তেক্কাডিতে। কিন্তু একটি কথা জেনেছিলুম ফেরার পরে।

কী কথা?

টুরিস্টদের কাছে সেইটেই সবচেয়ে কাজের কথা। এই অভয়ারণ্য দেখবার জন্যে কোট্টায়াম যাবার দরকার নেই। দক্ষিণ ভারতে মাদুরা একটি অবশ্য দর্শনীয় স্থান, আর অন্যটি কন্যাকুমারী। যাঁরা রামেশ্বরে যান, তাঁরাও মাদুরায় ফিরে আসেন কন্যাকুমারী যাবার জন্যে। মাদুরা থেকে সড়ক পথে পেরিয়ার অভয়ারণ্যের দূরত্ব ঠিক একশো মাইল। এই পথ এসেছে কুমিলির ওপর দিয়ে, আর পেরিয়ার দেখে এখান থেকে কন্যাকুমারীর পথে ত্রিবেন্দ্রামে যাওয়া যায় বাসে। তাতে কষ্টের বদলে আনন্দ বোধহয় বেশি পাওয়া যায়।

কখন আমরা মুদুমালাই অরণ্যের ভিতরে ঢুকে পড়েছিলুম খেয়াল করি নি। এখন আর আকাশ দেখা যাচ্ছে না। সামনে পিছনে ও চারিদিকেই অরণ্য। বর্ষার পরে ঘন পাতায় ভরে গেছে গাছপালা, মাটির ঘাস বেড়ে উঠেছে এমন ভাবে যে তার মধ্যে বাঘও লুকিয়ে থাকতে পারে। মনে হল যে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তাঁর গাড়ির গতি বোধহয় আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। হেড লাইটের আলোয় সামনের পথ অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। গাড়ির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ কানে আসছে না। বুঝতে পারলুম যে মুদুমালাই অরণ্যে প্রবেশের পথে তেপ্পাক্কাডু আমরা ছেড়ে এসেছি। এই ভাবে এগিয়ে ময়ার নদী পেরোলেই বাঁদীপুর অরণ্য। এই দুটি অরণ্য আমাদের তাড়াতাড়ি অতিক্রম করতে হবে।

এর পরেও আমাদের অনেকটা পথ। বাঁদীপুর থেকে গুন্দ্‌লুপেট বারো মাইল, তারপর নাঞ্জনগুড শহর প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে:

মাইশোর সেখান থেকে আরও চোদ্দ মাইল। মাইসোরে আমাদের সময়মতো পৌঁছতে হবে। রাত্রিবাস করতে হবে সেখানে। তারপরে আবার যাত্রা।

পথঘাটের এই হিসেব আমার জানা ছিল না। ছোটখাটো জায়গার নামও আমি জানতুম না। মিস্টার চাঙ্গাপ্পার কাছেই শুনেছিলুম পরে। আমি তাঁকে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে গাড়ি চালাতে দেখে একসময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলুম: আপনার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন: কেন বলুন তো?

বললুম: অনেকক্ষণ থেকে একটা কথাও বলেন নি!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: আপনার আশীর্বাদ সফল করবার জন্যে মনের সঙ্গে বেঁধে রেখেছি দৃষ্টিকে।

আমার আশীর্বাদ!

এরই মধ্যে ভুলে গেলেন! যাত্রার আগে আপনি তো আশীর্বাদ করেছিলেন যে আমরা একটা হাতি দেখতে পাব! ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ মিথ্যা হয় না বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি এই অন্ধকারে আচ্ছন্ন অরণ্যের দিকে চেয়ে বললুম: না না, আমার আশীর্বাদ সত্য হয়ে দরকার নেই। যদি বলেন তো আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা মুচকি হেসে বললেন: আপনিও ভয় পেয়ে গেলেন! তাহলে কার সাহসে আমি আমার জীবন সার্থক করব?

একটা হাতি এই গাড়ির সামনে বেরোলেই কি আপনার জীবন সার্থক হয়ে যাবে!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: আমার কত দিনের শখ; মুক্তাকে একটা বুনো হাতি দেখাব খুব কাছে থেকে, যেমন আপনি দেখেছেন পেরিয়ার লেকে। হে ভগবান, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ, আমার প্রাণের প্রার্থনা, আর মুক্তার শখ এই তিন পাখি তুমি এক ঢিলে মারতে

পারবে। দোহাই বাঙালী দাদা, চারিদিকে কড়া দৃষ্টি রাখুন, ভগবানের দয়ায় হাতি বেরোলে আমাদের দৃষ্টি যেন না এড়ায়।

আমি তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারলুম না। নিঃশব্দে চেয়ে রইলুম সামনের দিকে। আমার মনে হল যে আকাশে আর সূর্য নেই, পৃথিবীতে রাত্রি এখন গভীর হয়েছে, রাতের অন্ধকারে আমরা অনিশ্চয়ের দিকে ছুটে চলেছি।

কেন জানি না সেবারের কথা আমার মনে পড়ে গেল। সেবারেও আমরা এই বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছিলুম। কিন্তু আজকের এই বন আর সেদিনের বন যেন এক নয়। সেদিন আকাশে মেঘ ছিল না, গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছিল পথের উপরে। এই রকমের ছোট একখানা গাড়িতেও আমরা যাচ্ছিলুম না, আমরা চলেছিলুম একখানা বিরাট আকারের বাসে। যাত্রীর সংখ্যা তাতে পাঁচজন নয়, বাস ভর্তি ছিল যাত্রীতে। নির্ভয়ে আমরা চলেছিলুম।

কিন্তু আজ কেন যেন ভয়-ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল একটা বিপদের সঙ্কেত পাচ্ছি বাতাসে। মিস্টার চাঙ্গাপ্পা কথা কইতে চাইছেন না, আমরাও নিঃশব্দে চলেছি। আজকের এই চলার সঙ্গে সেদিনের চলার প্রভেদটাই আমার কাছে বড় হয়ে উঠল।

আমি জানি, সেদিন স্বাতি আমার সঙ্গে হাল্কা মেজাজে কথা বলতে চাইছিল। কিন্তু মামা ও মামী জেগে আছেন সন্দেহ করে তাকে মুখ বুঁজে চলতে হয়েছিল। তাঁদের সামনে সে আমার সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বলে নি, তাঁদের কাছ থেকে সরে এসেছে নানা ছুতোয়, আর হাসি ও পরিহাসে ভরে দিয়েছে আমার অনেক সময়। তার আচরণে সংযম ছিল, কথায় কৌতুক ছিল, ব্যবহারে ছিল আন্তরিকতা। আর যা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল আমাকে, তা আমার জন্যে তার একটা বেদনা বোধ। সমাজের কাছে আমি যা পাই নি, তা আমি স্বাতির কাছে পেয়েছি। সেই জন্যেই তাকে

আমি শ্রদ্ধা করেছিলুম।

স্বাতির কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। বারে বারেই মনে হচ্ছে যে এই যাত্রায় সঙ্গে থাকলে সে অনেক বেশি আনন্দ পেত। সে শুধু আনন্দ সঞ্চয়ই করে না, আনন্দ বিলোতেও জানে, ভরে দিতে পারে মানুষের নিঃশব্দ মন। মনে মনে ঠিক করলুম যে এর পরে আর একা কখনও বেরোব না।

১৪

পিছন থেকে মিস্টার সোমান্না বলে উঠলেন : একটু ধীরে চল।

এই কথাতেই আমার অন্যমনস্কতা ভেঙে গেল। দেখতে পেলুম যে সামনের পথটা জলে ভেজা বলে মনে হচ্ছে। এই দিকটায় বোধহয় একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, পথের উপরে সেই জল এখনও শুকোয় নি।

কিছুক্ষণ আগেই মিস্টার চাঙ্গাপ্পা গাড়ির গতি একটু কমিয়ে ছিলেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না, গাড়ির গতিও আর কমালেন না।

মিস্টার সোমান্না বললেন : ভিজে পথে গাড়ির চাকা স্কিড্ করতে পারে। তাই একটু সাবধানে চালানো দরকার।

কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পা এ কথারও কোন উত্তর দিলেন না দেখে মুক্তাউয়া বললেন : বুনো হাতির ভয়ে হরিণের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটছে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা মাথা নেড়ে বললেন : আমার দাদামশায়ের তো এক গণ্ডা হাতি ছিল না! হাতির ভয় যাবে কোথা থেকে!

আমি বুঝতে পারলুম যে দাদামশায়ের হাতির জন্যে মুক্তাউয়ার একটা গর্ব আছে। তাই মিস্টার চাঙ্গাপ্পার এই কথায় তিনি চটলেন না, বরং বললেন : এরা কোন দিন হাতি দেখে নি বলেই এই রকম ভয় পায়।

তারপরেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনিও ভয় পান নাকি?

বললুম : তা একটু পাই বই কি! মনে মনে জানি যে হাতি খুব নিরীহ প্রাণী, কিন্তু যে ভাবে শুঁড় নাড়ে তাতে এক এক সময় বেশ ভয় করে।

মুক্তাউয়া বললেন ঃ আমাদের একটুও ভয় করে না।

কেন ?

ভয় করবে কেন! ছেলেবেলা থেকেই আমরা হাতির পিঠে চড়ে শিকারে যেতাম। হাতির পিঠে চড়তে অভ্যস্ত ছিলাম আমরা।

সত্যি !

মুক্তাউয়া বললেন ঃ বাঘ শিকারে গিয়ে আমরা গাছের ডালে বাঁধা মাচায় উঠতাম না।

তবে ?

হাতির পিঠ থেকেই আমরা গুলি চালিয়েছি বাঘের একেবারে মুখোমুখি হয়ে। কখনও আমাদের গুলি বাঘের গায়ে আগে লেগেছে, কখনও বা বাঘ আগেই লাফিয়ে উঠেছে হাতির পিঠে।

আমি বলে উঠলুম ঃ বলেন কি !

মুক্তাউয়া তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন ঃ বললে এরা বিশ্বাস করে না, সেই সব হাতি এমন শায়েস্তা ছিল যে শুঁড়ে জড়িয়ে আমাদের পিঠে তুলে নিত।

কিন্তু বনের বাঘ তার ঘাড়ের ওপরে উঠলে কী করত ?

বাঘ হাতির পিঠে উঠে করবে কী! শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে তাকে টেনে নামিয়ে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলত। তারপর তাকে পিঠে তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরত।

বাঘকে হাতির পিঠে লাফিয়ে উঠতে দেখে আপনাদের ভয় করত না ?

ভয় কাকে বলে আমরা জানতাম না, আর হাত থেকে বন্দুকও পড়ে যেত না ভয়ে।

আমি বললুম ঃ খুব সাহস ছিল আপনাদের।

মুক্তাউয়া বললেন ঃ জানেন, এ দিকের লোকের হাতির পিঠে চড়া দেখে আমার হাসি পায়।

কেন ?

হাতি বসবে হাঁটু গেড়ে, কেউ মই বেয়ে উঠবে, কেউ দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে উঠবে, কাউকে আবার পেছন থেকে ঠেলে তুলে দিতে হবে। এ সমস্তই হাতির পেছন দিক থেকে। সামনে তার শুঁড় দেখে ভয়েই সবাই জড়োসড়ো।

মিস্টার সোমান্না বললেন : আমরা কতদূর এসেছি ?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : ময়ার নদী আমরা পেরিয়ে গেছি।

মিস্টার সোমান্না বললেন : তাহলে তো আমরা এখন বাঁদীপুরের জঙ্গলে !

শুধু তাই নয়, কাকানাল্লার ফরেস্ট রেস্টহাউসও ছাড়িয়ে গেছি। এইবারে মঙ্গলা নদী পেরোলেই বাঁদীপুর।

মিস্টার সোমান্না বললেন : তারপরেই তো বনের শেষ !

উহুঁ, তারপরেও অনেকটা পথ বনের ভেতর দিয়ে।

একটু থেমে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আবার বললেন : হাঙ্গালা বনের বাইরে। কিন্তু খানিকটা পথ একেবারে বনের ধার ঘেঁষে যেতে হয়। গোপাল স্বামী গেস্ট হাউসে থাকতে হলে হাঙ্গালা থেকেই যেতে হয়।

বলতে না বলতেই মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আচমকা ব্রেক কষে গাড়ি থামালেন। কোন রকমে দু হাতে ড্যাসবোর্ড ধরে আমি আমার মাথাটা বাঁচালুম। কিন্তু পিছন থেকে আর সকলে হুড়মুড় করে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়লেন। মুক্তাউয়া চিৎকার করে উঠলেন : কী রকম গাড়ি চালাও বল তো ! মানুষ মারবে নাকি !

কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তার ঠোঁটের উপরে তর্জনী চেপে চাপা গলায় গর্জন করে উঠলেন : চুপ !

মুহূর্তে সবাই একটা বিপদের আশঙ্কায় শান্ত হয়ে গেলেন। গাড়ির ঠিক সামনে অল্প খানিকটা তফাতেই একটা বিরাট কালো পাথর দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সেটা একটু নড়ে উঠতেই মিস্টার

চাঙ্গাপ্পা গাড়ির বাতি নিবিয়ে দিলেন। বুঝতে পারলুম যে গাড়ির ইঞ্জিন তিনি আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলন।

সামনের পাথরটা সচল দেখে ব্যাপারটা সবাই বুঝতে পেরেছিলেন যে বাঙালী ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ ব্যর্থ হয় নি। গাড়ি থেকে কয়েক হাত দূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটা বুনো হাতি। তার শুঁড়ের আস্ফালন দেখে তার মতিগতি একটুও বোঝা যাচ্ছিল না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। আমিও দেখলুম। না, আশেপাশে বা সামনে পিছনে আর কিছু নেই। এ একটা দলছাড়া হাতি। তাই কোন্ দিকে যাবে তা বোধহয় ভেবে পাচ্চে না।

মিস্টার সোমান্না পিছন থেকে অত্যন্ত চাপা গলায় বললেন: ব্যাক করবে?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা সংক্ষেপে উত্তর দিলেন: না।

আমি দেখতে পেলুম যে তাঁর ডান হাত আছে সেল্‌ফ্ স্টার্টারের উপরে, আর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সামনের পথের উপরে নিবদ্ধ। বাঁ হাতে যে গীয়ারের হাতল ধরে আছেন, তাও দেখতে পেলুম। অত্যন্ত সতর্ক। প্রয়োজনে বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্রতায় সব কিছু করবার জন্য প্রস্তুত। তাঁর এই তৎপরতার ভঙ্গি দেখে আমার খুব বেশি ভয় করছিল না।

হঠাৎ আমার ক্যামেরার কথা মনে পড়ে গেল। কোন রকমে হাতির ঐ শুঁড় নাড়ার একটা ছবি তুলতে পারলে এই ভ্রমণের স্মৃতি আমাদের অক্ষয় হয়ে থাকবে। কিন্তু এই মুহূর্তে গাড়ি থেকে নামা কি উচিত হবে!

বেশিক্ষণ নয়, কয়েকটা মুহূর্ত পরেই বিপদ কেটে যাচ্ছে বলে মনে হল। শুঁড় নাড়তে নাড়তেই হাতিটা সামনের পথ ছেড়ে দিয়ে বাঁ দিকের বনের দিকে পা বাড়াল।

ইতিমধ্যে ক্যামেরাটা আমি খুলে ফেলেছিলুম। হাতিটা পথ

ছেড়ে দিতেই গাড়ির দরজার হাতলে আমি হাত দিলুম। কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমার হাত টেনে ধরে বাধা দিলেন।

সেই দল ছাড়া হাতি হেলতে দুলতে বনের মধ্যে ঢুকে পড়তে না পড়তেই মিস্টার চাঙ্গাপ্পা গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে সেই স্থানটা অতিক্রম করলেন। সময়মতো গাড়ির বাতিও জ্বেলে দিয়েছিলেন। তারপর খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আমাকে বললেন: আপনি কী করতে নামছিলেন?

বললুম: একখানা ছবি তুলে নিতে পারলে চমৎকার হত।

আর হাতি আপনাকে টেনে নিয়ে গেলে কী হত?

মিস্টার সোমান্না বোধহয় কিছু দেখতে পান নি। তাই জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিলেন নাকি?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: ক্যামেরা খুলে বসেছিলেন, আমি টেনে না রাখলে উনি নেমেই পড়তেন।

কী মারাত্মক সাহস!

সাহস নয়, দুঃসাহস। কিন্তু আপনার ফ্ল্যাশ কোথায়? অন্ধকারে কি আপনার ছবি উঠত?

বোধহয় না।

তবে?

বলতে পারলুম না যে এসব কথা আমার মনে আসে নি, একটা গভীর উত্তেজনায় ছবি তোলার কথাই মনে হয়েছিল, তার বেশি কিছু ভাববার মতো মনের অবস্থা ছিল না।

গাড়ির গতি কিছু মন্থর করে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: মুক্তা, তুমি কথা বলছ না কেন! থ্যাঙ্ক্‌স্‌ দাও একটা। তোমার অনেক দিনের শখ—।

ঠিক এই সময়েই সীতাউন্না আর্তনাদ করে উঠলেন: দাঁড়ান একটুখানি।

কেন?

বলেই মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আবার গাড়ির ব্রেক কষলেন।

সঙ্গে জল আছে, ঠাণ্ডা জল?

বলে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সীতাউয়া।

পিছন ফিরে আমি দেখলুম যে মুক্তাউয়া ঢলে পড়ছেন সীতাউয়ার গায়ে। তাঁর জ্ঞান নেই। আর সীতাউয়া মাঝখানে বসে বলছেন: চোখে মুখে জলের ছিটে দিতে হবে।

কিন্তু আমি আশ্চর্য হলুম মিস্টার চাঙ্গাপ্পার কাণ্ড দেখে। কিছুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে হা-হা করে হেসে উঠে বললেন: জলের দরকার নেই, ঠাণ্ডা হাওয়াতেই ঠিক হয়ে যাবে।

বলে আবার গাড়ি চলাতে শুরু করলেন।

এক সময়ে আমার দিকে চেয়ে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: আজ আপনার পায়ের ধুলো নেব। আপনার আশীর্বাদেই আমার জীবন সার্থক হল।

কোন রকম দুর্ভাবনা দেখলুম না তাঁর মুখে। আস্তে আস্তে বললেন: একটু পরেই জ্ঞান ফিরে আসবে। সত্যিকারের জ্ঞান।

কিন্তু তাঁর কথায় আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না, নজর রাখলুম পিছনের দিকে।

সামনে অন্ধকার পথের উপরে আলো ফেলে আমাদের গাড়ি সজোরে ছুটে চলেছে। এখনও দু ধারে ঘন অরণ্য। মাথার উপরে মেঘলা আকাশে সূর্য এখনও ঢাকা পড়ে আছে। কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পার মুখে কোন ভাবান্তর নেই। তাঁর আচরণে কোন উদ্বেগ না দেখে আমি সত্যিই আশ্চর্য হচ্ছি। তিনি নিজে একবারও পিছনে তাকাচ্ছেন না।

সীতাউয়া একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মনে হল। মুক্তাউয়ার সংজ্ঞাহীন দেহটা একটু সোজা করে দিলেন, কিংবা মুক্তাউয়া নিজেই সোজা হয়ে বসলেন। কিন্তু চোখ খুললেন না। কোন কথাও কইলেন না।

সীতাউয়া প্রশ্ন করলেন: কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

কিন্তু মুক্তাউয়া কোন উত্তর দিলেন না।

সীতাউয়া তাঁর বাঁ হাতখানা মুক্তাউয়ার কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে নিলেন দেখে বুঝতে পারলুম যে মুক্তাউয়া এ যাত্রায় এ ধাক্কা সামলে নিয়েছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যে ব্যাপারটা নাটকীয় করে তুলবেন, তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

আরও অনেকক্ষণ চলবার পর যখন ঘন অরণ্য শেষ হয়ে এল, আর আকাশে দেখা গেল আলো, তখন মিস্টার চাঙ্গাপ্পা সকৌতুকে তাকালেন পিছনের দিকে। আর তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুক্তাউয়া বলে উঠলেন : তুমি আর গাড়ি চালিয়ো না।

কেন ?

বলে বিস্ময় প্রকাশ করলেন মিস্টার চাঙ্গাপ্পা। আর আমরাও সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

কিন্তু মুক্তাউয়া তাঁর স্বামীকে বললেন : এত ভয় কিসের !

আর মিস্টার সোমান্নার দিকে চেয়ে বললেন : পথের উপর থেকে গড়িয়ে যে নিচে পড়ি নি, এই আমাদের ভাগ্য !

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বিরক্ত ভাবে বললেন : মানে ?

মানে আবার কী ! তোমার গাড়ি চালানোর ঠেলায় মানুষ ধাক্কা খেয়েই মরবে।

কথাটা এমন ভাবে বললেন যে তিনি যেন গাড়ির ধাক্কাতেই জ্ঞান হারিয়েছিলেন, বুনো হাতি দেখতেই পান নি। আমরা কী বলব ভেবে পেলুম না। কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পা প্রবল কণ্ঠে হেসে উঠলেন।

মুক্তাউয়া শক্ত হয়ে বসে বললেন : অমন অসভ্যের মতো হাসছ কেন ? তুমি কি হেসেই প্রমাণ করবে যে গাড়ি চালাতে জানো !

মুক্তাউয়ার পুরনো মেজাজ দেখে মিস্টার সোমান্না খুশী হয়ে বললেন : নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

সীতাউয়া আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। কিন্তু কোন কথা বললেন না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে তাঁর মন এখন মাইসোরের দিকে। সেখানে পৌঁছবার আগে বোধহয় আর কোন কথা বলবেন না। বলার মতো কোন কথাও খুঁজে পাচ্ছেন বলে মনে হয় না। এখনও তাঁর মুখে কোন ক্লান্তির চিহ্ন নেই। ভোর বেলায় কালিকট থেকে বেরিয়ে নীলগিরি পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছিলেন উটিতে, কোন বিশ্রাম না নিয়েই এখন পাহাড় থেকে নেমে মাইসোরের দিকে ছুটে চলেছেন। এক নাগাড়ে একাই গাড়ি চালাচ্ছেন। তাঁর ক্লান্ত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তা না দেখে আমিই আশ্চর্য হচ্ছি। তাঁর সহিষ্ণুতার প্রশংসা করতে হয়।

কিন্তু তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য হচ্ছি অন্য কথা ভেবে। মিস্টার ও মিসেস সোমান্না কিছুক্ষণের জন্য আমার মন থেকে মুছে গেলেন, অস্পষ্ট হয়ে গেলেন মিস্টার চাঙ্গাপ্পাও। এক নতুন আলোয় আমি উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখলুম মুক্তাউয়াকে। মুক্তার মতো সুন্দর ও কোমল, কিন্তু এখনও বুঝি ঝিনুকের কঠিন আবরণ থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসেন নি। দেখলুম অল্পক্ষণের জন্যে, আর বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলুম।

সীতাউয়ার একটা প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠলুম। মুক্তাউয়াকে তিনি প্রশ্ন করলেন: কাল সকালে তোমরা কেন বেরোলে না?

মুক্তাউয়া সংক্ষেপে বললেন: সরস্বতীর জ্বর হয়েছিল।

সরস্বতী কে?

সামনে থেকে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: মুক্তার নতুন বেরাল।

মিস্টার সোমান্না হেসে উঠলেন। কিন্তু আমি হাসতে পারলুম না। কেন এমন হয় তা বুঝি না। যার বাহিরটা এমন রুক্ষ ও কঠিন, তার ভিতর এমন ভীরু ও কোমল হয় কী করে! মানুষ কি বহুরূপী! না তার বাহিরের রূপ একটা ছদ্মবেশ!

এ প্রশ্নের জবাব কি কেউ দিতে পারে!

১৫

আমরা অরণ্য পেরিয়ে এলুম। উজ্জ্বল আলোয় পৃথিবী এখনও হাসছে। আকাশে মেঘ নেই, রৌদ্রে ঝলমল করছে এদিকের পৃথিবী। মনে হল, আমরা পৃথিবীর অন্যধারে এসে পৌঁছেছি। এধারের পৃথিবী ভয় পেতে জানে না, জানে প্রসন্ন মনে হাসতে। এই সুন্দর পৃথিবী এক নিমেষে আমাদের বুকেও সাহস ভরে দিল।

মাইসোরের পথে ছুটতে ছুটতে আমার তাপ্তির কথা মনে পড়ে গেল। তাপ্তিও কুর্গের মেয়ে। কিন্তু সে তার নাম বলবার সময় আম্মা বা উয়া যোগ করে নি, শুধু বলেছিল তাপ্তি। সে চাঙ্গাপ্পা, না সোমান্না, না আর কিছু, সে কথা সে আমাদের বলে নি। সে চায় নি যে তাকে আমরা আবার খুঁজে পাই, বা তার পরিচয় দিই অপরকে। কিন্তু তাকে ভোলা যায় না, সম্ভব নয় তাকে ভুলে যাওয়া।

তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল মাইসোরের রিটায়ারিং রুমে। মার্কারা থেকে এসে সে ম্যাড্রাসের একখানা টিকিট কেটে আশ্রয় নিয়েছিল একটা ঘরে, আর সেই ঘরেই জায়গা পেয়েছিল স্বাতি। তার সঙ্গে পরিচয়ের পরেই আমরা বুঝতে পেরেছিলুম যে পৃথিবীটা ছোট নয়, এমনি করে ঘরের বাহিরে পা দিয়েই বোঝা যায় মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন। ইঁটের দেওয়ালে ঘেরা ঘর আর বারান্দায় ঘুরে শুধু স্ত্রীপুত্রকন্যাকেই আপন জন বলে মনে হয়। পরিবারের আর পাঁচজনকেও অবান্তর মনে হয় অনেক সময়ে। গ্রামের ভাঙা বাড়িতে শুনেছি আত্মীয়তার গণ্ডি এতটা সঙ্কীর্ণ নয়। কিন্তু পথে বেরিয়ে যে আত্মীয়ের সংখ্যা বাড়ে তা সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। বিদেশে গিয়ে নাকি মনে হয়, বসুধৈব কুটুম্বকম। পৃথিবীটাই যেন নিজের ঘর, আর মানুষ মানেই আত্মীয়। দুদিনেই তাপ্তি আমাদের আত্মীয় হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তার সঙ্গে আজকের এই দুই মহিলার আমি কোন মিল খুঁজে পাচ্ছিলুম না, বরং তার পার্থক্যটাই যেন আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হঠাৎ বলে উঠলেন: এখনও আপনার ভয় কাটে নি! গুন্দ্‌লুপেটে গরম কফি খেলে বোধহয় আরাম পাবেন।

এ কথার প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নেই। তাই আমি নীরবে রইলুম। মিস্টার সোমায়া বললেন: আপনাদের দিকে কি এ রকমের অরণ্য নেই?

বললুম: থাকবে না কেন!

তবে আপনার মুখ এখনও থমথম করছে কেন?

কিন্তু এই অভিযোগের পরেও তাপ্তির কথা আমি বলতে পারলুম না। মনে হল, তাকে আড়াল করে রাখাই আমার উচিত হবে। তাই বললুম: আমাদের বাড়ির প্রায় দরজাতেই জল্‌দাপাড়ার জঙ্গল।

মুক্তাউয়া তখন একেবারে সহজ হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন: সেখানে আপনারা হাতি দেখেন নি বুঝি!

বললুম: শুধু হাতি নয়, সেই অরণ্যে গণ্ডারও আছে। বাঘ চিতা হরিণ শুয়োর—কোন জন্তুরই অভাব নেই। নানা রকমের পাখিও দেখবেন।

সীতাউয়া বললেন: পাখিও আছে?

বললুম: নানা রকমের পাখি। লেসার ফ্লোরিকান, গ্রেট স্টোন প্লোভার, লেসার অ্যাড্‌জুটান্ট, কালো গর্দান স্টর্ক, লাল বন-মোরগ—

কথার মাঝখানেই সীতাউয়া বলে উঠলেন: এ সব দেখেছেন আপনি?

দেখি নি বলতে পারলুম না, আবার দেখেছি বললেও বিপদ হতে পারে। অনেক কষ্টে বই-এ পড়া নাম মনে রেখেছি। তাদের সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলেই বিপদ হবে। তাই উত্তরটা একটু

ঘুরিয়ে দিলুম, বললুম: কত রকমের পাখি আছে বলে, সব কি আর সব সময়ে দেখতে পাওয়া যায়!

মিস্টার সোমান্না জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার বাড়ি থেকে কত দূরে?

বললুম: খুব কাছে। কিন্তু আমার বাড়ি কোথায় তা তো বোঝাতে পারব না। তার চেয়ে সহজে বলি যে দার্জিলিঙে যাবার এয়ার পোর্টের নাম বাগ্‌ডোগরা। সেখান থেকে পঁচানব্বই মাইল পূর্বে। হাসিমারা নামে আর একটা জায়গাতেও প্লেন নামে, সেখান থেকে মাইল চারেক দূরে। হিমালয় থেকে ভূটানের মাঝখান দিয়ে নেমে এসেছে তোর্সা নদী, তারই তীরে এই অরণ্য। বড় বড় গাছপালা আর লম্বা ঘাসের মধ্যে বড় বড় গণ্ডার ঘুরে বেড়ায়। হাতির পিঠে চেপে আপনি গণ্ডার দেখতে পাবেন অনায়াসে।

মুক্তাউয়া বললেন: গণ্ডার হাতিকে আক্রমণ করে না?

আমি বললুম: বনের পশু তো মানুষ নয়, অকারণে তারা কাউকেই আক্রমণ করে না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হা হা করে হেসে উঠে বললেন: ঠিক বলেছেন আপনি। মানুষই সবাইকে অকারণে আক্রমণ করে।

বললুম: এই দেখুন না, উটির রিটায়ারিং রুমে আমি চুপচাপ শুয়েছিলুম—

আমার কথা শেষ হবার আগেই মিস্টার সোমান্না অট্টহাস্য করে উঠলেন। আর তার কারণ বুঝতে না পেরে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আশ্চর্য হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। একটা মুহূর্তের জন্যে, তারপরেই আবার তাঁর দৃষ্টি পথের উপরে নিবদ্ধ করলেন।

তাঁর প্রশ্নটা অব্যক্ত হলেও মিস্টার সোমান্না বললেন: সে গল্পটা তোদের বলা হয় নি।

সীতাউয়া বলে উঠলেন: সব গল্পই যে বলতে হবে তার কী মানে আছে!

মিস্টার সোমান্না বললেন : বলবার মতো গল্প যে !

আমি কাতর স্বরে বললুম : না না, বলবেন না আপনি। মিসেস সোমান্না যখন বারণ করছেন—

মিস্টার সোমান্না বললেন : স্ত্রীলোকের হাতের মার খেয়েছেন, সে কথা স্বীকার করতে আপনার লজ্জা করবেই তো ! চোরের কিল কিনা !

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : শুনি শুনি, গল্পটা ইণ্টারেষ্টিং বলে মনে হচ্ছে !

মিস্টার সোমান্না বললেন : আমি কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছি মনে করে মনের সুখে সীতা উত্তমমধ্যম হাত চালাল, আর কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে এলেন আমাদের বাঙালী দাদা।

দুজনেই এক সঙ্গে হেসে উঠলেন। আর মুক্তাউয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি ?

আমি কিছু বলবার আগেই মিস্টার সোমান্না বললেন : সত্যি মানে ! একেবারে খাঁটি সত্যি। এর চেয়ে বেশি সত্যি আর কিছু হতে পারে না। তাই না বাঙালী দাদা ?

ভালোমানুষের মতো মুখ করে আমি বললুম : কতটা সত্যি, আর কতটা স্বপ্ন তা আমি বলতে পারব না।

মানে ?

বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : আমি ঘুমোচ্ছিলুম খুব আরামে। ঘুম ভাঙার পর চোখের সামনে একটি সুন্দর মুখ দেখে মনে হল যে পরীর রাজ্যে পৌঁছে গেছি। মিস্টার সোমান্না আমাকে বোঝাতে চাইছেন যে আমি ওঁর স্ত্রীর হাতে মারধোর খেয়েছি। কিন্তু সত্যি বলছি আপনাকে—

আমার কথা শেষ হবার আগেই মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আবার অট্টহাস্য করে উঠলেন। তারপর গাড়ির গতি খুব কমিয়ে হাসতে হাসতেই বললেন : ওয়াণ্ডারফুল উইট বাঙালী দাদা, আপনার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে।

আমি পিছন ফিরে দেখলুম যে লজ্জায় সীতাউয়ার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

আমরা যে গুন্দ্‌লুপেটে পৌঁছে গিয়েছিলুম তা বুঝতে পারি নি। মিস্টার চাঙ্গাপ্পা একটা রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি দাঁড় করাতেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সবাই নেমে পড়লুম।

চায়ের সঙ্গে আমরা গরম বড়া খেলুম। তারপর আবার যাত্রা। মিস্টার সোমান্না এবারে আগেভাগেই স্টীয়ারিঙে উঠে বসলেন। বললেন : এইবারে তুমি একটু বিশ্রাম নাও।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আর আপত্তি করলেন না। মুক্তাউয়াকে তিনি মাঝখানে নিয়ে বসলেন, আর আমার পুরনো জায়গাটি বহাল রইল। কিন্তু আমাকে তিনি নীরবে থাকতে দিলেন না। বললেন : আপনার জল্‌দাপাড়ার গল্পটা এইবারে শেষ করুন।

আমি বললুম : জল্‌দাপাড়ার কথা তো শেষ হয়ে গিয়েছিল।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : উঁহু, শেষ হল কোথায়! প্লেনে যদি আমরা বাগ্‌ডোগরায় যাই, কিংবা হাসিমারায়, তবে রাত্রিবাস করব কোথায়? আপনার বাড়ি তো দূরে বলছেন!

বিস্ময়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলুম। সারাদিন যিনি অক্লান্তভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তিনি এমন মনোযোগ দিয়ে কথা শুনেছেন আমার! অথচ তাঁর কর্তব্যে এতটুকু ত্রুটি হয় নি একটি মুহূর্তের জন্যেও। তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কথা মেনে নিয়ে বললুম : সত্যি ভুল হয়ে গেছে সে কথা বলতে। এ দিকের মতো সেখানে থাকবার জায়গা অনেক নেই। জল্‌দাপাড়ায় একটিমাত্র ফরেস্ট রেস্টহাউস আছে। এর সম্বন্ধে যাবতীয় খবরাখবর পাওয়া যায় কলকাতায় ৬ নম্বর লায়ন্‌স রেঞ্জে ফরেস্ট ইউটিলাইজেশন অফিসারের কাছে, শুনেছি যে হলং আর নীলপাড়াতেও ফরেস্ট রেস্টহাউস আছে। আর ফরেস্ট আফিস আছে কুচবিহারে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: আরও একটি কথা বাদ পড়েছে আপনার।

কী?

এই বন কত বড় তা আপনি বলেন নি।

হেসে বললুম: আপনাদের কাছে পরীক্ষা দিতে হবে জানলে মুখস্থ করে রাখতুম।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পাও হেসে বললেন: আপনার পরীক্ষা তো শুরু হল। গাড়ি চালানোর কাজে আমাকে ছুটি দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেন নি।

বললুম: তাতে প্রাণের ভয় কমেছে।

কিন্তু পরীক্ষার ভয় যে বাড়ল!

ফেল হবার অভ্যাস আছে।

কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পা নাছোড়বান্দা, বললেন: একটা অনুমানের কথা বলুন।

বললুম: এই ধরুন একশো বর্গ কিলোমিটার।

ব্লাফ দিচ্ছেন না তো!

ব্লাফ নয়। ভুল বলে থাকতে পারি। তার কারণ নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর পুরোপুরি আস্থা নেই।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: নিজেদের স্মৃতিশক্তি আরও দুর্বল বলে এই অপরাধ ক্ষমা করা যেতে পারে। কী বল সোমান্না!

কোন উত্তর না পেয়েও তিনি বললেন: এইবারে বাঙলার আর সব অরণ্যের কথা বলুন।

এ তো রীতিমতো বিপদ দেখছি!

ঠিক আছে বাঙালী দাদা, আর কোন প্রশ্ন আমরা করব না। যতটুকু জানা আছে ততটুকুই বলুন।

বললুম: গরুমারা মহানদী সিঞ্চল।

বাধা দিয়ে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: না না, একসঙ্গে নয়। একটা একটা করে বলুন।

বললুম: গরুমারা আর চাপরামারি জল্‌দাপাড়ার কাছেই। ফরেস্ট রেস্টহাউস আছে জলপাইগুড়িতে। জল্‌দাপাড়ায় যা দেখতে পাবেন, তার সবই আছে সেখানেও। বাঘ চিতা হাতি গণ্ডার গৌর সাম্বর কাকর—

বাধা দিয়ে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: জল্‌দাপাড়ায় আপনি গৌর সাম্বর কাকরের কথা বলেন নি।

আমি বলে উঠলুম: আছে আছে, সেখানেও এসব আছে। মুদুমালাই বাঁদীপুরের মতো জঙ্গলও বোধহয় একটাই। জংলী হয়ে জঙ্গলের কথা আরও ভাল বলতে পারতুম।

আচ্ছা বলুন তারপর।

বললুম: দার্জিলিঙ পাহাড়ের নিচের দিকে মহানন্দী, আর ওপরের দিকে সিঞ্চল। নিচে থাকবার জায়গা শুক্‌না আর সেবকে, আর ওপরে টাইগার হিলের টুরিস্ট বাংলোয়। এ সব জায়গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই।

আপনার দেখা জায়গা নিশ্চয়ই?

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙে যাবার পথে শুক্‌না, আর সেবক কালিম্পঙে যাবার পথে। দার্জিলিঙে নিশ্চয়ই গেছেন?

পিছন থেকে মুক্তাউয়া বলে উঠলেন: কোথাও আমাকে নিয়ে যায় নি।

বললুম: সত্যিই দার্জিলিঙের চেয়ে সুন্দর পাহাড় এদেশে আর একটিও নেই। একবার নিশ্চয়ই যাবেন।

সীতাউয়া বললেন: কাশ্মীর?

বললুম: তার সৌন্দর্য অন্যরকম। হিমালয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার চেয়ে সুন্দর গিরিশৃঙ্গ আর একটিও নেই। এই বরফের পাহাড় ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যায়। একমাত্র রাণীখেত বা কৌশানিতে এই রকমের বরফ দেখা যায়। কিন্তু সেখানে সূর্যোদয় দেখবার জন্যে কোন টাইগার হিল নেই।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বলে উঠলেন: আপনি তো জঙ্গলের কথায় টাইগার হিলের নাম করলেন!

তাও ঠিক। আসলে টুরিস্ট বাংলো তৈরি হয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্যে। আর এই পাহাড়ের গায়েই সিঞ্চলের লেক ও জঙ্গল। তাতে চিতা ভালুক ঘোরাল কাকার ও বুনো কুকুর আছে।

আর নিচের জঙ্গলে?

সেখানে চিতার সঙ্গে বাঘ আর হাতি আছে, আর আছে গৌর চিতল কাকার বনবেরাল আর নানা রকম পাখি।

পিছন থেকে মুক্তাউয়া প্রশ্ন করলেন: সুন্দরবনের কথা বললেন না?

আশ্চর্য হয়ে বললুম: জানেন নাকি সুন্দর বনের নাম?

মুক্তাউয়া বললেন: নামটাই শুধু জানি।

বললুম: আমিও তাই। সুন্দরবনে বাঘ আছে জানি। বিখ্যাত বাঘ, নাম সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তারা থাকে দক্ষিণরায়ের রাজত্বে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: দক্ষিণরায় কে?

বললুম: বাঘেদের দেবতা। খুব জাগ্রত দেবতা। সমস্ত সুন্দর-বন এলাকায় তাঁর পুজো হয় ঘটা করে। দক্ষিণরায়ের পুজো না করে সুন্দরবনে ঢুকেছেন কি বাঘ আপনাকে খেয়ে ফেলবেই।

সুন্দরবন কোথায়?

একেবারে সমুদ্রের ধারে।

সমুদ্র!

হ্যাঁ, বাঙলার দক্ষিণেই তো বঙ্গোপসাগর। সমস্ত নদী নালা দক্ষিণে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। আর বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে অনেক। ট্রেনে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত যেতে পারবেন। তারপর মোটরে বা বাসে কাকদ্বীপ, নামখানা। সুন্দরবনে ঢুকতে হলে নৌকো বা মোটর

লঞ্চ ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যদি সেখানে যেতে চান তো নিজের প্রাণটা হাতে নিয়ে যাবেন।

কেন?

বললুম: ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমীর।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমার ভয়ার্ত স্বর শুনে হেসে উঠলেন। তাই দেখে আমি বললুম: আপনি হাসছেন! ভেবেছেন বন্দুক হাতে নিয়ে যাবেন! কিন্তু তার উপায় নেই। সরকারের বাঘের প্রকল্প, বাঘ মারতে পারবেন না। কুমীরেরও প্রকল্প। কুমীর আপনাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আপনি কুমীরের গায়ে হাত তুলতে পারবেন না। সেই জন্যে আপনাদের থাকবার জন্য কোন জায়গা তৈরি হয় নি। তবে হ্যাঁ, বকখালিতে একটা টুরিস্ট লজ আছে। সেখানে থেকে সুন্দরবন এলাকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। অথবা ক্যানিং রেল স্টেশন থেকে মোটর লঞ্চে করে সজনেখালিতে গিয়ে সুন্দরবনের টাইগার রিজার্ভ দেখতে পারেন, আর একই সঙ্গে কুমীরও দেখে ফিরতে পারবেন।

মুক্তাউয়া বললেন: তাহলে আপনারা বাঘের ভয় পান না মনে হচ্ছে!

সঙ্গে সঙ্গে আমি বললুম: একটুও না।

জানি জানি, আপনার বাঘ শিকারের গল্প আমরা আগেই শুনেছি।

বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমাকে থামিয়ে দিলেন।

মুক্তাউয়া সকৌতুকে বললেন: এরা একটা বাঘ মারলে কত বড় উৎসব হয় জানেন?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: বাঘ মারার উৎসব!

মার্কারায় যাচ্ছেন তো! নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন। কিন্তু—

কিন্তু কী?

আমাদের গাঁয়ের লোকেরা পিটিয়ে বাঘ মারে বলে শুনেছি। কিন্তু তাদের তো কোন উৎসব হয় না!

মুক্তাউয়া বললেন: তাহলেই বুঝুন, এরা এক একজন কত বড় বীর!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: এবারে রাজস্থানে গিয়ে একটা বাহেড়া ধরে আনব, আর তা না পারলে তাদের হাতেই প্রাণটা দিয়ে আসব।

তার পরেই মিনতি করে আমাকে বললেন: আমি আপনার অনেক সেবা করব বাঙালী দাদা, আমাকে আপনি আর একবার আশীর্বাদ করবেন।

বলে গম্ভীর হয়ে রইলেন।

আমরা এখন মাইসোরের দিকে ছুটে চলেছি।

১৬

সেবারে আমরা উটি থেকে যাত্রা করেছিলুম সকালের দিকে। বাসের যাত্রীরা দুপুরের আহার সেরেছিলেন গুন্দ্‌লুপেটে। তারপর ঘুমে সবার চোখ জড়িয়ে এসেছিল। দুধারের পথের শোভা দেখবার জন্য আমিও ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলুম খানিকক্ষণ। তারপরে হার স্বীকার করেই দেখতে পেয়েছিলুম তা ঘুম নয়, তন্দ্রা। একটা আচ্ছন্ন ভাব কিছুক্ষণ শরীরটাকে চেপে রইল। মামার নাক ডেকে উঠছিল থেকে থেকে, মাঝে মাঝে চমকে উঠছিলেন। যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখেছিলুম, সবাই এ ভাবেই চলেছে।

কিন্তু আজকের অবস্থা অন্য রকম। আজ এই ছোট গাড়ির মধ্যে সবাই জেগে আছেন, কথা বলছেন সবাই। আমাদের দুপুরের আহার বনের হাতি দেখেই হজম হয়ে গিয়েছিল, আর গুন্দ্‌লুপেটের কফি তাড়িয়ে দিয়েছিল চোখের ঘুম। আমরা কথা বলতে বলতেই চলেছি।

পিছন থেকে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হঠাৎ বলে উঠলেন: বাঙালী দাদা আমাদের ফাঁকি দিচ্ছে।

মুক্তাউয়া বললেন: কেমন করে?

উনি বাঙলার কয়েকটা বনের নাম করেই চুপ করে গেলেন। ভাবখানা এই রকম যে ওঁর বলার কথা বুঝি ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা কি এতই বোকা যে ঐ অঞ্চলে যে আরও অনেক বন আছে তা জানি নে!

আমার পাশ থেকে মিস্টার সোমান্না বললেন: আলবৎ জানি। এবং জানি বলেই মাইসোর পর্যন্ত আমরা শুধু বন জঙ্গলের কথাই শুনব।

বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে আমি বললুম : নিজের বাড়ির কাছে বলে দু-চারটে নাম জেনেছিলুম। আপনারা কি ভাবছেন, বন জঙ্গলে শিকার করে বেড়ানো আমার পেশা ?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তখনই বললেন : পেশা ভাবছি না, ভাবছি শখ। শখের জন্যেই আপনি অনেক খবর রেখেছেন।

মিস্টার সোমান্না বললেন : আমরা তো দেখতে পাই, শখের জন্যে বাঙালীবাবুরা সারা ভারতে কেমন ছুটোছুটি করে বেড়ায় !

পিছনে তাকিয়ে দেখলুম যে সীতাউয়া ও মুক্তাউয়া দুজনেই হাসছেন মুখ টিপে। কথা বাড়ালে আমার দুরবস্থা তাঁরা আরও বেশি উপভোগ করবেন। তাই বললুম : আমি যতটুকু জানি বলব, কিন্তু তার পরে আপনাদের বলতে হবে। তখন ফাঁকি দিলে চলবে না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা গম্ভীর ভাবে বললেন : আপনি অবশ্যই এ দাবী করতে পারেন। বলুন এবারে।

বললুম : কিছু দিন আগে পেটের দায়ে আসামে চাকরি করতে গিয়ে কয়েকটা নাম শুনে এসেছি। তার মধ্যে প্রধান হল কাজিরঙ্গা, মানস ও সোনাইরূপা, আর অপ্রধান হল গরমপানি লাওখোয়া ওরাং ও পভা। এ ছাড়া অরুণাচল প্রদেশে আছে নামদাফা, আর মণিপুরে কেইবুল লামজাও।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বিস্ময়ের সুরে বললেন : গোটা রাজ্যটাই জঙ্গল নাকি ?

বললুম : পাহাড় থাকলেই জঙ্গল থাকে, আর জঙ্গল থাকলেই একটা নাম। আসামে যত পাহাড়, তত জঙ্গল। সব জঙ্গলের নাম বলতে পারলুম কিনা জানি না।

যতটা বললেন, ততটাই বুঝিয়ে বলুন। সব নামগুলো তো মনে থাকবে না, জানার কথা কিছু মনে রাখার চেষ্টা করা যাবে।

তাহলে এই ভাবে মনে রাখুন। বাঙলায় হিমালয়ের পাদদেশে

যে অরণ্যের কথা বলেছি, তা আসামেও বিস্তৃত। ভুটানের দক্ষিণে বাঙলায় যেমন চাপরামারি গরুমারা ও জলদাপাড়া, তেমনি আসামে মানস। ভুটান ও ভারত এই দুই দেশের মাঝখানে প্রবাহিত হচ্ছে মানস নদী, তারই দক্ষিণ তীরে এই সুন্দর অরণ্যে জলদাপাড়ার মতোই সব জন্তু আছে—হাতি গণ্ডার বুনো মোষ নানা জাতের হরিণ শুয়োর ও হনুমান। পাখিও আছে নানা জাতের। ভোর বেলায় ঝাঁকে ঝাঁকে গ্রেট পাইড্ হর্নবিল ভুটানে চলে যায় চরে খাবার জন্য। আর সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে। মানস নদীর বুকে যে কত রকমের পাখি দেখা যায় তার নাম আমি বলতে পারব না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তৎপর ভাবে বললেন: পাখিদের নামে আমাদের দরকার নেই। আপনি বলে যান।

কিন্তু একটা কথা জানতে হবে। আসামে ব্রহ্মপুত্র নামে যে নদী আছে, তার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?

শুনেছি।

বললুম: তবে মনে রাখুন যে সেই নদীর উত্তরে যে সব বন আছে, তার কথা আগে বলছি। মানসের পর সোনাইরূপা।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বলে উঠলেন: বনের নাম সোনা-রূপা!

হেসে বললুম: আপনারা যদি বাঁদীপুর কারাপুর নাম রাখতে পারেন তো সোনা-রূপা কাজিরঙ্গ গরমপানি নাম রাখা যাবে না কেন!

মিস্টার সোমান্না বললেন: বলুন, বলে যান আপনি। বাজে কথায় কান দেবেন না।

বললুম: সোনাইরূপা তেজপুর শহর থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে। সেখানেও আপনি হাতি বাঘ চিতা বুনো মোষ স্লথ বিয়ার বুনো শুয়োর কুকুর ও নানা জাতের হরিণ দেখতে পাবেন। তেজপুর থেকে ওরাঙের দূরত্ব কিছু বেশি। কিন্তু তাই বলে ভাববেন না

যে সেটা মানস থেকে আরও বেশি দূরে। এই ছোট জঙ্গলটি মানসেরই কাছে। তারপর সোনাইরূপা। আর তেজপুর আরও খানিকটা এগিয়ে। পভার জঙ্গল আরও উত্তর-পূর্বে নর্থ লখিমপুর শহর থেকে মাইল বারো দূরে। ওরাঙে সব জন্তুই দেখতে পাবেন —বাঘ চিতা হাতি গণ্ডার হরিণ। পাখিও দেখতে পাবেন। কিন্তু পভায় বাঘ চিতা বা গণ্ডার নেই, পাখিও নেই। আছে শুধু হাতি বুনো মোষ আর এক জাতের হরিণ।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : এই বারে ও দিকটা শেষ ?

বললুম : তা বলতে পারেন। তবে অরুণাচল প্রদেশের যে অংশ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে, সেই অংশে একটা বন আছে, তার নাম নামদফা। লেডো থেকে লেখাপানির পথে পঁয়ত্রিশ মাইল যাবার পরে বাকি পথ হাঁটতে হয়। তবে মিয়াও থেকে একটা পথ তৈরি হচ্ছিল বলে শুনেছিলুম। সেখানে সব রকমের পশুপাখি আছে এবং দুই খাঁড়ার গণ্ডারও আছে বলে অনেকের ধারণা।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : তার মানে গণ্ডার আছে, কিন্তু তার খাঁড়া একটা না দুটো তা ঠিক বলা যাচ্ছে না। এই তো ?

বললুম : বোধহয় শব্দটার যা মানে তাই। আমি শোনা কথা বলছি। যার কাছে শুনেছি, তাকে জেরা করি নি।

মিস্টার সোমান্না বললেন : বলুন, বলে যান। আমরা থামবার আগে আপনি থামবেন না।

বললুম : কাজিরঙ্গার কথাই বলা হয় নি। পূর্ব ভারতে এর চেয়ে বেশি নাম ডাক আর কোন অভয়ারণ্যের নেই। আকারেও খুব বড়, মিকির পাহাড়ের পাদদেশ থেকে উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়তন হবে চারশো ত্রিশ বর্গ কিলোমিটার। এই বনে অসংখ্য এক খাঁড়ার গণ্ডার। এ ছাড়াও আছে বুনো মোষ কয়েক জাতের হরিণ শুয়োর আর নানা জাতের পাখি। বাঘ আর হাতিও আছে। গৌহাটি থেকে দূরত্ব একশো পঁয়ত্রিশ মাইল,

জোড়হাট থেকে কাছে। বনের মধ্যে টুরিস্ট বাংলোয় থাকার ও গণ্ডার দেখার সুব্যবস্থা আছে।

আমি একটু থামতেই মিস্টার সোমান্না বললেন: থামবেন না, বলে যান।

আরও ছুটি নাম আমার মনে পড়তেই বললুম: গৌহাটি থেকে কাজিরঙ্গার দিকে যেতে নওগাঁর কাছে লাওখোয়া আর কাজিরঙ্গার দক্ষিণে ডিমাপুরের পথে গরমপানি। লাওখোয়ার জঙ্গলেও গণ্ডার আছে, আছে বুনো মোষ আর ছু জাতের হরিণ। গরমপানিতে দেখবেন হাতি চিতা বুনো মোষ আর হনুমান।

মুত্তাউয়া বললেন: আপনি দেখেছেন এই সব অরণ্য?

বললাম: না।

তবে এত নাম মনে রেখেছেন কী করে?

বললুম: সড়ক পথে ঘুরতে হয়েছিল অনেক। তাই এইসব অরণ্য আর তাদের অবস্থান জানতে পেরেছি লোকের মুখে শুনে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: এইবারে বিহার ও উড়িষ্যা সম্বন্ধে যা মনে রেখেছেন তাই বলুন।

বললুম: ওদিকে আমি কাজ করি নি।

বেড়াতে নিশ্চয়ই গিয়েছিলেন!

তা গিয়েছি। কিন্তু বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আমার ছিল না।

কিন্তু শোনার অভ্যাস তো ছিল!

মিস্টার সোমান্না বললেন: দেরি করছেন কেন! বলুন, বলে যান।

আমি বুঝতে পারছিলুম না, হঠাৎ এঁরা বনজঙ্গলের কথা শোনবার জন্যে এমন আগ্রহী হয়ে উঠলেন কেন! বিপদ এড়াবার জন্যে তবু আমাকে যা জানি তা বলতে হল: বিহারে ন্যাশনাল পার্ক আছে ছুটো, আর উড়িষ্যায় একটা। বিহারে হাজারিবাগ ও পালামৌ

ন্যাশনাল পার্ক আর উড়িষ্যার পার্কের নাম সিমিলিপাল। রাঁচি থেকে হাজারিবাগ ও পালামৌ দুই বনেই যাওয়া যায়। হাজারিবাগ রোড স্টেশন থেকে হাজারিবাগ কাছে, আর গয়া থেকে পালামৌ যাবার অসুবিধা নেই। হাজারিবাগে আছে নানা জাতের হরিণ শুয়োর বাঘ আর চিতাও দেখা যায় মাঝে মাঝে। ডাকবাংলো বা ফরেস্ট রেস্টহাউসে থেকে রাতে এইসব দেখতে হয়। পালামৌএর পার্ক খুব ছোট। কিন্তু জন্তু আছে নানা রকমের। বাঘ চিতা হাতি গৌর নানা জাতের হরিণ সজারু বেরাল খরগোস। এই বনে নেকড়েও দেখতে পাওয়া যায়। আর জন্তু জানোয়ার দেখবার ব্যবস্থাও ভাল। বনে ওয়াচ টাওয়ার আছে আর একটা ঝর্ণার ধারে আছে গ্রাউণ্ড হাইড, সেখানে লুকিয়ে থাকলে গ্রীষ্মের সময় নানা রকমের জন্তু দেখতে পাওয়া যায় ঝর্ণায় জল খেতে আসছে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: সেখানে ঢোকবার সময়েই যদি নেকড়ের সঙ্গে মুলাকাৎ হয়ে যায়?

সে রকম সম্ভাবনা থাকলে তাকে বোধহয় গ্রাউণ্ডহাইড বলত না।

মুক্তাউয়া বললেন: সেখানে যাবার আগে ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নেবেন। নেকড়েগুলো ভারি ধূর্ত।

বললুম: এই বনে নানা রকমের পাখিও দেখতে পাওয়া যায়। বনমোরগ তিতির সারস—

মিস্টার সোমান্না বললেন: বলুন, বলে যান, থামবেন না এখন। নাঞ্জনগুড পৌঁছতে এখনও দেরি আছে।

বললুম: এর পরেই উড়িষ্যার সিমিলিপাল ন্যাশনাল পার্ক। বারিপদার কাছে সিমিলি পাহাড়ের পাদদেশে এই অরণ্যে প্রায় সব রকম পশু পাখি দেখতে পাওয়া যায়। বাঘ চিতা হাতি নানা জাতের হরিণ গৌর ভালুক ঢোলে হায়না সজারু উড়ুক্কু কাঠবেরালি পাইথন পাখি এমন কি মাছ পর্যন্ত পাওয়া যায়।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বলে উঠলেন: তাহলে তো বাঙালী দাদার স্বর্গ।

বললুম : স্বর্গের মতোই প্রাকৃতিক দৃশ্য শুনেছি।

এই ক্লান্তিকর বন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে একই নিঃশ্বাসে বললুম : নাঙ্গনগুড শুনেছি এ অঞ্চলের একটা সুন্দর শহর, তাই নয় ?

বলে সাগ্রহে তাকালুম মিস্টার সোমান্নার মুখের দিকে।

মিস্টার সোমান্না বললেন : দেখতে চান শহরটা ?

বললুম : কিছু শুনতে পেলেও খুশী হই।

কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমার ছল বুঝতে পেরে বলে উঠলেন : বাঙালী দাদা ফাঁকি দিচ্ছে সোমান্না, আগে তাঁকেই শেষ করতে দাও।

বললুম : আমি তো শেষ করেছি।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : কেমন করে! উড়িষ্যা শুনেছি জঙ্গলের দেশ। এক সিমিলিপাল বলেই শেষ করলে চলবে কেন ?

খানিকটা নিশ্চিন্ত হলুম এই ভেবে যে বিহারের কথা বলেন নি। বিহারের আরও কয়েকটা জঙ্গলের নাম শুনেছি। চক্রধরপুর থেকে ষোল সতের মাইল দূরে টেবো ও মাইল পঁচিশেক দূরে বামিয়া বুরু, সাসারাম থেকে চুয়াল্লিশ মাইল দূরে কাইমর, কোডার্মা, বেতিয়া থেকে মদনপুর গনৌনি আর লাওয়ালং রাজগিরের কাছেও বন আছে। শিকারে আমার শখ নেই বলেই জন্তু জানোয়ারের কথা মনে রাখতে পারি নি। হরিণ প্রায় সব বনেই থাকে। আর বন গভীর হলে বাঘ চিতা, কখনও গৌর। হাতি গণ্ডার বা সিংহ সব বনে থাকে না। সে সব বনের নাম মনে রাখা কঠিন নয়।

আমার কোন উত্তর না পেয়ে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : চুপ করে রইলেন কেন ?

বললুম : উড়িষ্যা জঙ্গলের দেশ সেকথা তো মিথ্যে নয়, কিন্তু জঙ্গলের নাম একটা নয় বলেই বিপদে পড়েছি। উড়িষ্যায় আমার দৌড় পুরী পর্যন্ত, আর টুরিস্ট বাসে কোণার্ক ভুবনেশ্বর ও চিল্কা। বন জঙ্গলের খবর আমি কতটুকু রাখি।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : দাম বাড়াচ্ছেন কেন বাঙালী দাদা! আপনাকে যখন আমরা অথরিটি বলে মেনে নিয়েছি—

তখন বলে যান, থামবেন না। দেরি করলে আমাকেই থামতে হবে।

বলে মিস্টার সোমান্নাও আমাকে তাড়া দিলেন।

এঁদের কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কত দুঃসাধ্য তা আমি বুঝি। তাই গম্ভীর ভাবে বললুম : পুরীর সমুদ্রতীরে বালুখণ্ড, আর ভুবনেশ্বরের কাছে চাঁদ্‌কা। চাঁদ্‌কায় হাতি আছে বলে শুনেছি, ভালুক আর গৌরও আছে। হরিণ দু জায়গাতেই আছে।

মনে মনে স্থির করেছিলুম যে অরণ্যের কথা আর নয়। এবারে দরকার হলে মুখ বন্ধ করে থাকব, কিংবা বিদ্রোহ ঘোষণা করব। কিন্তু তার দরকার হল না। বুঝতে পারলুম যে আমরা নাঞ্জনগুড শহরের নিকটবর্তী হয়েছি। তাই মিস্টার সোমান্না বললেন : শহরটা দেখবেন নাকি?

বললুম : না।

কেন?

মাইসোরে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।

কিন্তু সেখানে তো আমাদের রাত্রিবাস করতে হবে, কাজেই তাড়াতাড়ি পৌঁছবার তেমন দরকার নেই।

বললুম : একটা মন্দির আছে শুনেছি, কিন্তু টুরিস্ট লিটারেচারে এই জায়গার উল্লেখ নেই। কাজেই এখানে সময় নষ্ট করার কোন প্রয়োজন দেখি না।

মিস্টার সোমান্না এই শহর পেরিয়ে যেতে যেতে বললেন : মাইসোরে কিছু দেখতে পাবেন না বলেই জিজ্ঞেস করছিলাম। দেশে ফিরে বন্ধুদের কাছে গল্প করতে পারতেন।

হেসে বললুম : আপনাদের কথা বলেই শেষ করতে পারব কিনা জানি নে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: মার্কারার কথা তো ষোল আনাই বাকি।

ষোল আনায় কি শেষ হবে!

শেষ হবে কিনা তাও ভেবে দেখার কথা।

নাঞ্জনগুড পেরিয়ে আমাদের গাড়ি তখন মাইসোরের দিকে ছুটেছে। আমি আমার দু পা সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লুম চোখ বন্ধ করে। আর কথা কইব না। এ পথটুকু আমি নীরবে বিশ্রাম করব।

১৭

মাইসোর শহর দেখবার কোন আগ্রহ আমার নেই। দেখবার সময় পেলেও সেবারের মতো ভাল লাগবে না। লাগতেই পারে না। সেবারেই এই সুন্দর শহরটি আমরা প্রথম দেখেছিলুম। সঙ্গে স্বাতি ছিল, সে বসেছিল পিছনে মামা মামীর সঙ্গে, আর তাপ্তি আমার পাশে বসেছিল সামনে। এই ভাবেই আমরা শুধু শহরটা দেখি নি, দেখেছি শ্রবণবেলগোলা বেলুর ও হালেবিড। শ্রীরঙ্গপাটনা ও বৃন্দাবন গার্ডেনও দেখেছি। এই অঞ্চলে যা দেখি নি, সে কথাও মনে আছে। হয়শাল স্থাপত্যের সেই বিখ্যাত সোমনাথপুরের মন্দির ও শিবসমুদ্রমে কাবেরীর সুন্দর জলপ্রপাত। কিন্তু এর জন্যে আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। এই দেশের কত জায়গাই তো এখনও অদেখা আছে, তার জন্যে মন খারাপ করতে হলে মন আমার চিরকালই খারাপ হয়ে থাকবে। তার চেয়ে যা দেখেছি ও যা পেয়েছি, তারই স্মৃতিতে মন আমার ভরে থাক। অতীতের স্মৃতি যদি সুখ দিতে পারে তো বর্তমানের অনেক দুঃখ আমরা ভুলে থাকতে পারব।

সেবারে আমরা দুধারের পথের দৃশ্য দেখতে দেখতে বেলুরের দিকে ছুটে চলেছিলুম। সারা পথ আমরা এই পথের দৃশ্য দু চোখ ভরে দেখেছি। প্রকৃতি কি তার পাগলা রূপ এ দেশে উজাড় করে ছড়িয়ে দিয়েছে!

তাপ্তি আমার পাশে বসেছিল ট্যাক্সির সামনে। আমি তার দেহের উত্তাপ পাচ্ছিলুম। সৌরভও। তখন আমি সব দিকেই মন দিতে পারছিলুম, উপভোগ করতে পারছিলুম প্রকৃতির দুরন্ত রূপ। কিন্তু তাপ্তি সহসা একটা অনুরোধ করে বসল আমাকে, বলল, আমার জন্যে আপনারা খরচ করবেন না।

11

এ কথার উত্তরে আমার হেসে উঠতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তা চেপে বলেছিলুম : আমিও আপনার মতো অতিথি।

তাপ্তি এ কথা বিশ্বাস করতে পারে নি দেখে বলেছিলুম : আপনার সঙ্গে যেমন মাইসোর স্টেশনে দেখা, আমার সঙ্গে দেখা হাওড়া স্টেশনে। তফাৎ এইটুকু যে আপনার সঙ্গে একেবারেই পরিচয় ছিল না, আমার পেছনে ছিল একটুখানি পাতানো আত্মীয়তা আর মূলধন এই ক দিনের পরিচয়।

এ কথা বিশ্বাস করতে তাপ্তির কষ্ট হচ্ছে দেখে বলেছিলুম : মামার চাকর হারিয়ে গিয়েছিল স্টেশনের ভিড়ে। তার টিকিট কেনা ছিল। তাই আমাকে সঙ্গে নিয়েছেন সাহায্যের আশায়। সেই থেকেই এই ভাবে ঘুরছি।

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটবার পর তাপ্তি বলেছিল : আপনার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বাড়ল। আপনার কি কেউ নেই ?

বলেছিলুম : কেন থাকবে না! আপনারা সবাই আছেন! গোটা দেশটাই তো আমার, গোটা পৃথিবীটাই !

বিহ্বল চোখে তাপ্তি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাই দেখে বলেছিলুম : ছোট একটা ঘরের ভেতর বন্দী হয়ে থাকতে আমার মন ওঠে না। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, দম আটকায়। খোলা আকাশের নিচে আমি সুস্থ বোধ করি।

তাপ্তি কী বুঝেছিল সেই জানে, বলেছিল : আমারও কষ্ট হচ্ছিল। তাই আমিও বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু আপনার মতো বাইরের টানে আমি বের হই নি, ঘরে থাকতে পারি নি বলেই আমি বেরিয়ে পড়েছি।

মনে হয়েছিল, তাপ্তি আরও কিছু বলবে। কিন্তু বলল না। বলবার সময়ও ছিল না। আমরা বেলুরে পৌঁছে গিয়েছিলুম।

হালেবিডের মন্দির দেখতে দেখতে তাপ্তি আমাকে বলেছিল : সে যুগে সাধারণ মানুষেরই ছিল শিল্পবোধ।

আমি বলেছিলুম: সে যুগটাকে হারিয়ে আমরা তাকে মধ্য যুগ বলে নিন্দা করতে শিখেছি।

তাপ্তি বলেছিল: সে যুগটাকে কি আর ফেরানো যায় না! সে যুগের সৌন্দর্য চেতনাকে?

বলেছিলুম: সে বড় কঠিন কাজ। শিল্পের দিকে আজও মানুষ তাকিয়ে দে'খে, কিন্তু তার দাম দেয় না। দাম দিতে ভুলে গেছে। যার দাম দেয়, সে শিল্প নয়, সৌন্দর্যও নয়, সে ভোগ। পৃথিবীর মানুষ আজ ভোগ করতে শিখেছে। এই ভোগের ব্যাধি থেকে মুক্ত না হলে তার সৌন্দর্য চেতনা আর ফিরে আসবে না।

তাপ্তি কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাতেই আমি বলেছিলুম: আমি সিনিক নই, জীবনটাকে বাঁকা চোখে আমি কোনদিন দেখি না। কিন্তু তবু যা দেখতে পাই, তা বড় নৈরাশ্য-জনক। পৃথিবীর মানুষ আজ একটা জিনিস আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে—সে টাকা। ঐ টাকাই আজকাল মনুষ্যত্বের মান, ঐ টাকাই সমাজের ছাড়পত্র। যার টাকা আছে, তার সব আছে, যার নেই তাকে সমাজ মানুষ ভাবে না। টাকা দিয়ে আজ সমস্ত পাপের দুষ্কৃতির ও পশুত্বের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব। বর্তমান পৃথিবীর মনুসংহিতা এখন নতুন করে লেখা হচ্ছে।

নিজেকে বোধহয় আমি হারিয়ে ফেলেছিলুম। আর পিছন থেকে স্বাতি বলে উঠেছিল: থামলে কেন গোপালদা?

ফিরে দেখেছিলুম যে মামা মামীও আমার পিছনে দাঁড়িয়ে। লজ্জায় আমার মাথা কাটা গিয়েছিল। কিন্তু মামা বলেছিলেন: কথাটা তুমি মিথ্যে বল নি। দিল্লীতে আমি হাড়ে হাড়ে সব অনুভব করছি।

তাপ্তির জীবনের অনেক কথাই আমি জেনেছিলুম, কিন্তু সব কথা জানতে পারি নি। বৃন্দাবন গার্ডেনে সে একটু আড়ালে গিয়ে আমার ঠিকানা চেয়েছিল। তাকে আমি আমার উত্তরপাড়ার ঠিকানা

দিয়েছিলুম। সে তার নোটবুকে লিখে নিয়ে বলেছিল : যা বলতে পারলাম না, তা আপনাকে লিখে জানাব।

আমার রোমাঞ্চ হয়েছিল, সেই সঙ্গে দুঃখও হয়েছিল অপরিমিত। মনে হয়েছিল, তাপ্তি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে। এ তার বিদায়ের পূর্বাভাস! এই কদিনেই আমরা এমন অন্তরঙ্গ হয়ে গেছি! অন্তরঙ্গ হতে কি সময়ের প্রয়োজন নেই!

তাপ্তি বলেছিল : আর একটা কথা।

আমি নিঃশব্দে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। আর তাপ্তি বলেছিল : স্বাতি আপনাকে ভালবাসে। তাকে আপনি কোন দিন ভুল বুঝবেন না।

আমি চমকে উঠে প্রশ্ন করেছিলুম : কে বলেছে এই কথা?

স্বাতি নিজেই বলেছে।

বলে তাপ্তি হাসল। ভারি মিষ্টি হাসি তাপ্তির সুন্দর মুখে।

ঠিক এই মুহূর্তে স্বাতি এসেছিল আমাদের কাছে, বলেছিল : দেখ, কাকে ধরে নিয়ে এলাম।

সেই ফরাসী যুবক। হালেবিডে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। তরুণ বয়স, ভারি মিষ্টি চেহারা। কিন্তু একটু রুক্ষ ও উদাস। মনে হয়েছিল, পথশ্রমে সে ক্লান্ত হয়েছে। আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে নমস্কার করেছিলুম। যুবকটি এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। একটু চমকে উঠে হাত জুড়ে আমাকে নমস্কার করেছিল। আর মুখেও বলেছিল : নমস্কার। ভারি ভাল লেগেছিল এক বিদেশীর কাছে এই ভারতীয় প্রথার সমাদর। অল্পক্ষণেই পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। সে ফরাসী, এসেছে ভারতবর্ষ দেখতে। এক টুকরো কাগজে দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর নাম লিখে এনেছে। আর সেই ভাবেই দেখতে দেখতে আসছে। এখানে যে তার সঙ্গে আবার দেখা হবে, তা ভাবতে পারিনি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম : এবারে কোথায় যাবে?

যুবকটি তার কাগজের টুকরো পকেট থেকে বার করে বলেছিল ঃ মহাবলিপুরম।

সে তো মাদ্রাজ হয়ে যেতে হয়!

তাপ্তি বলেছিল ঃ ভালই হল। আমরা এক সঙ্গে ম্যাড্রাসে যাব। আপনি কি আজ রাতের গাড়িতেই যাবেন?

সে বলেছিল ঃ টিকিট কিনে এসেছি।

তাপ্তি বলেছিল ঃ আমারও কেনা আছে।

তারপর সবার কাছে অনুমতি নিয়ে সে সেই ফরাসী যুবকের সঙ্গে বাসে উঠে স্টেশনে ফিরে গিয়েছিল।

সহসা মামী আবিষ্কার করেছিলেন যে স্বাতি আমাদের সঙ্গে নেই, অন্ধকারে তাকে দেখাও যাচ্ছে না। সে কি তাপ্তিকে পৌঁছতে গেছে! বাসের কাছে গিয়ে তাপ্তিকে দেখতে পেলুম সেই যুবকটির পাশে, কিন্তু স্বাতি সেখানে নেই। মনে হল যে স্বাতিকে দেখতে পাব নদীর ধারে। নিরিবিলিতে আমাকে দরকার আছে বলেই তার এই ছল। দূর থেকে তাদের বিদায় দিয়ে আমি নদীর ধারে ফিরে এসেছিলুম।

অন্ধকার তখন গভীর হয়েছিল। দূরের মানুষ আর চেনা যাচ্ছিল না। কিন্তু তবু আমি স্বাতিকে চিনতে পেরেছিলুম। রেলিঙ ধরে সে নদীর দিকে চেয়ে ছিল। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি আমার খুবই চেনা। নিঃশব্দে আমি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। বুঝতে পেরেও স্বাতি কোন কথা বলে নি।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরে আমিই বলেছিলুম ঃ কী দেখছ?

কিন্তু স্বাতির জবাব পেতে আমাকে অনেক প্রশ্ন করতে হয়েছিল।

বলেছিল ঃ তাপ্তি অসঙ্কোচে একটা বিদেশী ছেলের সঙ্গে চলে গেল!

আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম ঃ তাতে কী হয়েছে?

তার ভয় করল না! মেয়েদের ভয়ের কথা কি তুমি জান না!

বলেছিলুম : ও তো শিল্পী ছেলে, ওর অনেক উঁচু নজর। নারীর দেহে ওর লোভ থাকলে বিদেশে এত কষ্ট সইতে ও আসত না।

এর পরেই গোঁ গোঁ শব্দ করে তাপ্তিদের বাস বাগান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি বলেছিলুম : ফিরবে না?

জল আর রঙে চারিদিকে তখন ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হয়েছে। মনে হয়েছিল, স্বাতিও নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। অনেকক্ষণ পরে অন্যমনস্ক ভাবে বলেছিল : তাপ্তিকে তুমি ও কথা কেন বললে?

কোন্ কথা?

আমার সম্বন্ধে!

তোমার সম্বন্ধে কি কিছু বলেছি! কই, মনে পড়ছে না তো!

বলেছ বৈকি, আমাকে ভালবাস বলেছ।

আমি! আমি বলেছি এই কথা!

না বললে সে কেন বলবে, তোমাকে যেন কোন দিন ভুল না বুঝি!

গভীর বিস্ময়ে আমার মুখে এর পরে কোন কথা যোগায় নি। আমাকেও তো সে এই কথাই বলে গেছে! সে কি তবে স্বাতির কথা নয়!

নিজেকে সামলে নিয়ে আমি হেসে বলেছিলুম : তাপ্তি ঐ রকম। অনেক কথাই সে বানিয়ে বলে।

কিন্তু এ কথা বোধহয় স্বাতির বিশ্বাস হয়নি। সে বোধহয় ভেবেছিল যে আমিই বানিয়ে বলেছি। সে তাই ভাবুক, আমার তাতে কোন ক্ষতি হবে না। ভুলটা ভাঙিয়ে দিলে লাভ হবে কি কারও!

বৃন্দাবনে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল আমাদের দুজনেরই হৃদয় আচ্ছন্ন করেছিল।

মাইসোরে পৌঁছতে আর আমাদের দেরি নেই। পিছন থেকে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলেন: বাঙালী দাদা ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি?

মিস্টার সোমান্না বোধহয় আমার দিকে একবার চেয়ে দেখে বললেন: খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

মুক্তাউয়া বললেন: তোমাদের মতো দস্যু নন।

সীতাউয়া বললেন: সাত সকালে ওঁকে আমরা টেনে বার করেছি। তারপর থেকে আর একটুও বিশ্রাম পান নি।

এই সব মন্তব্য আমার ভাল লাগছিল। সবাই এখন আমার কথা ভাবছেন। কেউ আমার কথা ভাবছে জানলে ভাল লাগে। লোভ হয় আরও কিছু ভাবতে। তাই আমি কোন কথা না বলে নিঃশব্দে চোখ বন্ধ করে রইলুম।

১৮

চোখ বুঁজেই আমি বুঝতে পারছিলুম যে মাইসোরের আলোকিত পথে আমরা পৌঁছে গেছি এবং এক জায়গায় আমাদের গাড়ি এসে থামল। মিস্টার সোমান্না আমাকে বললেন : এবারে নামতে হবে বাঙালী দাদা।

আমি যেন সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম এমনি ভাবে চমকে উঠে বললুম : নামতে হবে!

মিস্টার সোমান্না বললেন : এই হোটেলে আমাদের রাত্রিবাস, মার্কারা যাত্রা কাল ভোর বেলায়।

আমি আমার ক্যামেরা সামলে নেমে পড়লুম। আর সবাইও নামলেন। মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : তোমরা একটু দাঁড়াও। ঘর পাওয়া যাবে কিনা আমি জেনে আসছি।

বলে তিনি ভিতরে গিয়েই ফিরে এসে বললেন : দোতলায় তিনখানা ঘর পাওয়া যাবে পাশাপাশি। সবাইকে নিয়ে চলে যাও ওপরে।

শেষের কথাগুলো বললেন মুক্তাউয়াকে।

মুক্তাউয়া আমাকেই একটা ঠেলা দিয়ে বললেন : চলুন, এক কাপ কফি খেয়ে গরম জলে স্নান করে নেবেন। শরীরের ক্লান্তি আর থাকবে না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : দরকারী জিনিসগুলো হাতে করে নিয়ে যাও সোমান্না, হোটেলের বেয়ারার জন্যে তাহলে অপেক্ষা করতে হবে না।

আমি বললুম : আমার ব্রীফ কেসটা পেলেই চলবে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা সেটি আমার হাতে তুলে দেবার সময় বললেন :

পথে আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, এবারে আপনাকে সুখী করবার জন্যে আমি কিছু কষ্ট স্বীকার করব।

তাড়াতাড়ি আমি বললুম: আমি কোন কষ্ট পাই নি তো!

জানি।

বলে তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন। আমরা উপরে চলে গেলুম, আর তিনি নিচে দাঁড়িয়ে রইলেন বেয়ারার অপেক্ষায়।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বোধহয় হোটেলের ম্যানেজারকে কফির কথা বলেই এসেছিলেন। আমরা ঘরে জিনিসপত্র রেখে বাহিরের বারান্দায় এসে বসতে না বসতেই বেয়ারা এক ট্রে কফি নিয়ে হাজির হল। তৈরি কফি। সবার সামনে এক একটা কাপ রেখে নিচে চলে গেল।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা এলেন একটা সুটকেশ হাতে করে, আর একটা বেয়ারার হাতে। মিস্টার সোমাপ্পা লাফিয়ে উঠে বেয়ারার হাতের সুটকেশটা কেড়ে নিয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকে গেলেন। মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তাঁর পাশের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মুক্তাউপ্পা বাধা দিয়ে বললেন: না না, ও ঘরে নয়। ওটা বাঙালী দাদার ঘর।

বলে আমার অন্য ধারের ঘরটা দেখিয়ে দিল। তার মানে আমাকে দেওয়া হয়েছে মাঝখানের ঘরটা। মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তাঁর হাতের সুটকেশটা ঘরে রেখে এসে কফি খেতে বসলেন। আড় চোখে চেয়ে আমার কফি শেষ হয়েছে দেখে বললেন: বিকেলে স্নানের অভ্যেস থাকলে এই বেলা সেরে নিন, তাহলে ডিনারটা জমবে ভাল

বুদ্ধিটা মন্দ নয়।

বলে আমি উঠে নিজের ঘরে চলে গেলুম।

পরিচ্ছন্ন হয়ে যখন বাহিরে এলুম, তখন আর কেউ সেখানে বসে নেই। আমি একাই একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লুম। কিছুক্ষণ পরেই মিস্টার সোমাপ্পা বেরিয়ে এলেন, তারপরে

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা। এসেই বললেন: বাঙালী দাদা আমাদের খুব ঠকিয়েছে।

কী রকম?

বলে মিস্টার সোমান্না তাঁর দিকে তাকালেন। আর আমি কী বলব তা ভেবে পেলুম না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: বাঙালী দাদা উড়িষ্যায় দুটি মাত্র বনের নাম করেছেন। অথচ আমরা জানি যে সেখানে অনেক বন জঙ্গল। ঢেনকানালের কাছে সপ্তশয্যা ও কপিলাশ, সম্বলপুরের দিকে উষাকোঠি ও খালাসুনি। এ ছাড়াও আছে দেবীগড় করলাপত মহানদী বৈসাইপল্লী পদমতলা ও রায় গোদা। আর হাতি শুধু চাঁদ্‌কায় কেন, অনেক বনেই আছে। কোথাও বাঘ আছে, কোথাও আছে ভালুক বা গৌর। হরিণ তো প্রায় সব বনেই দেখা যায়।

আমি খুশী হয়ে বললুম: বেশ তো, আপনি যখন এসব জানেন, তখন সব রাজ্যের কথা বলুন না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমার দিকে চাইলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, তারপর বললেন: বেশ লোক তো আপনি!

কেন?

নিজের কাজ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে চান।

মিস্টার সোমান্না এবারে আমার দলে এলেন। বললেন: দক্ষিণ ভারতের কথা তোমার বলা উচিত। তুমি তো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াও, নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: এ যে দেখছি নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনলাম।

বললুম: ভূমিকা আর বাড়াবেন না, কাজের কথায় নেমে পড়ুন।

বাঙালী দাদার আজ্ঞা আমাকে মানতেই হবে।

বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা প্রথমে ন্যাশনাল পার্কের কথা বললেন।

দক্ষিণ ভারতে ন্যাশনাল পার্ক তিনটি, আর এই তিনটিই কর্নাটক রাজ্যে। আমরা বাঁদীপুর পেরিয়ে এসেছি, নাগরহোলের পাশ দিয়ে যাব, আর বাঙালী দাদা যদি ব্যাঙ্গালোর হয়ে বাড়ি ফেরেন তো ব্যাঙ্গালোরের উপকণ্ঠে দেখবেন বান্নেরঘাট্টা। কাল মার্কারা যাবার পথে নাগরহোলের পথটা আমি দেখিয়ে দেব, চাইলে ঘুরিয়েও আনতে পারব।

বাধা দিয়ে মিস্টার সোমান্না বললেন: আর বিয়ে বাড়িতে গিয়ে মার খাওয়াবে সবাইকে, এই তো?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: মার খেতে হবে কেন?

মিস্টার সোমান্না বললেন: কাল আমাদের পৌঁছনোর কথা ছিল। আজও পৌঁছনো গেল না। কাল সকালের মধ্যে পৌঁছতে না পারলে নির্ঘাত মার খেতে হবে।

আমি বললুম: তবে চলুন, আজ রাত থাকতেই আমরা বেরিয়ে পড়ি।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বলে উঠলেন: না না, আজকের রাতটা নিশ্চিন্তে ঘুমনো যাক। কালকের ভাবনা কাল ভাবা যাবে।

বললুম: তাহলে আজকের ভাবনাই ভাবি। নাগরহোলের বনে জীবজন্তু কী আছে তাই বলুন, আর বান্নেরঘাট্টায়।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: বাঁদীপুরের সমস্ত জন্তু জানোয়ারই আছে নাগরহোলের বনে। ১৯৫৫ সালে এই স্যাঙ্কচুয়ারি ছিল দুশো বিরাশি বর্গ কিলোমিটার জুড়ে, এখন এর আয়তন পাঁচশো একাত্তর বর্গ কিলোমিটার। এর কিছুটা মাইসোর জেলায়, আর বাকিটা কুর্গে। ১৯৭৫ থেকে একে ন্যাশনাল পার্ক বলা হচ্ছে। বছরে যে কোন সময়েই আপনি দেখতে পারেন। কিন্তু এই বন দেখবার জন্যে এলে শীতের সময়ে এখানে আসবেন। অক্টোবর থেকে মার্চ সবচেয়ে ভাল সময়। মাইসোর থেকে যেতে হলে হুনসুর থেকেই দক্ষিণে যাবেন, আর আমাদের মার্কারা থেকে আসবার

সময় পেরিয়াপাটনা পার হয়ে আলেচৌকুর থেকে দক্ষিণে যাবেন। খুব কাছে। পেরিয়াপাটনায় পেট্রল পাম্প আছে আমাদের জন্যে। আজ এখানে তেল না পেলে কাল যাবার সময় সেখানেই তেল নিতাম।

মার্কারায় পেট্রল পাওয়া যায় না?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমার প্রশ্ন শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন। বললেন: মার্কারায় কী পাওয়া যায় না তাই জিজ্ঞেস করুন।

বললুম: ভাল বন্ধু যে পাওয়া যায় তা বুঝতে পেরেছি। এইবারে আপনার গল্প বলুন।

নাগরহোলের জঙ্গলে থাকবার জায়গা আছে কিনা জানতে চাইলেন না?

এ সব তো আপনি নিজে থেকেই বলবেন।

আছে। দুটো লজ আছে, আর আমিষ ও নিরামিষ দু রকমের খাবারই পাওয়া যায়। কয়েকটা ফরেস্ট রেস্টহাউসও আছে বনের মধ্যে। বনের ধারেও রাত্রিবাসের জায়গা আছে।

বললুম: মার্কারার লোক এই বনে বসবাসের জন্যে আসে নাকি?

কেন?

রাত্রিবাসের জন্যে বনের ভেতরে ও বাহিরে এত ব্যবস্থা!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আবার হেসে উঠে বললেন: ভাল বলেছেন। তারপরেই বললেন: এই বনের ধারেই আছে কবিনি নদীর ড্যাম ও জলাধার। বনের মধ্যে অনেকগুলো নদী—লক্ষ্মণ তীর্থ তারকা নাগরহোলে আর কবিনি। জলাধার থেকে বেরিয়েই কবিনি কেরালা রাজ্যে প্রবেশ করেছে। বনের দক্ষিণ প্রান্তেই কেরালার সীমানা।

আমাকে তাঁর মুখের দিকে চাইতে দেখেই বললেন: আশ্চর্য হয়েছেন?

বললুম: তা একটু হচ্ছি বৈকি।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: উটিতে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে না হলে আমি কালিকট থেকে সোজা চলে আসতে পারতাম। গুডালুরের দিকে না গিয়ে নাগরহোলের ভেতর দিয়ে পেরিয়া-পাটনা। আর পেরিয়াপাটনা মানেই মার্কারা।

কি রকম?

কালিকট থেকে ভায়িত্রি হয়ে চুণ্ডালে এসেছি। তারপর গুডালুরের দিকে না গিয়ে সুলতান্‌স ব্যাটারি হয়ে গুন্দ্‌লুপেট আসতে পারতাম, কিংবা আরও সরাসরি মননতোন্তি হয়ে হুনসুর বা পেরিয়াপাটনা। মাইসোর থেকে কালিকটে লোকে এই হুনসুর হয়েই যাতায়াত করে।

বললুম: হাতের কাছে একখানা ম্যাপ থাকলে বুঝতে সুবিধা হত।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা অত্যন্ত তৎপর ভাবে উঠে দাঁড়িয়েই বসে পড়লেন। বললেন: সরি, ম্যাপ দেখালেই আমার জারিজুরি প্রকাশ হয়ে যাবে।

মিস্টার সোমান্না বললেন: কোন বই দেখে এ সব বলছ বুঝি?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা খানিকটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বললেন: আমি কি কিছুই জানি না ভাব?

তাড়াতাড়ি আমি বললুম: আমি তা মোটেই ভাবি না। এইবারে তাহলে বান্নেরঘাট্টার কথা বলুন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: এই বনটি ন্যাশনাল পার্ক হয়েছিল নাগরহোলের এক বছর আগে, আর 'ব্যাঙ্গালোরের খুব কাছে বলে টুরিস্টদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আমরা তো এর জনপ্রিয়তার কথা শুনিনি!

সে বোধহয় রাজ্য সরকারের প্রচারের দোষে। কিংবা আপনাদেরই

কৌতূহলের অভাবে। ব্যাঙ্গালোর থেকে পনের মাইল দক্ষিণে একটি খুব সুন্দর ন্যাশনাল পার্ক। এ দিকের সব অরণ্যই আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে। কিন্তু বান্নেরঘাট্টা পাহাড় আর গভীর উপত্যকার জন্যে ভারি রমণীয়। একশো চার বর্গ কিলোমিটার এই অরণ্যে জন্তু জানোয়ার খুব বেশি নেই বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যে খুবই আকর্ষণীয়।

আমি বললুম: হাতি নিশ্চয়ই আছে!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: না, হাতি এই বনে নেই। তবে বর্ষার সময়ে জল ও খাবারের খোঁজে দলে দলে হাতি এখানে আসে। সারা বছর থাকে স্লথ বিয়ার বুনো শুয়োর চিতল আর কাকর জাতের হরিণ। মোরগ জাতের পাখিও আছে এই বনে।

ব্যাস?

আপনাদের জন্যে আছে সফরি পার্ক, তাতে বাঘ সিংহ আর বেবুন দেখতে পাবেন। একটা পিকনিক কর্ণার আছে। তাতে এক জোড়া গৌর, চিতল আর সাম্বর। একটা পেট কর্ণারও আছে।

তারপরেই প্রশ্ন করলেন: হায়দ্রাবাদে নেহরু জুলজিকাল পার্কে প্রি-হিস্টরিক পার্ক দেখেছেন, কিংবা হিমাচল প্রদেশে নাহানের কাছে সাকেটি ফসিল পার্ক?

বললুম: না।

তাহলে বান্নেরঘাট্টায় নিশ্চয়ই যাবেন। সেখানে আপনি একই রকম প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবজন্তুর মডেল দেখতে পাবেন। আর সেখানকার প্রাচীন ঐতিহাসিক মন্দির দেখেও আপনি আনন্দ পাবেন। রামদেব মন্দিরটি বান্নেরঘাট্টার খুব কাছে একেবারে বনের ধারে। এখানে একটি ট্রাভলার্স বাংলো আছে, ক্যাম্পিঙের জায়গাও আছে।

আমি বললুম: এ সব আপনি দেখে এসেছেন বুঝি!

কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পা উত্তরটা অন্য ভাবে দিলেন: সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

আমি না বলতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগেই মিস্টার সোমায়া বললেন: এ গল্প তো আগে তোমার কাছে শুনিনি!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা রাগের ভান করে বললেন: তোমরা শুনবে, না শুধু প্রশ্ন করে যাবে?

না না, আর আমরা কোন প্রশ্ন করব না। এবারে অভয়ারণ্যের কথা বলুন। কতগুলো অভয়ারণ্য আছে দক্ষিণ ভারতে?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: অগুন্তি। কিন্তু ঘাবড়ালে চলবে না। মেয়েরা এখনও ডিনারে যাবার জন্যে তৈরি হতে পারে নি। এরই মধ্যে আমাদের শেষ করে ফেলতে হবে।

তাহলে চটপট বলে ফেলুন।

একেবারে দক্ষিণের রাজ্য কেরালা থেকেই শুরু করি। দুটো নাম তো আপনি ইতিমধ্যেই জানেন। পেরিয়ার দেখেছেন, আর বাঁদীপুরের আড়ালে ছিল ওয়াইনাড। বাকি আছে আরও গোটা চারেক। তামিলনাড়ুর মুদুমালাই তো পেরিয়ে এলেন, সে রাজ্যেও আরও গোটা চারেক আছে।

নাম ধাম বলুন।

বলছি। ত্রিবেন্দ্রামের কাছে নেইয়ার ড্যাম, সেখানেই নেইয়ার অরণ্য, আর তারই গায়ে সংলগ্ন মুণ্ডনতুরাই অরণ্য তামিলনাড়ু রাজ্যে। ত্রিবেন্দ্রাম থেকে নেইয়ার আঠারো মাইল দূরে, আর মুণ্ডনতুরাই তিরুনেলভেলি থেকে কুড়ি মাইল। নেইয়ারে শুধু সাম্বর চিতল ও নীলগাই, কিন্তু মুণ্ডনতুরাই-এ হরিণের সঙ্গে বাঘ ও চিতাও আছে। ত্রিচুর থেকে মাইল পনের দূরে পীচি অরণ্য, আর পরম্বিকুলম একেবারে তামিলনাড়ুর সীমানায়। সে রাজ্যের আনাইমালাই ঠিক মুদুমালাই-বাঁদীপুরের মতো যেন একই অরণ্যের দুটি অংশ।

জন্তু জানোয়ারও কি একই রকম?

কেরালার পরম্বিকুলমে হাতি ও গৌর আছে, সাম্বর চিতল ও নীলগাই জাতের হরিণ, আর টাহ্‌র॥

টাহ্‌র কী?

বড় বড় লোমওয়ালা পাহাড়ী ছাগল। আইবেক্স্‌ও বলে। আনাইমালাই-এ হাতি গৌর ও চিতল ছাড়াও বাঘ চিতা ভালুক শুয়োর আর কুমীর আছে। আপনাদের স্নুন্দরবনের মতো ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমীর।

মিস্টার সোমাপ্পা বললেন: তামিলনাড়ুর গোটা ছুই অরণ্য বাদ রইল।

বাদ রইল?

বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা ভাবতে লাগলেন।

আমি বললুম: মাত্র ছুটি অরণ্যের কথা তো বললেন!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: এখানে দেখছি সবাই শত্রু!

হঠাৎ দেখলুম, মস্ত একখানা মোটা বই হাতে মুক্তাউয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বইখানা টেবলের উপরে ফেলে দিয়ে বললেন: সবাই তোমার শত্রু নয়।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আর্ত স্বরে চিৎকার করে উঠলেন: এই বইখানা এখানে নিয়ে এলে কেন?

মুক্তাউয়া বললেন: ঘরে এসে অবধি তো এই বইখানাই পড়ছিলে। যা ভুলে গেছ তা বই দেখে বল।

হতাশ ভাবে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: শত্রুতা একেই বলে। নাম কেনবার জন্যে এতক্ষণ ধরে যে কষ্ট স্বীকার করলাম, তার সবই ফাঁস হয়ে গেল।

মিস্টার সোমাপ্পা এক নজরে বইখানা দেখে হেসে উঠলেন। তাই দেখে আমি বললুম: কী বই ওখানা?

বইটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে মিস্টার সোমাপ্পা বললেন: একখানা গাইড বই।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বইটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সহজ ভাবে বললেন : যখন সব জেনেই গেলেন, তখন আর দেরি করব না।

বলে বইএর শেষ দিকটা খুলে বাকি ছুটি অরণ্যের কথাও বললেন : ভেডানতাঙ্গাল ও পয়েন্ট ক্যালিমিয়ার।

তাড়াতাড়ি আমি বললুম : ভেডানতাঙ্গালে পাখি আছে শুনেছি।

ঠিক বলেছেন। শুধু নানা রকমের পাখি, আমাদের রঙ্গনাতিট্টুর মতো। ম্যাড্রাস থেকে টুরিস্ট বাস আসত কিছুদিন আগে।

এখন ?

এখনও আসে কিনা জানি না।

আর পয়েন্ট ক্যালিমিয়ার ?

সমুদ্রের ধারে একটি সুন্দর অভয়ারণ্য। শুধু হরিণ আর পাখি। তাঞ্জাভুর থেকে যেতে হয়। কিন্তু এ জায়গার অনেক নাম— বেদারণ্যম কোডিয়াক্কারাই বা কোডিয়াট্টিকাড়ু।

তারপর ?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : অন্ধ্রে অভয়ারণ্য মাত্র তিনটি। পোরোম নিজাম সাগরের কাছে, ভালুক শুয়োর চিতা সাম্বর ও চিতল আছে বনে। পাখাল ওরঙ্গল থেকে আটাশ মাইল দূরে। এই বনে আগের সব জন্তু তো আছেই, এ ছাড়াও আছে নীলগাই প্রভৃতি আরও কয়েক জাতের হরিণ ও কুমীর। তৃতীয়টি ভীমাভরমের কাছে কোন্নেরু, সেখানে শুধু পেলিকান পাখি।

মুক্তাউয়া বেরিয়ে এসেছিলেন। সীতাউয়াকেও দেখা যাচ্ছিল পর্দার আড়ালে। সেদিকে নজর পড়তেই মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তাঁর বই বন্ধ করলেন।

আমি বললুম : কর্ণাটকের পশুপাখির কথা যে শোনা হল না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: এ রাজ্যের অরণ্যের অফুরন্ত নাম দেখে ভয় হচ্ছে যে আমরাও বোধহয় পশুপাখি।

মিস্টার সোমান্না হেসে উঠলেন। আর আমি বললুম: মানে?

মানে খুবই সোজা। বনের নামগুলো দাগ দিয়েছিলুম, গুনে দেখেছি ন্যাশনাল পার্ক ছাড়াই ষোলটা স্যাঙ্কচুয়ারি। গোয়া রাজ্যেও আছে দুটো। তবে আপনার কোন ভাবনা নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

কেন?

মার্কারায় পৌঁছে এই বইখানা আপনার হাতে তুলে দেব। আর পরিচয় করিয়ে দেব কর্নেল সাহেবের সঙ্গে। তিনি আমাদের শিকারী দাদা। তাঁর কাছে আপনি সারা ভারতের খবর পাবেন।

সীতাউয়া বেরিয়ে পড়তেই আমরা উঠে পড়লুম। ডাইনিং হলে আমাদের খেতে যেতে হবে। তারপর ঘুম।

মুক্তাউয়া জিজ্ঞাসা করলেন: আজ রাতেও কি অ্যালার্ম দিয়ে ঘুম ভাঙাবে?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: পাগল হয়েছ! আজ সারাদিন শরীরের ওপরে যে ধকল গেছে, আর কোন কষ্ট নয়। নিশ্চিন্ত মনে সবাইকে ঘুমোতে দাও।

মিস্টার সোমান্না বললেন: ধন্যবাদ।



ঘরে যেন ডাকাত পড়েছে, এমনি একটা আতঙ্ক নিয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, দরজার উপরে কেউ এতক্ষণ দুম দুম করে করাঘাত করছিল। অন্ধকার ঘর, সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ। সাবধানে উঠে দেওয়াল হাঁতড়িয়ে ইলেক্‌ট্রিকের সুইচ টিপে বাতি জ্বাললুম। না, ঘরে কেউ নেই, বাহিরেও কোন শব্দ নেই। কিন্তু যে শব্দে ঘুম ভেঙেছে, তা মিথ্যা বলেও মনে হল না। স্বপ্নে এই শব্দ শুনেছি ভাবতেও ইচ্ছে হল না। তাই দরজা খুলে বাহিরে বেরোলুম।

বারান্দায় একটা বাতি জ্বলছে। সেই আলোয় কাউকে কোথাও দেখতে পেলুম না।

ঘরে ফিরে আসছিলুম। পাশের ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে নাইটি-পরা একটি সুন্দর মেয়েকে দেখতে পেলুম। পর্দাটা একটু সরিয়ে বললেন: সেই বর্বর লোকটা অসভ্যের মতো আপনাকে জাগিয়েছে তো! কিছু মনে করবেন না। এই অন্ধকার রাতেই নাকি বেরোতে হবে। প্রতিবাদ করে তো লাভ নেই, তাই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন।

বলেই দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল পরক্ষণেই। এই হোটেলে আমার দুপাশের দুই ঘরে আছেন চাঙ্গাপ্পা ও সোমান্না দম্পতি। যে ঘরটির দরজা ফাঁক দেখলুম, তা মিস্টার চাঙ্গাপ্পার। তিনিই যে আমাকে জাগিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই, আর আমার সঙ্গে কথা কইলেন মুক্তাউয়া। ঘুমের চোখে তাঁকে ঠিক চিনতে না পারলেও কথা শুনে বুঝতে পেরেছি। সোমান্না দম্পতিকেও

বোধহয় এই ভাবেই জাগিয়েছেন আমার আগে। এখন তাঁদের দরজা বন্ধ।

আমি আর দেরি করলুম না। ঘরে ফিরে এসে তৈরি হয়ে নেবার কাজে লেগে গেলুম। দাড়ি কামিয়ে মুখ হাত ধুয়ে রেডি হতে আমার বেশি সময় লাগল না।

বারান্দায় বেরিয়ে দেখলুম যে চারিদিকে অন্ধকার তখনও ঘন হয়ে আছে। আমিই সকলের আগে বেরিয়েছি। তাই এইবারে মিস্টার চাঙ্গাপ্পার আচরণের একটা উপযুক্ত জবাব দেওয়া যেতে পারে। তখনি মনে হল যে তাঁদের বন্ধ দরজার উপরে আমিও তাঁরই মতো গুম গুম করে আঘাত করি। কেউ বেরোলেই বলব, আমি রেডি হয়ে গেছি।

তার পরেই মনে হল যে এ ভারি ছেলেমানুষী হবে। কিন্তু বেশিক্ষণ এ ইচ্ছা সংবরণ করতে পারলুম না। সারা পথই তো হাসি-মস্করা করে আসছি, এখন কেন বুড়োর মতো আচরণ করব! তাই আর ভাল ছেলের মতো নীরবে না থেকে দুই হাতে দরজার উপরে আঘাত করতে আরম্ভ করলুম। একবার চাঙ্গাপ্পাদের দরজার উপরে, পরের মুহূর্তে সোমান্নাদের দরজায়। এই ভাবে কিছুক্ষণ আঘাত করবার পরেই দুটো দরজা একসঙ্গে খুলে গেল। কে বেরোচ্ছে তা না দেখেই বললুম: আমি রেডি আছি।

মিসেস সোমান্না তাঁর কাপড় সামলে ত্রস্তপদে ঘরে ঢুকে গেলেন, আর হা-হা করে হেসে উঠলেন মিস্টার চাঙ্গাপ্পা। ঘরের ভিতর থেকে মিসেস সোমান্না বলে উঠলেন: আমি ভেবেছিলাম, হোটেলের বেয়ারা বুঝি মর্নিং টি দিতে এসেছে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হাসতে হাসতেই বললেন: মর্নিং টি তো আমরা মার্কারায় খাব।

আমি বললুম: কাল রাতে তো সে কথা বলেন নি!

বললে কি আর রাতে ঘুমোতে পারতেন! ভোরে ওঠার আতঙ্কে রাতের ঘুম ফর্সা হয়ে যেত।

আপনি কি ঘুমোন নি?

আমার কানের কাছে অ্যালার্ম বেজেছে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পার ঘরের ভিতর থেকে ঝঙ্কার শোনা গেল: একটা হৃদয়হীন যন্ত্র। যন্ত্রের মতোই চলে, আর যন্ত্রই চালায় ওকে।

বললুম: রোবট বলুন।

ঠিক তাই।

বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে গেলেন।

আমরা যখন যাত্রা করলুম রাত তখন সাড়ে চারটের বেশি হবে না। মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তবু দুঃখ করে বললেন: সূর্য ওঠবার আগে আমরা মার্কারায় পৌঁছতে পারব না।

মুক্তাউয়া বলে উঠলেন: মহাভারত কি তাহলে অশুদ্ধ হয়ে যাবে!

অশুদ্ধ হবে নিজেদের মন।

কেন?

দুদিন আগে আমাদের পৌঁছনো উচিত ছিল।

মুক্তাউয়া কঠিন স্বরে বললেন: এই দেরির জন্যে কি তুমি আমাকে দায়ী করতে চাও?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা ভয় পাবার ভান করে বললেন: সরস্বতীর জ্বরের জন্যে কি আমি তোমাকে দায়ী করতে পারি! কত যত্নে কত সাবধানে রেখেছিলে সরস্বতীকে। তবু যখন বেচারার জ্বর এসে গেল, তখন কি তাকে ঝি-চাকরের হাতে ফেলে আসা যায়!

মিস্টার সোমান্না হেসে উঠলেন। তাই দেখে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা ভীষণ ভাবে রেগে যাবার ভান করে বললেন: তুমি হাসছ যে! সরস্বতী তোমার মেয়ে হলে তুমি কী করতে?

সীতাউয়া বললেন: আমি হলে তাকে সঙ্গে আনতাম।

ঐ জ্বর গায়ে তাকে উটির মতো ঠাণ্ডা জায়গায় আনতে ! ছি ছি ! তোমাদের মনে কি একটুও দয়ামায়া নেই ! সমস্তই কেমন যেন বর্বর ব্যাপার !

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা এই কথাগুলো এমন ভাবে বললেন যে মনে হল, তিনি নিজে এই প্রস্তাব করেছিলেন মুক্তাউয়ার কাছে, আর মুক্তাউয়ার উত্তরটাই শোনালেন সীতাউয়াকে। মিস্টার সোমান্না হাসতে লাগলেন।

অন্ধকার পথে হেডলাইট জ্বেলে বিদ্যুৎবেগে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি পশ্চিমের দিকে। মাইসোর থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে মার্কারা। হাজার চারেক ফুট উঁচুতে। মার্কারা থেকে আরব সাগরের কূলে ম্যাঙ্গালোরের দূরত্ব প্রায় অতটাই। মাইসোর থেকে ম্যাঙ্গালোরের বাস যায় মার্কারার উপর দিয়ে। কিন্তু ব্যাঙ্গালোর থেকে ম্যাঙ্গালোরে যে বাস যায়, তা হাসান নামের একটা শহরের উপর দিয়ে যায়। ব্যাঙ্গালোর থেকে হাসান মিটার গেজ ট্রেনেও আসা যায়। হাসান থেকে ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত রেললাইন বসছে। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বলে শুনেছি। কিন্তু ট্রেন চলাচল করছে কিনা জানি না। মার্কারা পর্যন্ত রেললাইন হয়তো সহজে বসবে না। পাহাড়ে রেললাইন তৈরির খরচ অনেক। পরিবহনের ব্যবস্থা এখন সন্তোষজনক বলে রেললাইনের জন্যে কোন দাবির কথা শোনা যায় না।

শেষ রাতের অন্ধকারে পশ্চিমে ছুটে চলার এক অদ্ভুত আনন্দ আছে। আমরা যেন অন্ধকারকে ধাওয়া করে চলেছি, সঙ্গে নিয়ে চলেছি আলোর বিজ্ঞাপন। আমাদের পিছন থেকেই আলোর রেখা ফুটে উঠে অন্ধকারকে তাড়াবে পৃথিবী থেকে। পূর্বের আকাশ বুঝি তারই জন্যে তৈরি হচ্ছে।

হঠাৎ মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : তোমরা কি ঘুমিয়ে পড়লে সোমান্না ?

মুক্তাউয়া তৎপর ভাবে বলে উঠলেন: ঘুমোবেই তো। সবাই তো তোমার মতো নিশাচর নয়!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: কিন্তু আমার প্রাপ্য ধন্যবাদটা কেউ আমাকে দিলে না। বড় দুঃখ হয় এই সব কারণে।

ধন্যবাদ কিসের?

অসময়ে আমি সবাইকে জাগিয়ে দিলাম বলেই সবাই আমার দোষ দেখছ, কিন্তু রাতে যে তোমাদের নোটিশ না দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দিলাম তার জন্যে কি ধন্যবাদ পেতে পারি না?

আমি বললুম: দুপুর রোদে টেনে বার করলে বোধহয় ধন্যবাদ পেতেন।

মানে?

মানে, সকাল পর্যন্ত ঘুমোতে দেবার ধন্যবাদটা সকালেই পেতেন, আর মার খেতেন দুপুরে টেনে বার করবার জন্যে।

হা হা করে হেসে উঠলেন মিস্টার চাঙ্গাপ্পা। মনে হল যে গাড়ির স্টিয়ারিংটাই বুঝি কেঁপে উঠল। মুক্তাউয়া চেঁচিয়ে উঠলেন: অ্যাক্সিডেন্ট কোরো না।

পথ এখন নির্জন। মাঝে মাঝে এক-আধটা গাড়ি হেডলাইট জ্বেলে উল্টো ধার থেকে আসছে। কিন্তু পিছন থেকে কোন গাড়ি আমাদের ডিঙিয়ে যেতে পারছে না। মিষ্টি হাওয়ায় একটু শীত-শীত ভাব আছে। রাত্রে সুনিদ্রা হয়েছে বলে এখন আর কোন গ্লানি বোধ নেই, আলস্যও নেই। ভাল লাগছে পথ চলতে।

মিস্টার সোমান্না এইবারে কথা কইলেন, বললেন: মাঝপথে একবার দাঁড়িয়ো, এক ভাঁড় কফি খেয়ে তোমাকে ধন্যবাদ দেব।

আমি লক্ষ্য করলুম যে মিস্টার সোমান্না কফির উল্লেখ করলেন, চায়ের নয়। এঁরা যে কফির দেশের মানুষ তা এই উক্তিতেই বোঝা গেল। বললুম: আপনারা কফির দেশের মানুষ বলেই কফির কথা ভাবছেন, সাহেব হলে মর্নিং টি বলতেন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমাদের মার্কারায় মর্নিং টি খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মুক্তাউয়া বললেন : ওর প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নেই।

মিস্টার সোমান্না বললেন : মাইসোরে সে আশা ছিল, মাঝপথে হয়তো চা পাবেন। কিন্তু মার্কারায় পৌঁছে চায়ের কথা ভুলে যেতে হবে।

সীতাউয়া বললেন : কেন, চা কি আমরা খাই নে?

খাই, কিন্তু সে চা নীলগিরির। দার্জিলিঙের চা আমরা কোথায় পাব?

বললুম : চা মানে চা, আর মর্নিং টি মানে সকালের চা, সকালের কফি নয়।

চাঙ্গাপ্পা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি উকিল?

কেন বলুন তো!

কথায় আমরা আপনার সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠছি না!

বললুম : এটা আপনাদের বিনয়। কেননা আমিই তো আপনাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে হেরে বসে আছি।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : সে কথায় নয়, কাজে। বলতে পারেন যে আমরা দলে ভারি বলে আপনাকে জবরদখল করে ধরে নিয়ে যাচ্ছি! কিন্তু তাই বলে কি কথায় আমরা একবারও আপনাকে হারাতে পেরেছি!

হাত জোড় করে বললুম : দোহাই আপনার, বাঙালীর এই অহঙ্কারে আর সুড়সুড়ি দেবেন না। শুধু কথায় কি আর চিঁড়ে ভেজে! আমাদের চিঁড়ে অন্য লোকে ভিজিয়ে খাচ্ছে।

মিস্টার সোমান্না বললেন : কী রকম?

বললুম : নিজেদের রাজ্যটা তো কাটতে কাটতে এত ছোট হয়ে গেছে যে রাজ্যের বাড়তি মানুষগুলোকে ঠেলে ঠেলে দণ্ডকারণ্য আর আন্দামানে পাঠানো হচ্ছে। আর আমরা যখন মাঠে ঘাটে আর

সভায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছি, তখন অন্য রাজ্যের লোক এসে সব কিছুই লুটে পুটে খাচ্ছে।

তাই নাকি!

বললুম: দেখুন না কলকাতায় এসে! কলকাতাকে বাঙালীর বলে মনে হবে না। বাঙালীরা বেঁচে আছে অন্যের দয়ার ওপরে নির্ভর করে, আর নিজের ভাগ্যকেই সারাক্ষণ ধিকার দিচ্ছে।

মুক্তাউয়া গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন: আপনি কি সত্যি কথা বলছেন?

বললুম: নির্জলা সত্যি। বাঙলায় এখন কত কোটি মানুষ তার হিসেব আমার জানা নেই। কয়েকজন বাঙালী চিৎকার করে বলছেন, বাঙলা বাঙালীর। কিন্তু খাল বিল আর মাঠ ঘাট নিয়ে বাঙালী কী লাভ করবে! কলকাতা তো বিক্রি হয়ে গেছে! রাজ্যের সমস্ত বাজার হাটও অবাঙালীর হাতে। দিল্লী আমাদের নাচতে বলছে, আমরা নাচছি। তবু আমরা গর্ব করে বলি, আমরা বাঙালী। একদিন আমাদের কী না ছিল, তারই গর্ব।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: এখনও আপনাদের কী নেই বলুন! সকালে মর্নিং টি আছে—

বলে পথের ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে চারিদিকে তাকালুম। আর পিছনের দিকে চেয়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। আলোর বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে গেছে পূর্বের আকাশে, সেই আলো এসে পড়েছে পথে ঘাটে। আমরা যে একটি লোকালয়ে এসে থেমেছি, তা বুঝতে পারলুম পরক্ষণেই। মিস্টার চাঙ্গাপ্পা গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলেন। ছোটখাটো একটি দোকানের ঝাঁপ তোলা হয়েছিল, আর ধোঁয়া দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে উনুনে আঁচ পড়েছে। এটি যে একটি চা বা কফির দোকান তা বুঝতে পারলুম।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা ফিরে এসে আমাকে বললেন: একটু আগেই

আপনি হুংখ করছিলেন তো! কুর্গে আপনার খাতির দেখুন। বাঙালী দাদা এসেছেন শুনেই দোকানদার বলল, পাঁচ মিনিট, তার পরেই গরম চায়ের পেয়ালা আপনার হাতে তুলে দেবে।

আমি অবিলম্বে গম্ভীর হয়ে বললুম: সত্যই, কুর্গ বলেই এই রকমের বিরাট খাতির পেলুম!

মুক্তাউয়া বললেন: সর্বত্রই আপনার খাতির পাওয়া উচিত।

কেন?

ভদ্রলোক তো আজকাল দেখতে পাওয়া যায় না, তাই কালে-ভদ্রে একজন ভদ্রলোক দেখলে তাঁর আদর করা সবারই উচিত।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: উচিত তো অনেক কিছুই, কিন্তু আমরা কি সব উচিত মানি! না, মানতে পারি! শাস্ত্রে স্বামীকে দেবতা বলে, কিন্তু কার্যত স্বামী বেচারা সারাক্ষণ চোর হয়ে থাকে না কি!

মিস্টার ও মিসেস সোমান্না একসঙ্গে হেসে উঠলেন। কিন্তু আমি বললুম: এটা কলি যুগের লক্ষণ। কলিতে দেবতা নিজেই চোর হয়ে আছেন কিনা!

রাইট!

বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা চিৎকার করে উঠলেন: কে বলে বাঙালীরা শুধু কবি! তারা উঁচু দরের দার্শনিকও বটে। দার্শনিক না হলে এ রকম খাঁটি কথা কেউ বলতে পারে! আসুন আসুন, দোকানের বেঞ্চে বসেই আমরা মর্নিং টি খাই।

বলে সবাইকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনলেন।

একটা কথা আমার বার বার মনে আসছিল। যে বিয়েতে যোগ দেবার জন্য এঁরা চলেছেন, সে বিয়েটা কবে তা এখনও জানতে পারিনি। কদিন আমাদের থাকতে হবে তারও কোন আভাস পাইনি। সে সব প্রশ্ন এঁদের কাছে অবান্তর বলে মনে হবে, এই রকম সন্দেহ হচ্ছে। তাই চুপ করে আছি। সুযোগ মতো জেনে

নেব। আরও একটা কথা জানতে বাকি আছে। বিয়েটা কার, তাও জানি না। বর বা কনের সঙ্গে এঁদের সম্পর্কটা কী, আর এঁদের পরস্পরের সম্বন্ধই বা কী রকম, তাও জেনে নেবার সুযোগ পাচ্ছি নে। এঁদের পরিবারের সঙ্গে একত্র বাস করা যে আমার উচিত হবে না, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাকে নিয়ে গিয়ে এঁরা কী করবেন তা বুঝতে পারছি না। মনের মধ্যে এই সব প্রশ্ন উদ্বেলিত হয়ে উঠলেও তা প্রকাশ করার উপায় নেই। কোন কথাই এঁরা বলছেন না, হাসি মস্করা করে সব কথা আমার উড়িয়ে দিচ্ছেন। তাই আমি কতকটা নিরুপায়।

হঠাৎ মিস্টার চাঙ্গাপ্পার অট্টহাসি শুনে আমি চমকে উঠলুম। আমার দিকে চেয়েই তিনি হেসে উঠেছেন। অপ্রস্তুত হয়ে দেখলুম যে এক গ্লাস চা নিয়ে যে একজন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমি তা দেখতে পাই নি বলেই ভদ্রলোক হেসে উঠেছেন। অথচ আমার দু চোখ খোলাই ছিল। লজ্জিত ভাবে গেলাসটা হাতে নিতেই মিস্টার সোমান্না বললেন: উনি ভগবানের নাম করছিলেন। তাঁকে স্মরণ না করে উনি মর্নিং টি স্পর্শ করেন না।

আর মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: ধ্যানে উনি যখন মগ্ন হয়ে যান, তখন ওঁর কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না।

আমি বললুম: ধ্যানে আমি একটি বিয়ে দেখছিলুম। খুব ধুমধাম করে বিয়ে হচ্ছে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বলে উঠলেন: কী আশ্চর্য! একদিন আগেই আপনি সব প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

উঁহু, ওটা বিয়েরই মতো মনে হল।

মিস্টার সোমান্না বললেন: বিয়ে নয়, ওটা বিয়ের রিহার্সল তেরন মঙ্গল।

মিসেস সোমান্না বললেন: আজ তো করিকমুরিপা। মঙ্গলকুরিপায় আমাদের উপস্থিত থাকা উচিত ছিল।

মিস্টার চাঙ্গাপা ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন : উচিত তো অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু সব কর্তব্য কি আমরা সব সময় পালন করতে পারি। মুক্তাউয়ার আদরের বেরাল সরস্বতীর জ্বর হয়ে গেল বলেই তো একদিন আমাদের দেরি হল! এ কথা কি সবাই বুঝবেন না?

সীতাউয়া বললেন : যা হবার হয়েছে। বিয়ে বাড়িতে আর এ সব কথা বোলো না।

আমি বললুম : আমার প্রতি আপনারা মোটেই সদয় নন।

কেন কেন?

বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা যেন বসে বসেই লাফিয়ে উঠলেন।

বললুম : মঙ্গল কুরিপা করিক মুরিপা তেরন মঙ্গল কত কি সব বলে গেলেন, কিন্তু এই অধম যে কিছু বুঝল না তা কেউ বুঝলেন না।

মুক্তাউয়া অমনি বলে উঠলেন : বুঝবে কী করে? ওরা যে সারাক্ষণ নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত আছে। আর—

আর কী?

বলব?

বলে মুক্তাউয়া তাঁর স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তৎপর ভাবে বললেন : গোপন করার মতো তো কিছু নেই! বলতে বাধা কিসের!

মুক্তাউয়া এবারে আমাকে বললেন : এদের বিয়ে কত রকমের একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন না! মাথা আপনার খারাপ হয়ে যাবে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : মাথা ঠাণ্ডা হলে খারাপ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সোমাপ্পা, তুমি তো কিছু কিছু জানো, বল না বাঙালী দাদাকে।

মিস্টার সোমাপ্পা বললেন : এখানে নয়। চা শেষ করে গাড়িতে বসি, তার পর বলব

তবে এক রাউণ্ড কফি হয়ে যাক, গল্পটা জমবে ভাল।

বলেই মিস্টার চাঙ্গাপ্পা কফির অর্ডার দিলেন।

২০

গাড়িতে বসে মিস্টার সোমাপ্পা বললেন : চাঙ্গাপ্পা ঠিকই বলেছে। আমাদের আচার ব্যবহারের কথা কিছু না জানলে বিয়ের ব্যাপারটা বাঙালী দাদা উপভোগ করতে পারবেন না।

মুক্তাউয়া বললেন : কত রকমের বিয়ে আছে, সেইটেই ওঁর আগে জানা দরকার।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : আমরা যে একটা বুনো জাত, তা মেনে নিতে আমার কোনই আপত্তি নেই। ডারউইনের মতে তো সব মানুষেরই পিতৃপুরুষ বাঁদর! কারও লেজ আগে খসেছে, কারও পরে।

মুক্তাউয়া বলে উঠলেন : এখনও সবার খসে নি যে!

মেনে নিলাম যে সেই রকমেরই একজনের গলায় বরমাল্য দিয়ে তুমি এখন পস্তাচ্ছ। কিন্তু পথ তোমার খোলা আছে, চাইলেই তোমার বরমাল্য আমি ফেরত দিতে পারি। কিন্তু—

কিন্তু কী?

লেজ খসে নি এমন জাতের মেয়ে কি সভ্য লোকে পছন্দ করবে! চেষ্টা করে দেখতে পার।

বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা একবার আমার দিকে চেয়ে কটাক্ষ করলেন।

আমি এই রসিকতায় যোগ না দিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে রইলুম, আর মুক্তাউয়া বলে উঠলেন : এই রকমের ভাল্‌গার লোক শুধু এই দেশেই আছে।

মিস্টার সোমাপ্পা রাগ না করে হাসতে লাগলেন।

আমি বললুম : এই বারে আপনাদের বিয়ের গল্প বলুন।

সামনে থেকে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আদেশ করলেন : শুরু কর।

মিস্টার সোমাপ্পা বললেন : বেশি নয়, আমাদের সমাজে মাত্র আট রকমের বিয়ে প্রচলিত আছে।

আশ্চর্য হয়েও আমি বললুম : সে তো এমন কিছু বেশি নয়! পুরাকালে হিন্দু ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শুনেছি গন্ধর্ব রাক্ষস প্রভৃতি—

বাধা দিয়ে মুক্তাউয়া বললেন : আগে শুনুন এদের এখনকার কথা, তারপর পুরাকালের কথা মিলিয়ে দেখবেন।

ধমক খেয়ে আমি আর কিছু বলার সাহস পেলুম না।

মিস্টার সোমাপ্পা হেসে বললেন : কোদি মঙ্গল নামে একটা বিয়ে এখন প্রায় অপ্রচলিত হয়ে এসেছে—

মুক্তাউয়া শক্ত ভাবে বললেন : এখনও হচ্ছে বলে শোনা যায়। ছেলেমেয়েদের জ্ঞান হবার আগেই দুই বাপে তাদের হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিচ্ছে।

অ্যাঁ!

বলে আমি পিছন ফিরে তাকাতেই মুক্তাউয়া বললেন : আমার বাবা রুখে না দাঁড়ালে আমার দশাও তাই হত।

এখন তাহলে ভাল হয়েছে বল?

বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পাও একবার ফিরে তাকালেন।

মুক্তাউয়া বললেন : তোমাদের কোন্‌টা ভাল?

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম : বাকি সাত রকম বিয়ের কথা বলুন।

মিস্টার সোমাপ্পা বললেন : প্রথম তিন রকম হল কেমিকুতি মঙ্গল নরি মঙ্গল ও বলে মঙ্গল।

মুক্তাউয়া বলে উঠলেন : এই তিন বিয়েতে কনে লাগে না, জানেন?

সে কি!

শুনুন না মজার কথা!

মিস্টার সোমান্না বলে উঠলেন : কেমিকুত্তি হল কান বেঁধানোর বিয়ে, একটা বাঘ শিকারের পর নরি মঙ্গল বিয়ে, আর দু-একটা বউ মরবার পর নতুন করে বিয়ে করবার আগে কলা গাছের সঙ্গে বিয়ে। তারই নাম বলে মঙ্গল।

আমি হেসে বললুম : সেই কলা বউ নিয়ে কী করতে হবে?

মুক্তাউয়া বললেন : তার পরদিনই আর একটা বিয়ে করুন। কিন্তু তখন আর কন্নি মঙ্গল হবে না, তখন হবে কুডাভলি মঙ্গল।

মিস্টার সোমান্না বললেন : কন্নি মঙ্গল একবারই হয় এই যেমন আমাদের। প্রথম বিয়ের নাম কন্নি মঙ্গল। এই রকমেরই একটা বিয়ে দেখতে আমরা যাচ্ছি।

আমি আঙুলে হিসেব রাখছিলুম, বললুম : আর তিন রকম?

মিস্টার সোমান্না বললেন : কুডাভলি মঙ্গলের নাম শুনলেন, এ হল বিপত্নীকদের বিয়ে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বলে উঠলেন : মুক্তা যদি আমাকে ডাইভোর্স করে, তাহলে আমার কপালেও কুডাভলি মঙ্গল।

আর দু রকম?

ওক্কা পরিজে ও মক্কা পরিজে।

মানে?

মানে প্রথমটা হল পরিবারের জন্যে, আর দ্বিতীয়টা সন্তানের জন্যে বিয়ে।

মুক্তাউয়া বলে উঠলেন : বুঝুন ব্যাপার!

মিস্টার সোমান্না সহাস্যে বললেন : কিন্তু মেয়েদের বেলাতেও আমরা কৃপণ নই। তাদের জন্যেও ছ রকমের বিয়ে আছে।

বলেন কি!

পুরুষের মতো চার রকম বিয়ে তো থাকবেই। প্রথম বিয়ে কন্নি মঙ্গল, বিধবা বিয়ে কুডাভলি মঙ্গল—

বাধা দিয়ে মিস্টার চাঙ্গাম্মা বললেন : মুক্তা ইচ্ছা করলেই আমাকে তালাক দিয়ে আর একজনকে বিয়ে করতে পারে।

মুক্তাউম্মা বলে উঠলেন : তোমরা করবে, আর মেয়েরা করলেই দোষ !

মিস্টার সোমাম্মা নিজের কথার জের টেনে বললেন : পরিবারের জন্যে বা সন্তানের জন্যে পুরুষরা তো মেয়েদেরই বিয়ে করে ! তাই মেয়েদেরও সে বিয়ের অধিকার আছে।

খুব চমৎকার অধিকার !

বলে মুক্তাউম্মা একটা ভেংচি কাটলেন।

এবারেও আমি আঙুলে হিসেব রাখছিলুম, বললুম : আর দু রকম ?

সোমাম্মা বললেন : মেয়েদেরও নরি মঙ্গল আছে, বাঘ শিকার করলে তাদেরও বিয়ে হয়, আর—

বলে তিনি মেয়েদের দিকে কটাক্ষে একবার চেয়ে নিয়ে সকৌতুকে বললেন : পৈতনডেক আলেপা মঙ্গল হল সবচেয়ে সম্মানের বিয়ে।

সে কী রকমের ?

মা হবার পরে, মানে একটি দুটি সন্তানের জননী হবার পরে নয়, দশটি সন্তানের জন্ম দেবার পরে মেয়েদের সবচেয়ে বড় সম্মান এই বিয়ে।

আমি অত্যন্ত ভালমানুষের মতো মুখ করে জিজ্ঞাসা করলুম : তখন কি আর একজনের সঙ্গে বিয়ে হয় আরও দশটি সন্তানের মা হবার জন্যে ?

আমার এই প্রশ্ন শুনে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলেন। আমি গম্ভীর হয়ে বললুম : এ বিয়েটা বোধহয় আপনাদের তুলে দিতে হবে।

কেন ?

ভারত সরকার খুব চেঁচামেচি করছে—দো ইয়া তিন, ব্যস।

তাই আমার মনে হয় যে ছেলেপিলে না হলেই একটা বিয়ে দেওয়া হোক।

মিস্টার সোমান্না বললেন: সে তো আছেই।

বললুম: পুরুষদের আছে, মেয়েদের তো নেই। মেয়েদের জন্যেও একটা মক্কা—

মক্কা পরিজে!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা কাঁদ-কাঁদ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন: না না বাঙালী দাদা, এ অধিকার দেবেন না। আমরা অনেকেই তাহলে বাতিল হয়ে যাব।

মিস্টার সোমান্না গম্ভীর ভাবে বললেন: খাঁটি কথা বাঙালী দাদা, খুব খাঁটি কথা। বেচারা চাঙ্গাপ্পার বিয়ে অনেক দিন হয়েছে—

মুক্তাউয়া আমাকে বললেন: এই সমস্ত এদের রসিকতা, বুঝলেন! ভাল্‌গার, অত্যন্ত ভাল্‌গার জাত।

এখন আর অন্ধকার নেই। প্রভাতের প্রথম আলোয় পথ ঘাট এখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আমরা পাহাড়ের উপর দিয়ে চলেছি। মনে হচ্ছে, এই পাহাড়ের উপরেই কুর্গের প্রধান শহর মার্কারা। সুন্দর শহর বলে শুনেছি। আর কিছু না হোক, এই শহরটি আমার দেখা হয়ে যাবে বলে ভাল লাগছে। এদের বিয়ে দেখতেও আমার মন্দ লাগবে না। নীলগিরি পাহাড়ের টোডাদের সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবারে কোডাভাদেরও দেখতে পাব।

মিস্টার সোমান্না বললেন: ভাববেন না যে কুর্গের সব অধিবাসীই কোডাভা। কম করেও এখানে চল্লিশটি জাত ও উপজাতি আছে। কিন্তু বিবাদ নেই কারও সঙ্গে। একশো বছর আগে এখানে যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এক একটা পরিবারে বাস করত কুড়ি থেকে পঞ্চাশজন মেয়ে পুরুষ। সেই সময়ের অনেক নিয়মকানুন এখনও আমাদের মেনে চলতে হয়।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বলে উঠলেন:

হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন ?

বললুম : বর নেই বা কনে নেই, তবু বিয়ে হয় কেমন করে তা ভেবে পাচ্ছি না।

মিস্টার সোমান্না বললেন : উৎসবটা ঠিক বিয়ের মতো বলেই নাম বিয়ে। একে বিয়ে না বলে অন্য কিছু বললেও চলত।

বললুম : তবে একটু বুঝিয়ে বলুন।

মিস্টার সোমান্না বললেন : কিছুদিন আগেও এই কান বেঁধানো বিয়েটা সবাইকেই করতে হত। এ বিয়ে না হলে আসল বিয়ে হত না।

বললুম : বাঙালী ব্রাহ্মণদেরও কান বেঁধাবার নিয়ম আছে। উপনয়নের সময় কান বেঁধাতে হত, টিকি রাখতে হত। এখন এসব উঠে গেছে। শুধু নিয়ম রক্ষা। পৈতের সময় মাথা কিন্তু মুড়োতে হয়, আর নাম মাত্র একটুখানি টিকি দিন কয়েক না রাখলে নয়। তবে কানে একটা ছুঁচ ছোঁয়ালেই কান বেঁধানোর নিয়ম রক্ষা হয়।

মিস্টার সোমান্না বললেন : আমাদের কেমিকুতি মঙ্গলও এই রকম। বালকেরা বরের মতো সেজেগুজে বসবে কাঁধে দুখানা লাল কাপড় ঝুলিয়ে। স্বর্ণকার এসে কান বিঁধিয়ে এক জোড়া কডকু পরিয়ে দেবে।

কডকু আবার কী জিনিস ?

ইয়ার রিং। তার পর বরের কাঁধের লাল কাপড় আর সিধে দক্ষিণা নিয়ে সে চলে যাবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : বিয়ে হয়ে গেল !

বিয়ের গান-টান সবই হবে।

মন্ত্র-তন্ত্র ?

সে সব হাঙ্গামা আবার কেন !

বললুম : বাঘের সঙ্গে বিয়েটা কী রকম ?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হেসে উঠলেন। আর মিস্টার সোমান্না বললেন :

বাঘের সঙ্গে তো বিয়ে নয়, বিয়েটা কারও সঙ্গেই নয়। কোন ছেলে বা মেয়ে একটা বাঘ মেরে নিয়ে এলে যে বিয়ে হয়, তার নাম নরি মঙ্গল। বাঘটাকে বনে ফেলে এলে চলবে না, মাথা আর লেজ সুদ্ধ চামড়াটা চাই। গ্রামের মাঠে বাঁশ বেঁধে টাঙাতে হবে সেটা, প্যাণ্ডালের নিচে বর বসবে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে। তার বীরত্বের কথা গান গেয়ে শোনানো হবে।

তারপর ?

তারপর আবার কী ! বিয়ে হয়ে গেল।

আমি বললুম ঃ দুদিন পরে লোকে তো ভুলেই যাবে এই কথা !

মিস্টার সোমান্না বললেন ঃ ভুলবে কী করে ! তার গোঁফ রাখার ধরন দেখেই তো সবাই বুঝতে পারবে যে তার নরি মঙ্গল হয়েছে।

আমি একবার মিস্টার সোমান্নার গোঁফের দিকে আর একবার মিস্টার চাঙ্গাপ্পার দিকে তাকালুম।

তাই দেখে মুক্তাউয়া বললেন ঃ ওদের দিকে তাকাচ্ছেন কী ! কেমিকুত্তি মঙ্গলের মতো নরি মঙ্গল না হলে বিয়ে হবে না নিয়ম হলে এ যুগে এদের আর বিয়ে হত না। বাঘের নামেই এদের এখন বুক কাঁপে, বন্দুক পড়ে যায় হাত থেকে।

সত্যি !

খাঁটি সত্যি। বাড়ি গিয়ে আলমারি থেকে এরা মরচে-পড়া বন্দুক বার করবে।

সীতাউয়া বললেন ঃ তোমরা তো কেইল পোলডু ছেড়ে দিয়েছ ! বন্দুক বার করবে কী করে ?

কাউকে উত্তর দেবার সময় না দিয়ে আমি বললুম ঃ বারে বারেই বিপদে ফেলছেন আমাকে !

কেন ?

চোদ্দ রকমের বিয়ে নিয়েই হিমসিম খাচ্ছি। এরই মধ্যে কেইল পোলডু ঢুকে পড়ল। কত সামলাই বলুন তো !

হেসে উঠলেন মিস্টার চাঙ্গাপ্পা। কথায় কথায় হাসতে তিনি ভালবাসেন। আমারও এই হাসি দেখতে ভাল লাগে বলেই নানা কথায় তাঁকে হাসাতে চাই। মিস্টার সোমাপ্পা বললেন: কেইল পোলড়ু হল আমাদের অস্ত্র পূজা। আসলে কোডাভারা তো যুদ্ধপ্রিয় জাত, কিন্তু বর্ষার সময় চাষবাস না করলে চলে না বলে বন্দুকগুলো তুলে রাখতে হয়। মাঠের কাজ শেষ হলে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে একটা উৎসব করে বন্দুক আর তরোয়াল বার করতে হয়। পরিষ্কার-টরিষ্কার করে চন্দন মাখিয়ে বিশেষ ফুল দিয়ে পূজো করবার পরে ভোজ হয় মদ আর শুয়োরের মাংস দিয়ে। তারপর শিকার।

মুক্তাউয়া বললেন: তোমরা তো কিছুই কর না! কী বলবে বাড়ি গিয়ে?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: আমরা কিছুই বলব না।

লোকে জিজ্ঞেস করলে?

বলব মুক্তাকে জিজ্ঞেস কর। মিথ্যে বলতে হয় তো সে বলবে। আমি সত্যি কথাই বলে দেব।

সীতাউয়া বাধা দিয়ে বললেন: কী দরকার আমাদের এ সব কথার মধ্যে থাকবার!

মুক্তাউয়া বললেন: বীরের জাত বলে গর্বের যে শেষ নেই!

আমি বললুম: বুঝেছি ব্যাপারটা।

কী বুঝেছেন?

বাঘ না মেরেই এঁরা গোঁফ রেখেছেন ঝাঁটার মতো ছেঁটে। অথচ আপনাদের প্রধান সেনাপতি জেনারেল কারিয়াপ্পার ছবি দেখেছি। আমাদের মতো তাঁর কামানো গোঁফ।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: তবে আর কি, আপনিও জেনারেল কারিয়াপ্পা হতে পারবেন।

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম: না, পারব না।

কেন ?

বন্দুকের লাইসেন্স রিনিউ করতে ঝামেলা হত বলে প্রতিজ্ঞা করে বসেছি যে জীবনে আর বন্দুক ছোঁব না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আবার হেসে উঠলেন।

মিস্টার সোমান্না বললেন : আপনি যে রকমের রসিক লোক, তাতে আমাদের হুৎরি উৎসবটা দেখাতে পারলে মন্দ হত না।

আমি হাত জোড় করে বলে উঠলুম : রক্ষে করুন, এর মধ্যেই আমি অনেক শিখে ফেলেছি। আর আমাকে নতুন কিছু শিখতে বলবেন না।

মিস্টার সোমান্না বললেন : অমন ভয় পাচ্ছেন কেন ! এ রকমের উৎসব তো সব রাজ্যেই আছে শুনেছি। আপনাদের নেই ?

হুৎরির মানে না বুঝলে আপনার প্রশ্নের জবাব দেব কেমন করে ?

হুৎরি মানে নতুন ধান।

নতুন ধান ঘরে আনার উৎসব তো ! আমরা নবান্ন বলি। নতুন চালের পায়েস খাই।

মিস্টার সোমান্না বললেন : এক সপ্তাহ ধরে নাচ গান করেন ?

বললুম : না। নাচ গানের ব্যাপারটা আমরা আদিবাসীদের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি।

আমরা তা দিই নি। কিংবা আমাদেরই আপনি আদিবাসী বলতে পারেন। তাই অঘ্রান মাসের পূর্ণিমায় আমরা এই উৎসব শুরু করি।

তার মানে রাস পূর্ণিমায়। আমরা তখন কৃষ্ণের রাসলীলার উৎসব করি।

আমাদের গাড়ি বিদ্যুৎ বেগে পাহাড় অতিক্রম করে চলেছে। মার্কারা আর দূরে বলে মনে হচ্ছে না। এ কথা বুঝতে পেরেই বোধহয় সীতাউল্লা বললেন : হুৎরির গল্প ছেড়ে এবারে কিছু কাজের কথা বল।

কাজের কথা!

হ্যাঁ। বাঙালী দাদাকে আমাদের বাড়িতে তুলবে, না—

না না, আমাদের বাড়িতে থাকবেন বাঙালী দাদা।

পিছন ফিরে দেখলুম যে এই দাবী মুক্তাউয়ার। অত্যন্ত বিনীত ভাবে আমি বললুম: আমাকে কোন হোটেলে থাকতে দিন না! আমি কথা দিচ্ছি, আপনাদের সব অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত থাকব।

মুক্তাউয়ার মুখ এক মুহূর্তে বিষণ্ণ হয়ে গেল। সজল মেঘের মতো হল তার দৃষ্টি। বিস্ময়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলুম। আর কোন কথা বলতে পারলুম না।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: শুধু শুধু কেন আপত্তি করছেন বলুন তো!

মুক্তাউয়াও আর কোন কথা কইলেন না। মনে হল যে অভিমানে তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে গেছে। আশ্চর্য এই নারী! আমার বিস্ময়ের যেন আর অন্ত রইল না।

সীতাউয়া বললেন: আপনি আপত্তি করবেন না বাঙালী দাদা, মুক্তার কাছে আপনার ভাল লাগবে।

আমি বুঝতে পারছিলুম যে সবাই এখন একমত, আমার আর অন্য মত থাকলে চলবে না। তাই মুক্তাউয়ার দিকে চেয়ে আমি বললুম: আমি কত জ্বালাতন করতে পারি, তা তো আপনারা জানেন না। তাই আমাকে হোটেলে রাখতে চাইছেন না। বেশ, আপনাদের কাছেই থাকব। তারপর কিন্তু গলা ধাক্কা দিয়ে আমাকে বার করে দেবেন না!

বলে আমি হাসতে লাগলুম। আর আমাকে হাসতে দেখে সহজ হয়ে গেলেন মুক্তাউয়া। একেবারে স্বাভাবিক। বললেন: আমাদের কাছে আপনার কোন কষ্ট হবে না।

বললুম: আমি তো নিজের কষ্টের কথা ভাবিনি, ভেবেছিলুম আপনাদের অসুবিধার কথা।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বলে উঠলেন : বাঁচালেন আমাকে।

পাহাড়ের পথে আর দু-একবার পাক খাবার পরেই পথের ধারে ধারে ঘরবাড়ি দেখতে পাওয়া গেল। মার্কারার উপকণ্ঠে আমরা পৌঁছে গেছি—মার্কারার ঈস্ট এণ্ড্। খানিকটা এগোবার পরে বাঁ দিকের একটা পথ দেখিয়ে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : এইটে তলা কাবেরীর পথ। এই পথেই ম্যাঙ্গালোরে যেতে হয়।

তলা কাবেরী!

কাবেরী নদীর উৎস। যাবেন এক দিন?

আমি না বলতে পারলুম না, হ্যাঁ বলতেও দ্বিধা হল।

মুক্কাউয়া বললেন : বাঙালী দাদা বড় লাজুক। ওঁর ওপরে জবরদস্তি করতে হবে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : ঠিক বলেছ তুমি।

তাঁর গাড়ির গতি অনেক মন্থর হয়েছিল। আমরা বোধহয় মার্কারা শহরে তখন ঢুকে পড়েছিলুম

২১

মিস্টার সোমান্নাদের নামিয়ে দিয়ে আমরা মিস্টার চাঙ্গাপ্পাদের বাড়িতে এসে নামলুম। গাড়ি থেকে নেমে যাবার সময় সীতাউয়া বলেছিলেন : রেডি হয়েই বিয়ে বাড়িতে চলে আসবেন।

এইবারে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : আমাদের খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে হবে বাঙালী দাদা।

আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলুম না, জিজ্ঞাসা করলুম : বিয়েটা করে ?

ঠিক এই সময়েই এক মহিলা খাস কুর্গী পোশাকে হাতে এক ঘড়া জল নিয়ে সামনে উপস্থিত হলেন এবং সহাস্যে সেই ঘড়াটি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে মিস্টার চাঙ্গাপ্পার মুখের দিকে তাকালুম। তিনি বললেন : হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন বাঙালী দাদা, হাতে নিন ঘড়াটা !

ঘড়া ঠিক নয়, ঘটির চেয়ে কিছু বড় একটা জলের পাত্র। আমি আর দ্বিধা না করে সেই ঘড়াটি-হাতে নিয়ে নিলুম।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : জুতো মোজা খুলে পা ধুতে হবে ঐ জল দিয়ে। এটা আমাদের অতিথি আপ্যায়নের নিয়ম।

বললুম : শীতের দিনেও পা ধুতে হবে !

উপায় নেই। তবে এখনও তো শীত পড়েনি, অমন ভয় পাচ্ছেন কেন !

আমি ইতস্তত করছিলুম। আর ঠিক এই সময়েই মুক্তাউয়া এসে আমাকে রক্ষা করলেন। আমার হাতের ঘড়াটি ছিনিয়ে নিয়ে

বললেন : এদের কাণ্ড কারখানা দেখছেন তো! অতিথির ওপরেও অত্যাচার

বলে ঘড়াটি সেই মহিলার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন : আমার ছোট জা বিশাখা। আর ইনি হলেন আমাদের বাঙালী দাদা। উটি থেকে আমরা ধরে এনেছি।

আমি বিশাখাকে একটা নমস্কার করে বললুম : বিশাখা যে বাঙালী নাম!

বিশাখা বললেন : বিশাখা নক্ষত্রে আমার জন্ম বলে এই নাম হয়েছে।

কিন্তু আপনার নামের পেছনে উয়া নেই কেন?

বিশাখা হেসে বললেন : ওটা আপনাদের সুবিধের জন্যে।

বলে জলের ঘড়া হাতে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা যে ভিতরে চলে গিয়েছিলেন, আমি তা দেখতে পাই নি। ফিরে এসে বললেন : আপনি কী জানতে চেয়েছিলেন?

বললুম : বিয়েটা কার?

ও এই কথা! বিয়ে হচ্ছে আমার ছোট শালার। মানে আমার পরমারাধ্য পত্নী মুক্তার ছোট ভাইএর।

মিস্টার সোমান্নার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক?

মাসতুতো পিসতুতো কী তুতো বলে—না না থাক এ সব সম্পর্কের কথা। সবার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শুনতে গেলে আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

আমি বললুম : মনে হচ্ছে যে সম্পর্কটা খুব নিকট। তা না হলে এত দূর থেকে সবাই একত্র হচ্ছেন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : এ আমাদের সমাজের নিয়ম। কিছুদিন আগে তো গ্রামের উৎসবেও এসে যোগ দিতে হত।

এই সময়ে মুক্তাউয়া আবার বেরিয়ে এসে বললেন : তোমরা

কি বাইরে দাঁড়িয়েই গল্প করবে! কাল সন্ধ্যেবেলায় আমার মামা এসে পৌঁছে গেছেন, আমি এখুনি বেরোব।

তারপরে আমার দিকে চেয়ে বললেন: আসুন আমার সঙ্গে।

আমি তৎপর ভাবে এগিয়ে গেলুম।

মুক্তাউয়া আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন: এটি আপনার ঘর। লাগোয়া বাথরুম আছে। আপনার জিনিসপত্র ঘরে এসে গেছে। মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে ডাইনিং টেবলে চলে আসুন, ব্রেক-ফাস্ট রেডি।

তারপর আমার কাছে ঘেঁষে এসে বললেন: আমাদের পর ভাববেন না বাঙালী দাদা, ভাববেন—

কিন্তু কী ভাববেন তা বলবার অবকাশ তিনি পেলেন না। তার আগেই মিস্টার চাঙ্গাপ্পা এসে বললেন: একটা জবর আইডিয়া মাথায় এসেছে। আপনি এখন জামা-কাপড় বদলাবেন না বাঙালী দাদা, বদলাবেন ব্রেকফাস্টের পরে।

তারপর মুক্তাউয়ার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা আমার চোখে কিছু বিসদৃশ ঠেকল। মুক্তাউয়া আমার কাছে এসে কী বলতে চেয়েছিলেন জানতে পেলুম না। আর মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হুট করে ঘরে ঢুকে তাঁর স্ত্রীকে কেন টেনে নিয়ে গেলেন তাও বুঝতে পারলুম না। তিনি কি মুক্তাউয়াকে চোখে চোখে রেখেছেন! কিন্তু কেন!

আমি বেশি দেরি করলুম না। খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখতে পেলুম যে মুক্তাউয়া গাড়ি ড্রাইভ করে বেরিয়ে গেলেন। মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন: আসুন ব্রেকফাস্ট করতে।

মুক্তাউয়ার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার অপরিসীম দ্বিধা হল। আবার তাঁকে ফেলে টেবলে বসতেও ইচ্ছা হল না। আমার এই দ্বিধা লক্ষ্য করে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: আপনি কি

মুক্তার জন্যে অপেক্ষা করবেন ভাবছেন! সে তার মামাকে আনতে গেল। আমরা যে এসে পেঁাছে গেছি, সে খবরটাও সবাইকে জানিয়ে আসবে।

এইবারে আশ্বস্ত হয়ে বললুম: মামাবাবুর জন্যে আমাদের অপেক্ষা করাই তো উচিত।

কিন্তু ওদের যদি দেরি হয়?

আমাদেরই বা তাড়া কিসের!

বিয়ে বাড়িতে তো তাড়াতাড়ি পেঁাছতে হবে!

তার পরেই বললেন: বুঝেছি। তবে আসুন আমার সঙ্গে। এই সুযোগে আমাদের হালচাল কিছু আপনাকে জানিয়ে দিই।

বললুম: সেই ভাল।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: এটা আমাদের পৈতৃক বাড়ি, আমার ঠাকুর্দার আমলে খাঁটি কোডাভা শৈলীতে তৈরি। এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আপনাকে দেখিয়ে দিই।

বলে আমাকে বারান্দার নিচে নামিয়ে আনলেন।

একটা জিনিস আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলুম। এই বাড়িটি শহরের মধ্যে নয়, শহরের উপকণ্ঠে পাহাড়ের গায়ে। প্রশস্ত রাজপথ থেকে একটা সঙ্কীর্ণ পথ বাড়ির গেট পর্যন্ত উঠে এসেছে। তার পরে সমতল পথ। অনেকখানি এলাকা জুড়ে একটা রীতিমতো বড় বাড়ি। চারিদিকে বহু গাছপালা পরিবেশটা ছায়াছন্ন করে রেখেছে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: এই পৈতৃক বাড়িকে আমরা আইন মানে বলি। যৌথ পরিবার আজকাল বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। শহরে গিয়ে নতুন ধরনের বাড়ি করছে অনেকে। কিন্তু সে সব বাড়িতে বিয়ে হতে পারবে না, হুৎরি উৎসবও হবে না। যে যত বড়ই হোক না, নিজেদের পৈতৃক বাড়িতে এসে উৎসব করতে হবে।

আমি বললুম: বিয়ে বাড়িটা কি অনেক দূরে?

তা একটু দূরে বৈকি। কিন্তু মুক্তাডয়া শহরে গেছে তার ভাইএর বন্ধুর বাড়িতে। তার ধারণা যে মামা এখনও বিয়ে বাড়িতে যান নি। আর গাড়ির ট্যাঙ্কে বোধহয় পেট্রোলও ভরে আনবে।

আমি বললুম: এই বারে আইন মানের গল্প বলুন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হেসে বললেন: শুধু একটা কথা বলেছি বলে স্মৃতিশক্তির বড়াই করছেন তো! এই বারে একটা একটা করে যদি আমাদের সব কথা বলতে আরম্ভ করি—

বাধা দিয়ে আমি বললুম: কেঁদে ফেলব।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হাসতে হাসতেই বললেন: বারান্দায় ওঠবার সিঁড়ির দু পাশে দুটো সিংহ দেখতে পাচ্ছেন?

পাচ্ছি।

তারপর বাড়ির থামগুলো, আর সদর দরজার চৌকাঠের কারুকার্য?

তাও দেখতে পাচ্ছি।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: এই সব বাড়ি কতকটা দুর্গের মতো।

কেন?

অনেক দিন আগে নাকি পরিবারে পরিবারে লাঠালাঠি যুদ্ধ-বিগ্রহ হত, তাই দেখবেন যে আমাদের বাড়ির সীমানায় খাদ কাটা আছে। চট্ করে কেউ যেন টপকে আসতে না পারে। আর ওপরের ঘর দেখুন। ওখানে বসে শত্রুর গতিবিধিও লক্ষ্য করা যায়। এইবারে বাগানে আসুন, কয়েকটা গাছ আপনাকে দেখাই।

আমি এগিয়ে গেলুম তাঁর সঙ্গে। কলা, নারকেল আর সুপুরি গাছ দেখলুম অনেকগুলো। কিন্তু ঝোপের মতো গাছগুলো চিনতে পারলুম না। বাঙলায় এ রকমের গাছ আমি দেখি নি। আমার দিকে চেয়ে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা জিজ্ঞাসা করলেন: এ গাছ চিনতে পারলেন না তো?

হেসে বললুম : চিনেছি।

চিনেছেন !

এ কফির গাছ না হয়েই যায় না।

এ আমার অনুমানের কথা, একেবারেই আন্দাজে বলেছি। কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আশ্চর্য হয়ে বললেন : কী করে চিনলেন বলুন তো ! আপনাদের দেশে তো কফি হয় না।

আমি বললুম না যে সেবারে কেরালা ভ্রমণের সময়ে এই রকমের গাছ দেখেছি দূর থেকে। তার বদলে বললুম : অনুমান।

খুব ঠকিয়েছেন আমাকে। আগে জানলে বলতাম—এলাচ কিংবা গোলমরিচ।

তাতে কী লাভ হত আপনার ?

মজা হত। আপনার বিদ্যে দেখে হাসত সবাই। আর আমরাও হাসতাম।

বললুম : ও দুটো গাছ এখনও চিনি না। ইচ্ছে করলে উল্টোপাল্টা বলতে পারেন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : তার আগে এই গাছগুলো চেনেন কিনা বলুন।

কাছে গিয়ে দেখলুম যে লেবুর মতো পাতার গাছ, গোল গোল ফলও ধরেছে। পাতি লেবুর গাছ এত বড় হয় না, বাতাপি লেবুর মতোও মনে হল না। তাই বললুম : মোসাম্বি নয়, এ কমলা লেবু।

এটাও ঠিক বলেছেন। বোধহয় জানেন যে এ অঞ্চলে কফি ও কমলা লেবুর চাষ হয়।

বললুম : আমরা তো শহরের ছেলে নই, গ্রামের ছেলে। তাই কিছু গাছপালা চিনি। তবে যদি অভয় দেন তো একটা অনুরোধ করি। কফি সম্বন্ধে কিছু জানবার ইচ্ছে আছে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তাঁর ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে বললেন : হাতে সময় কম তো, তাই সংক্ষেপে বলতে হবে। এই কফির আদি

বাসস্থান হল ইথিওপিয়ার কাফা অঞ্চল। কিন্তু আরব থেকেই পৃথিবীর নানা দেশে কফির চাষ শুরু হয়েছে। এ অঞ্চলে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। ১৬০০ সালে বাবা বুদন সাহেব নামে একজন কর্নাটকের চন্দ্রগিরি পাহাড়ে কফির চাষ আরম্ভ করেন। এখন সেই বাবা বুদন পাহাড়ে ও কুর্গে সবচেয়ে বেশি কফির চাষ হয়।

কফির গাছগুলি আমি ভাল করে দেখছিলুম। তাই দেখে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: এই গাছগুলো কফ্‌ফেয়া আরাবিকা জাতের। এই চিরহরিৎ গাছ দশ থেকে পনের ফুট উঁচু হয়। কিন্তু চা গাছের মতো একে দরকার মতো ছেঁটে ছোট করে রাখা হয়। সাদা সুগন্ধি ফুল হয় গোছায়, ফল বেরি জাতের, দানা থাকে সাধারণত দুটো। বীজ থেকেই কফি তৈরি হয়। যে ফলে একটি দানা থাকে তার কফি বেশি দামে বিক্রি হয়। তাকে আমরা পীবেরি বলি। কফ্‌ফেয়া রোবুস্তা ও স্তেনোফিল্লা থেকে যে কফি হয় তা নিকৃষ্ট মানের। রোবুস্তা এসেছে জাভা থেকে। আরও কয়েক জাতের কফি আছে। তাদের নাম লিবেরিকা কানেফোরা বেঙ্গালেনসিস। কিন্তু আমরা দু জাতের কফি চাষ করি—আরেবিকা ও রোবুস্তা। তিন বছর বয়স হলেই গাছে ফল পাওয়া যায়। আর এক একটা গাছ তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর ফল দেয়। ফল পাকতে সময় লাগে ছয় থেকে আট মাস। কিন্তু একসঙ্গে ফল তোলা হয় না। পনের দিন অন্তর আমরা ফল তুলি। তাজা ফলের দানা বার করে নেওয়া হয় যন্ত্রে, রোদ বা তাপে সেই দানা শুকিয়ে রোস্টিং করা হয়। তারপর পাউডার করে বিক্রি হয় বাজারে।

বললুম: অনেক দক্ষিণ ভারতীয়কে দেখেছি দানা কিনে বাড়িতে গুঁড়িয়ে নেন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: আমরাও তাই করি।

তাতে কি কফি ভাল হয়?

এ আমাদের অনেক দিনের অভ্যেস। ভাল হয় ভাবি বলেই চলে আসছে।

এর পরেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আপনারা কোকোর চাষ করেন না?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: সম্প্রতি কয়েকটা গাছ এনে লাগিয়েছি, এ দেশে এর ফল কেমন হয় দেখতে চাইছি।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: এ দেশে কি কোকোর চাষ নেই?

নানা জায়গায় পরীক্ষা চলছে বলে শুনেছি। কোকো আর চকোলেটের জন্যে বিদেশের ওপরেই আমাদের নির্ভর করতে হয়।

বাগানের পিছনের দিকে যেতে যেতে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: কোকো গাছের জন্মস্থান হল দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিজ পাহাড়। কোকো খেত মধ্য আমেরিকার অধিবাসীরা। এই অঞ্চল থেকেই কোকোর চাষ ইউরোপ ও আফ্রিকায় এসেছে ষোড়শ শতাব্দীতে। এখন পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে বেশির ভাগ কোকো উৎপন্ন হয়। ইন্দোনেশিয়া ও সিংহলেও এসেছে বলে শুনেছি।

আমি বললুম: কোকোর গাছ কেমন?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: গাছ বেশ বড় হয়। কুড়ি থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট। ডালপালা পাখার মতো ছড়ানো। ফুল বেরোয় গাছের গুঁড়ি ও ডাল থেকে। গোলাপি রঙের ফুলের গোছা। পাঁচ বছর না হলে গাছে ফল হয় না। বাদামী রঙের ফল দুই ইঞ্চির সামান্য বেশি, তার মধ্যে কুড়ি থেকে চল্লিশটা বীজ থাকে। এর থেকেই কোকোমাস বা চকোলেট লিকার তৈরি হয়। কোকোবাটার থেকে তৈরি হয় ওষুধ ও প্রসাধনের দ্রব্য।

এক জায়গায় এসে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা একটা মস্ত ঝোপ দেখিয়ে বললেন: এই বারে আপনার আসল পরীক্ষা হবে।

পরীক্ষা দেবার জন্য আমি গাছের কাছে এগিয়ে গেলুম। ক্যানা ফুলের গাছের মতো ঝোপ, কিন্তু উচ্চতায় একজন মানুষকে ছাড়িয়ে

যাচ্ছে। পাতাগুলো সরু ও লম্বা। এক একটি পাতা এক থেকে তিন ফুট পর্যন্ত লম্বা এবং এমন ঘন সন্নিবিষ্ট যে বনের মতো মনে হচ্ছে। আল্‌গা শেকড় থেকে লম্বা ডাঁটা বেরিয়ে সাদা ও ধূসর-সবুজ রঙের ফুল ফুটেছে থোকায়। আমি শুনেছিলুম যে ছোট এলাচ হয় গাছের শেকড়ে মাটির বাইরে, কিন্তু ডাঁটায় এ রকম মঞ্জরী দেখি নি। তবু সাহসে ভর করে বললুম: এ তো ছোট এলাচের গাছ।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: ঠিক করে বলুন, এ গোলমরিচ নয় তো?

সেবারে পেরিয়ার স্যাঙ্কচুয়ারি যাবার পথে আমাদের ট্যাক্সির ড্রাইভার বলেছিল যে, গোলমরিচের গাছ লতার মতো, তার ডাল থেকে শেকড় বেরিয়ে অন্য গাছকে আঁকড়ে ধরে। পাতা মোটা ও ডিমের আকার, তারই ধার থেকে সাদা ফুল বেরিয়ে লাল রঙের গোল গোল ফল হয়। পথের এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সে এক টুকরো লতা ভেঙে এনেছিল। তা দেখেছিলুম বলে নিঃসন্দেহে বললুম: গোলমরিচের ঝোপ হয় না, হয় লতানে গাছ।

সাবাস বাঙালী দাদা। এ দেশে আপনাকে কেউ ঠকাতে পারবে না।

বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা পিছন ফিরলেন।

আমি বললুম: বড় এলাচের গাছ কী রকম হয় বলুন তো!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা চমকে উঠে বললেন: এবারে যে আমার পরীক্ষা নিতে শুরু করলেন!

জবাব দিন।

জানলে তো জবাব দেব।

বললুম: বড় এলাচ আমাদের দেশের গাছ। অর্থাৎ পূর্ব হিমালয়ের স্যাঁৎসেঁতে অঞ্চলে এই গাছ হয়—নেপাল সিকিম ও বাঙলার পাহাড়ে। গাছ তিন-চার ফুটের বেশি বড় হয় না। পাতা

এক থেকে দু ফুট লম্বা, চওড়ায় তিন-চার ইঞ্চি, রঙ সবুজ। ফুলের রঙ কিন্তু পীতাভ সাদা, থোকায় ফুল হয় বর্ষার আগে, ফল পাকে শরৎ কালে। ছোট এলাচের চেয়ে বড় এলাচের গুণ কিন্তু বেশি।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: হবে না কেন! বাঙালীরা চাষ করে যে!

হেসে বললুম: তাহলে একটা লবঙ্গের গাছ দেখান।

সরি! ও গাছ আমাদের বাগানে নেই।

তাহলে একটা দারচিনির গাছ।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: ভাবছেন যে আমরা গরম মশলার চাষ করি! তা নয়। তবে একটা কথা জেনে রাখুন। দারচিনি কোন গাছের ফুল বা ফল নয়, গাছের ছাল। তবে পাতার বোঁটা চিবোলে একটা মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যায়। ওটা লতা নয়, ঝোপও নয়, গাছ।

বলতে বলতেই ভদ্রলোক সামনের দিকে ফিরে এলেন। আমি দেখলুম যে কম্পাউণ্ডে অনেক জমি খালি পড়ে আছে। সামনের দিকেই বেশি জমি। মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: এত জমি খালি পড়ে আছে দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন তো! আগে এখানে ধানের চাষ হত। আমাদের সারা বছরের ধান হত এই জমিতে।

এখনও তো হতে পারে!

কিন্তু চাষ করবে কে?

মজুর রেখে চাষ করানো যায়!

পোষায় না তাতে। আগে মস্ত পরিবার ছিল। আর নিজেদের হাতে চাষবাস করার অসম্মান ছিল না কিছু। নিজের হাতের ধান বলে তার কদরও ছিল অনেক। ধান কাটার পরেই হত হুৎরি উৎসব—দেশের সবচেয়ে বড় উৎসব। নাচ গান চলত সাত দিন ধরে।

আমরা বারান্দার দিকে ফিরে আসছিলুম। মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: এইবারে আসুন, আপনাকে ভেতরটা দেখাই।

বলে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন।

দেখলুম, বাড়ির মাঝখানে চারকোণা উঠোনের মতো একটা মস্ত বড় ঘর, আর তার চারিধার ঘিরে ছোট ছোট ঘর। এক ধারে বাড়ির কর্তার ঘর, পরিবারের আর সবার ঘর আর এক ধারে। অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘর আর এক দিকে। ঠাকুর ঘরও আছে একটি, এই ঘরে একটি পিতলের বাতি আছে। চাঙ্গাপ্পা বললেন ঃ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় এই বাতি জ্বালতে হয় এখনও। এই ঘরকে আমরা কন্নিকোম্বরে বলি।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বোধহয় আরও কিছু দেখাতেন, কিন্তু তার সময় পেলেন না। বাহিরে গাড়ির হর্ণ শুনেই বেরিয়ে এলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করে বাহিরে এলুম।

মুক্তাউয়াই ফিরে এসেছেন। সঙ্গে যাঁকে এনেছেন, তিনিই যে তাঁর মামা তা বুঝতে আমার কষ্ট হল না। ভদ্রলোকের রাজস্থানী বেশ, মাথায় পাগড়ি। বয়স হয়েছে অনেক, কিন্তু প্রসন্ন মুখ। গাড়ি থেকে নেমেই চাঙ্গাপ্পাকে জড়িয়ে ধরলেন।

কষ্ট করে এত দূরে আসার জন্যে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তাঁকে বারে বারে ধন্যবাদ জানালেন। তারপরে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক আমার হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন ঃ বাঙ্গালী মহাশয়!

আমি মাথা নাড়তেই তিনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন হিন্দীতে। সমস্ত প্রশ্নই বাঙলার সম্বন্ধে। কোথায় থাকি, কী রকম জল হাওয়া, অধিবাসীরা কেমন—এই রকমের প্রশ্ন। বাঙলার সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ দেখে বললুম ঃ আপনি বুঝি বাঙলায় কখনও যান নি?

না। বড় শখ ছিল, কিন্তু সুযোগ হয় নি জীবনে।

আমি বললুম ঃ কলকাতায় আসা তো কোন কঠিন কাজ নয়! প্লেনে আসতে পারেন, ট্রেনেও আসতে পারেন। এবারে আসুন না আমার সঙ্গে!

ভদ্রলোক হেসে বললেন : আর কি সে বয়স আছে! যখন বয়স ছিল, তখন যেতে পারি নি!

মুক্তাউয়া এসে ধমক দিয়ে বললেন : গল্প করলেই কি পেট ভরবে মামু?

এসো এসো।

বলে মামাবাবু এগোলেন। মুক্তাউয়া আমাকেও তাঁর সঙ্গে ডাইনিং টেবলে টেনে আনলেন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পার ভাইকে টেবলে দেখতে না পেয়ে আমি বললুম : আপনার ভাইকে দেখছি না তো!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : দেখবেন কী করে! আর্মিতে চাকরি করে, ছুটি পাবে বৎসরান্তে। নিয়ম রক্ষার জন্যে বিশাখাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আর গল্প নয় বাঙালী দাদা, খেয়ে নিন তাড়াতাড়ি। আমাদের সেরিমোনিয়াল ড্রেস পরতে সময় লাগবে অনেকক্ষণ। তারপর—

বলে হাসতে লাগলেন।

বললুম : তারপর কী?

আপনাকে তৈরি হতেও তো সময় লাগবে! আমাদের সামাজিক কায়দা কানুন শেখাতে কিছু তালিমও দিতে হবে।

আমি সভয়ে বললুম : আমাকেও কি সেরিমোনিয়াল ড্রেস পরতে হবে নাকি?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা মুক্তাউয়ার দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন : ভেবে দেখি।

মুক্তাউয়ার মামা বললেন : এরা বড়ই নাছোড়বান্দা লোক। একবার যা করবে ভাবে তা করবেই, আপনার কোন ওজর আপত্তি শুনবে না। তার চেয়ে এদের হাতে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকা ভাল।

আমি বললুম : তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

বলে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে নিলুম। উঠে যাবার সময় মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেনঃ আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করুন বাঙালী দাদা, আমি আপনার পোশাক নিয়ে আসছি।

আমি করুণ ভাবে তাকালুম মামাবাবুর দিকে। তিনি সহাস্যে বললেনঃ উপায় তো নেই, পড়েছেন যবনের হাতে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম।

২২

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা কিছুতেই ছাড়লেন না, জোর করেই তাঁদের উৎসবের পোশাক আমাকে পরালেন। সাদা কাপড়ের চুড়িদার পাজামা আর পাঞ্জাবির মতো জামা, কিন্তু বেশি আঁট-সাঁট নয়। তার উপরে একটি কালো কাপড়ের হাফ হাতা চাপকান জাতের পোশাক, গলা ইংরেজী অক্ষর 'ভি' শেপের, আর তার ঝুল হাঁটু অবধি নেমেছে। একটি তৈরি পাগড়ি মাথায় পরিয়ে দিলেন, পাগড়িতে জরির ফিতে ক্রসের মতো বাঁধা। সবচেয়ে অস্বস্তিকর হল একটি খোলা দা, কোমরের বেল্টের সঙ্গে সেটি লটকে দিলেন পিছনে, তার ধারাল অংশটা রইল নিচের দিকে। এতক্ষণ মন্দ লাগছিল না। কিন্তু এইবারে, পিছনের এই খোলা দা মনটা খারাপ করে দিল।

কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পা প্রসন্ন মনে বললেন: বন্দুকের সম্বন্ধে কি যেন আপনি বলছিলেন! বন্দুক ছোঁবেন না বলে প্রতিজ্ঞা-ট্রতিজ্ঞা করেন নি তো?

ভয় পেয়ে আমি বললুম: এর উপরে আবার বন্দুক নিতে হবে নাকি?

মানাতো ভাল।

বলে মুক্তাউয়াকে তিনি ডেকে আনলেন।

মুক্তাউয়া আমার সাজ দেখে লাফিয়ে উঠে বললেন: কী সুন্দর মানিয়েছে বাঙালী দাদাকে!

কিন্তু আমি আমার গোঁফে হাত বুলিয়ে বললুম: কিন্তু এটা যে নেই!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: ওতে আটকাবে না, অনেকেই আজকাল কামিয়ে ফেলছে।

পিছনের খোলা দায়ের কথা আমি ভুলতে পারছিলুম না, তাই বেরোবার সময় মিনতি করে বললুম: শুধু এইটে যদি—

বলে পিছনে হাত দিলুম।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা ধমক দিয়ে বললেন: এইটে মানে?

করুণভাবে বললুম: বিয়ে বাড়িতে আত্মহত্যা করার ইচ্ছে নেই তো, তাই বলছিলুম—

মামাবাবু আমার দুর্দশা উপলব্ধি করে বললেন: ও বেচারা ওটা সামলাতে পারবে না, মুক্তা—

কিন্তু মুক্তাউয়াকে দেখতে পাওয়া গেল না। এতক্ষণ তিনি বিশাখার পাশেই ছিলেন। এইবারে তাঁকে ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। তাঁর হাতে একটা খাপে ঢাকা ছোরার মতো অস্ত্র। তিনি এসে আমার কোমর থেকে বিরাট দাখানা খুলে নিয়ে সেই ছোট খাপে-ঢাকা দাটি আমার সামনের দিকে বেল্টে গুঁজে দিলেন। তারপর হেসে বললেন: এখন আর ভয় করছে না তো বাঙালী দাদা?

খাপের উপরে হাত বুলিয়ে বললুম: এ খুব ভালো জিনিস।

খুশী হয়ে মুক্তাউয়া আমার আগের খোলা দা ঘরের ভিতরে রেখে এলেন। তারপর আমরা বিয়ে বাড়ি যাত্রা করলুম।

না। এবারে আর শহরের দিকে নয়, আমরা উল্টো দিকেই এগোলুম। বাঁধানো সড়ক। আর কিছু দূরে দূরে এক একটা বাড়ি অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সদর রাস্তা থেকে হয় উপরে পাহাড়ের দিকে উঠে বাড়ির গেট, নয় নিচে নেমে যেতে হয় খানিকটা। এমনি একটি বাড়িতে আমরা ঢুকে পড়লুম।

বিয়ে বাড়িতে পৌঁছে আমার বিপদের অন্ত রইল না। প্রথমেই

এক ঘড়া জল। জুতো মোজা খুলে সেই ঘড়ার জলে হাত-পা ধুতে হবে। কিন্তু তার চেয়েও প্রাণান্তকর ব্যাপার হল সবার সঙ্গে আলাপ। আমার পোশাক দেখে সবাই ধরে নিয়েছিলেন যে আমি এই দেশেরই মানুষ। তাই নিজেদের ভাষায় আপ্যায়ন করতে লাগলেন আমাকে। কারও কোন কথা আমি বুঝতে পারছিলুম না, আর কারও কোন প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারছিলুম না। মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমার দুর্দশা খুবই উপভোগ করছিলেন।

এইবারে মামাবাবুর দিকে চোখ পড়তেই আমার ভারি হিংসে হল। তাঁর গায়ে ব্রোকেডের আচকান, মাথায় রাজস্থানী টুপি। তাঁর খাতির হচ্ছিল পোশাক দেখেই। সবাই তাঁকে রাও সাহেব বলে সম্বোধন করে ইংরেজীতে কথা বলছিলেন। আর যাঁরা হিন্দী জানেন, তাঁরা হিন্দীতে। আমার মনে হল যে নিজের স্যুট পরে গলায় একটা টাই বেঁধে এলে আমিও বোধহয় মামাবাবুর মতো সম্মান পেতুম এই বিয়ে বাড়িতে।

অসম্ভব রাগ হচ্ছিল মিস্টার চাঙ্গাপ্পার উপরে। ইচ্ছে হচ্ছিল যে কোমরের ছোট দাটা কাজে লাগিয়ে দিই, তার পরে যা হবার তা হবে। কিন্তু সে সুযোগও পাচ্ছিলুম না। রাও সাহেবকে এখানে অনেকেই চেনেন, কিন্তু আমাকে চেনেন না কেউ। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে কেউ আমার পরিচয় জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। করে থাকলেও আমি তা বুঝতে না পেরে বোকার মতো শুধু হেসেছি তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে।

হঠাৎ একটি মেয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরে বললেন: ও বাঙালী দাদা, তুমি এখানে! সেই থেকে আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি যে!

বলে আমাকে সবার মাঝখান থেকে টেনে আনলেন। এই মুহূর্তে মুক্তাউয়াকে আমার এত ভাল লাগল যে আমি যেন এতক্ষণ তাঁরই অপেক্ষায় ছিলুম। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে মুক্তাকে,

ভারি মিষ্টি মনে হচ্ছে। সাধারণ শাড়ি পরে হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে আমি তাঁকে মার্কারায় আসতে দেখেছিলুম। এখন তাঁকে কুর্গী মেয়ের বেশে দেখছি। পুরো হাতের রঙীন সিল্কের জামা পরেছেন, আর ঝকঝকে পাড়ের কাঞ্জীভরম শাড়ি পরেছেন একেবারে ভিন্ন ধরনে। সামনে কোঁচা নেই, তার বদলে শাড়িটা জড়িয়েছেন দুবার, আর জরির পাড়টা ঠিক বুকের উপর দিয়ে গেছে দুটো হাতেরই তলা দিয়ে। ডান হাতের উপর দিয়ে শাড়ির খানিকটা এসেছে সামনের দিকে, পিছনে বাঁধা আছে কেমন করে তা দেখতে পাচ্ছি না। মাথার চুল ঢেকেছেন একখানা ওড়নায়।

মুক্তাউয়া তখনও আমার হাত ধরে ছিলেন। আর আমি এইবারে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর হাতের দিকে তাকালুম। তাঁর চার আঙুলে চারটি আংটি সরু চেন দিয়ে হাতের কঙ্কনের সঙ্গে এক জায়গায় বাঁধা আছে। গলায় একখানা সরু মালা, অর্ধচন্দ্রের মতো তার লকেট বুকের উপরে দুলছে। চোখ নামিয়ে নিতেই তাঁর দু পা দেখতে পেলুম। খালি পায়েও একটি অলঙ্কার—পাঁচ আঙুলের পাঁচটি আংটি হাতের মতোই চেন দিয়ে গোড়ালির সঙ্গে বাঁধা। শাড়ির নিচে পায়ের অলঙ্কারটি দেখা যাচ্ছে না।

মুক্তাউয়া সহাস্যে বললেন: অমন হাঁ করে কী দেখছ বাঙালী দাদা?

মিথ্যে কথা আমি বলতে পারলুম না, বললুম সত্য কথাই: দেখছি তোমাকে।

ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে মুক্তাউয়া বললেন: লোকে নিন্দে করবে যে!

বলেই আমার হাত ছেড়ে দিলেন।

আমি নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ পেয়ে বললুম: এইবারে কী হুকুম বল।

এসো, আমার বাবার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।

বললুম : সবার আগে সেটাই দরকার।

কিন্তু এ সব ভদ্রতা এখানে দেখবে না। সবাই এখানে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত।

মুক্তাউয়া যে মিস্টার চাঙ্গাপ্পার সম্বন্ধে এই কথা বললেন তা আমি বুঝতে পেরেছি। তাই প্রতিবাদ করে বললুম : তা নয়। আমার ওপরে বেশ কড়া নজর রেখেছেন।

তবে এরকম করে ছেড়ে দিয়েছে কেন?

সবার কাছে অপদস্থ হচ্ছি দেখে আনন্দ পাবার জন্যে।

সত্যিই এরা এই রকমেরই অভদ্র।

বলে মুক্তাউয়া আমাকে বাড়ির ভিতরে টেনে নিয়ে গেলেন। এতক্ষণ আমি বাড়ির সামনে চাঁদোয়ার নিচে ছিলুম। এরই নাম বোধহয় কল্যাণ মণ্ডপ। এখান থেকে সাদা কাপড় টাঙানো ছিল বাড়ির দরজা পর্যন্ত। কিছু লোকজন নিয়ে অরুভা এই সবের তদারকি করছিলেন। অরুভা বোধহয় পুরোহিতকে বলে। অন্তত তাঁর চেহারা ও হাবভাব দেখে আমার এই কথাই মনে হয়েছিল। সামনের বারান্দায় বসে ছিলেন মুক্তাউয়ার বাবা, অত্যন্ত শক্ত সমর্থ চেহারার এক ভদ্রলোক। আমার মতোই তাঁর পোশাক। মুক্তাউয়ার সঙ্গে আমাকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : আপনি বাঙলার লোক!

গুরুজনদের প্রণাম করার কায়দা আমি শিখে ফেলেছিলুম। তাই এদের মতোই তিনবার ঝুঁকে আমি তাঁকে প্রণাম করে বললুম : আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোক এক হাতে একখানা চেয়ার আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন : ছোট থেকেই মুক্তার বাঙালীর সম্বন্ধে ভারি কৌতূহল।

সত্যি!

ভদ্রলোক মুক্তাউয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন : বলব সেই গল্প?

না না।

বলে মুক্তাউয়া যেন আর্তনাদ করে উঠলেন। আর আমি তাই দেখে হেসে বললুম : বলবেন না তাহলে।

সে এমন কিছু নয়!

ভদ্রলোক এই কথা বলতেই মুক্তাউয়া এক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর বাবা এইবারে গল্পটা আমাকে শোনাবেন। অনেক কৌতূহল নিয়ে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক বললেন : ছেলেবেলায় মুক্তা একবার আমার সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিল। আমি তখন ফোর্ট উইলিয়ামে পোস্টেড্ ছিলাম। আমাদের সঙ্গে বাঙলা থিয়েটার দেখতে গিয়ে জেদ ধরেছিল যে সে বাঙালী ছেলে বিয়ে করবে।

কেন?

বাঙালীরা নাকি ভাল গান গায়, মিষ্টি কথা বলে, আরও সব কত কি তা এখন আর মনে নেই।

আমি বললুম : ছেলেবেলায় অনেকেই অনেক রকম আবদার করে, তারপর বড় হয়ে সব ভুলে যায়।

ভদ্রলোক বললেন : ভুলে গেলে তো কোন ভাবনা ছিল না। এ ধারণা তার মনে এমন বদ্ধমূল হয়েছিল যে আমরা—

বলে তিনি থামতেই আমি বললুম : ভয় পেয়েছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, ভয়ই বলতে পারেন। এ সব ব্যাপারে—

কিন্তু কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না। অনেকেই এই সময়ে বারান্দায় উঠে এলেন। একজন তাঁদের ভাষায় কী বললেন তা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন : তেরানা মঙ্গল দেখবেন তো এঁদের সঙ্গে ভেতরে চলে যান।

বলে তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন।

সহসা বাও সাহেবকে দেখতে পেয়ে আমি যেন বেঁচে গেলুম। তাঁর পাশে গিয়ে বললুম : তেরানা মঙ্গল কী?

রাও সাহেব বললেন: বিয়েরই একটা অনুষ্ঠান। চলুন না, নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন।

সবার সঙ্গে আমরা বাড়ির মাঝের বড় ঘরে গিয়ে পৌঁছলুম। এই ঘরের নাম নাকি নেল্লক্কি নাত্বড়ে। দেওয়ালের গায়ে একটা সুন্দর প্রদীপ জ্বলছিল। বরের স্নান হয়ে গেছে, এইবারে বর আসবে এই ঘরে। তারই জন্যে সবার অপেক্ষা। রাও সাহেব আমাকে বললেন: বিয়ের আগের দিনটাকে এরা করিক মুরিপা বলে। ছাপ্পারা-ও বলে অনেকে। ঘরে জায়গা কম হলে এই সব অনুষ্ঠান আজকাল বাইরের কল্যাণ মণ্ডপে হয়।

তারপরেই প্রশ্ন করলেন: কাল আপনাকে দেখি নি তো!

বললুম: আমরা আজ সকালে এসে পৌঁছেছি।

ও হ্যাঁ, মুক্তার কাছে তো তাই শুনলাম। ওরা আপনাকে উটি থেকে ধরে এনেছে!

আমি প্রশ্ন করলুম: কালও কোন অনুষ্ঠান ছিল না কি?

রাও সাহেব বললেন: কালকের অনুষ্ঠান ছিল কনের বাড়িতে। কাল আমরা এ পক্ষের অরুভাকে নিয়ে কনের বাড়ি গিয়েছিলাম মুহূর্তের দিনক্ষণ ঠিক করতে। আসলে এ সব ঠিকই ছিল, তবু পুরনো প্রথা তো মানতে হবে।

কী হল?

এই প্রথার নাম মঙ্গল কুরিপা। এদের কথাবার্তা তো আমি বুঝতে পারি নে, শুধু এইটুকুই বুঝলাম যে জলযোগের পর এক গণৎকার বিয়ের দিন ক্ষণ বার করলেন, তারপর একখানা নিমন্ত্রণ পত্র লিখে ফেললেন। তার ওপর সই করতে হল দুপক্ষকেই। একটা ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমরা বরপক্ষ দাঁড়িয়েছিলাম প্রদীপের এক ধারে, আর অন্য ধারে কন্যাপক্ষ। মাঝখান থেকে অরুভা এক-একটা প্রশ্ন করছিলেন, আর উত্তর দিচ্ছিলেন এক এক পক্ষ। প্রশ্নগুলো কী আর তার জবাবই বা কী, তার বিন্দুবিসর্গও

আমি বুঝতে পারি নি।

কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি?

পরে মুক্তা আমাকে বলেছিল যে কথাবার্তা বলেছিলেন দুপক্ষের অরুভা। অন্য কেউ কোন কথাবার্তা বলে নি। উপস্থিত সবাই ছিলেন শ্রোতা।

কী বলেছিলেন অরুভারা?

বরপক্ষের অরুভা বললেন, অমুকের সঙ্গে অমুকের বিয়ের দিন ক্ষণ পাকা করতে আমরা এসেছি, তোমরা ব্যবস্থা কর। আর কনে-পক্ষের অরুভা বললেন, অমুকের সঙ্গে অমুকের বিয়ে যখন ঠিক হয়েই গেছে তখন বরপক্ষ যদি তাদের আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে মুহূর্ত পালন করে, তবে আমাদের দম্পতি মুহূর্তের ব্যবস্থা করতে কোন আপত্তি নেই। এই ধরনের সব কথাবার্তা।

তারপর?

বরপক্ষের অরুভা কিংবা আর কেউ একটি হীরে বা ঐ ধরনের কোন পাথর কনেপক্ষের অরুভার হাতে দিয়ে দিল। তারপর খাওয়াদাওয়া করে বিদায় নিয়েছিলাম আমরা।

আমি বললুম: তার মানে এ আমাদের পাকা দেখার মতো ব্যাপার। আমাদেরও অনেক সমাজে লগ্ন পত্র লেখা হয়।

কিন্তু এর বেশি কিছু বলবার সময় আর পেলুম না। বর এসে ঘরে ঢুকল। পুরো হাতের সাদা জামা পরেছে লম্বা ঝুলের, আর মাথায় বেঁধেছে লাল রুমালের পট্টি। প্রথমে দেওয়ালের প্রদীপটাকে প্রণাম করে উপস্থিত গুরুজনদের তিনবার করে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিল। তারপরে দেওয়ালের প্রদীপের নিচে একখানা মাছুরের উপরে বসল। বরের পিছনে এসেছিল অনেকগুলি মেয়ে। তাদের মধ্যে তিনজন বরের হাতে পায়ে কী একটা মাখাতে বসল। আর তারই সঙ্গে গান গাইতে লাগল মেয়েরা।

রাও সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : বরের হাতে পায়ে ও কী মাখাচ্ছে মেয়েরা ?

রাও সাহেব বললেন : মেয়েরা নয়, ওদের সুমঙ্গলী বল, সধবা মেয়ে। যা মাখাচ্ছে, তাকেই এরা তেরানা বলে। তেরানা কী জিজ্ঞেস করলে হেন্না বলবে। ও কথাটাও আমরা বুঝি না।

বললুম : এ তো মেহেদির মতো কোন পাতার রঙীন রস!

সেই রকমই কিছু হবে।

বললুম : আমাদের বর কনের গায়ে হলুদ মাখানো হয় স্নানের আগে। কিন্তু এ রকম গান হয় না।

রাও সাহেব বললেন : এ তো গান নয়, এ হল মঙ্গল পাঠ।

অনেক সময় ধরে এই পাঠ হল। রাও সাহেব ঠিকই বলেছেন, এদের ভাষার বিন্দুবিসর্গও আমরা বুঝতে পারি না। পরে জেনেছিলুম যে গানের গোড়ার দিকটা দেশের ও নিজের গ্রামের প্রশস্তি। সেই গ্রামেই অমুকের সঙ্গে অমুকের বিয়ে হচ্ছে। তারপরে এক যুবকের বিয়ের কাহিনী, কেমন করে সে তার কনে খুঁজে এসে বাড়িতে বলেছিল, আর সেই বিয়ে হয়েছিল ঘটা করে।

গান শেষ হবার পর আমাদের খাবার ডাক পড়ল। ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা। কিন্তু কন্যাপক্ষের কেউ এখানে উপস্থিত নেই। শুনলুম যে তাদের বাড়িতেও এই রকম অনুষ্ঠান হচ্ছে একই সময়ে তাদের আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসীদের নিয়ে। আহারের পরে আমরা মাঝের ঘরে গিয়ে দক্ষিণাও পেলুম—পান সুপুরি কলা খৈ আর নারকেলের টুকরো। তারপর মিস্টার চাঙ্গাপ্পার গাড়িতে ফিরে এলুম।

২৩

বাড়িতে এসে রাও সাহেব জিজ্ঞাসা করলেনঃ আজ আর আমাকে বেরোতে হবে না তো ?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেনঃ এখন আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করতে পারেন।

রাও সাহেব বললেনঃ সেই ভাল। বয়স হয়েছে তো, শরীরটা বিশ্রাম চায় বেশি। তাতে রাজী না হলেই গোলমাল শুরু করে। তাহলে বিকেলে আবার দেখা হবে।

বলে তিনি বিদায় নিলেন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেনঃ আপনি কী করবেন বাঙালী দাদা ?

আমি তাড়াতাড়ি বললুমঃ আমার জন্যে কোন ভাবনা করতে হবে না।

কেন ?

আমার সময় কেটে যাবে।

ছুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেস আছে বুঝি ?

ধ্যান করার অভ্যেস আছে।

মানে ?

বসে বসে ভাবতে পারি আকাশ পাতাল।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেনঃ বুঝেছি।

তারপরেই সেই মোটা গাইড বইটা এনে আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেনঃ মুক্তা যখন আমার জারিজুরি ফাঁস করেই দিয়েছে, তখন এটা নিয়েই কিছু সময় কাটিয়ে দিন। কয়েকটা ইণ্টারেস্টিং চ্যাপ্টার আছে। খানিকটা সময় বেশ কেটে যাবে।

বললুমঃ অনেক ধন্যবাদ।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : ধন্যবাদ দিয়ে ভাল করলেন না।

কেন ?

একটু পরেই তা বুঝতে পারবেন।

তারপর বেরিয়ে যাবার আগে দয়াপরবশ হয়ে বললেন : বাড়িতে বিশাখা নেই, মুক্তাও নেই। আমিও বেরিয়ে যাচ্ছি। তেষ্টা পেলে নিজেই ব্যবস্থা করতে হবে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেন : একটা কাজ করতে পারেন। আপনি ধ্যানের কথা বললেন না! বসে বসে মুক্তার ধ্যান করুন। সে এসে পড়লে আপনার আর কোন দুঃখ থাকবে না।

মিস্টার সোমান্নার কথা আমার মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলুম : মিস্টার সোমান্নাকে দেখলুম না কেন ?

তিনি হলেন বরের মাসি, কনের পিসি। এ বেলা বোধহয় কন্যা-পক্ষে যোগ দিয়েছেন। ও বেলায় দেখা হতে পারে। তাঁকে দরকার আছে ?

বললুম : দরকার আবার কিসের !

উহুঁ, দরকার তো আছেই। কর্নেল সাহেবের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। তুনিয়ার সমস্ত বনের কথা আপনি তাঁর কাছেই জানতে পারবেন।

সর্বনাশ ! তুনিয়ার বনের কথা জেনে আমি কী করব !

কেন ! কখন কোথায় কী কাজে লাগবে তা কি বলা যায় ! হয়তো এই অরণ্যের কথাই আপনাকে একদিন বিখ্যাত করে দেবে।

বলে বেরিয়ে গেলেন।

আমার পরিচয় এঁরা জানেন না। তাই বলতে পারলেন না যে একদিন এই অরণ্য নিয়েই হয়তো একখানা বই লিখে ফেলতে পারবেন। স্বাতি সঙ্গে থাকলে সে এই কথাই বলত। কিংবা তামাসা করে বলত, অরণ্যের কথাই বা বাদ যায় কেন, ওটাও কাজে লাগিয়ে দিও।

আমি আর দেরি করলুম না। বইখানা খুলে দেখলুম। এ একখানা ভারত ভ্রমণের গাইড বই। এ রকমের একখানা বই সঙ্গে থাকলে পথে সারা ভারত ঘুরে বেড়ানো যায়। একখানা বড় ম্যাপে রুট নম্বর দেওয়া আছে, আর সেই রুটের বর্ণনা আছে পরবর্তী পাতার ভিতরে। সেক্সনাল স্কেচ ম্যাপও আছে এবং দেশের প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য স্থানের বিবরণ আছে গেজেটিয়ার অংশে। ওয়াইল্ড্ লাইফ নামেও একটি পরিচ্ছেদ আছে। তার প্রথম অংশে ন্যাশনাল পার্ক ও পরে অন্যান্য অভয়ারণ্যের কথা। এই বিবরণ পড়েই মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমাকে অনেক কিছু শুনিয়েছিলেন।

মহাভারতের খাণ্ডব বনের কথা আমার মনে পড়ে গেল। শ্বেতকি রাজার যজ্ঞে বারো বছর ঘৃতপান করে অগ্নির অরুচি রোগ হয়েছিল। ব্রহ্মা তাঁকে খাণ্ডব বন দগ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু অগ্নি তা দগ্ধ করতে গেলে শত সহস্র হাতি ও বহুশীর্ষ নাগেরা জলসেচ করে সেই অগ্নি নির্বাপিত করে। পরে কৃষ্ণ ও অর্জুনের সহায়তায় সেই খাণ্ডব বন দগ্ধ হয়। দেবগণের সঙ্গে ইন্দ্র তা রক্ষা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন। অরণ্যের সমস্ত বৃক্ষ ও প্রাণী সেদিন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অথচ তার আগেই আমরা দেখতে পাই যে কৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁদের সুহৃৎ ও নারীদের নিয়ে সেখানে এসেছিলেন যমুনায় জল বিহারের জন্য। প্রথমে যমুনার তীরে বহু প্রাণী সমাকুল মনোহর খাণ্ডব বন দেখেছিলেন, তারপর বিহার স্থানে গিয়ে পান ভোজন নৃত্য গীত ও বিবিধ ক্রীড়া করে সেখানেই বিশ্রাম ও নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন।

এই কাহিনী থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সেকালে অরণ্য ও বন্য প্রাণী রক্ষার কোন নীতি বা আইন ছিল না। ঐতিহাসিক প্রমাণে এই রকমের আইন বিশ্বে প্রথম প্রচার করেছিলেন ভারতের হিন্দু সম্রাট অশোক। তিনি তাঁর অনুশাসন প্রস্তর-স্তম্ভে উৎকীর্ণ করে দেশের ছটি জায়গায় স্থাপন করেছিলেন। এই অনুশাসনের

দ্বিতীয় ও পঞ্চম বিষয় ছিল অরণ্য ও বন্য প্রাণীর সম্বন্ধে। অকারণে অরণ্যে অগ্নি সংযোগ করা যাবে না এবং বা পশুপাখি হত্যার ব্যাপারেও নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে।

ঐতিহাসিকরা বলেন যে এই নির্দেশ অশোক বৌদ্ধ ধর্মে পান নি, এ তাঁর নিজের শিক্ষার কথা। তাঁর পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য, যিনি কৌটিল্য নামেও পরিচিত ছিলেন, তাঁরই রচিত অর্থশাস্ত্রে অরণ্য বিষয়ক মূল্যবান মন্ত্রণা ছিল। চাণক্য দেশের অরণ্যকে তিন ভাবে ভাগ করেছিলেন—রাজার জন্য নির্দিষ্ট অরণ্য, বনবাসী তপস্বীদের অরণ্য এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য অরণ্য। শেষোক্ত অরণ্যেই শিকারের অধিকার ছিল জনসাধারণের এবং রাজা তাঁর নিজের অরণ্যে মৃগয়ায় যেতেন।

চন্দ্রগুপ্তের কাল ছিল যীশু খ্রীষ্টের জন্মেরও তিন-চার শতাব্দী পূর্বে। চাণক্য তাঁর গ্রন্থ অর্থশাস্ত্রে অরণ্য ও বন্য প্রাণী রক্ষার প্রয়োজন ও নিয়ন্ত্রণের কথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। মৃগয়ার নিয়ম কানুন এবং প্রাণীহত্যার জন্য শাস্তির কথাও তিনি আলোচনা করেছিলেন। আজ আমরা যে অভয়ারণ্যের কথা বলি তার উল্লেখ ছিল তাঁরই গ্রন্থে। বন্য প্রাণী সংরক্ষণের নীতির উপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন। বনবিভাগের অধিকর্তা নিয়োগের কথা ছিল তাঁরই লেখায়, বন্য প্রাণী গণনার পদ্ধতিও ছিল। যে সমস্ত প্রাণীর কথা তিনি বলেছিলেন তার মধ্যে আছে বাঘ নেকড়ে বা চিতা হাতি গণ্ডার সিংহ গৌর ইয়াক বুনো মোষ হরিণ কুমীর ও ইগুয়ানা নামের এক অপরিচিত জন্তু। কতগুলি পশুপাখি ও মাছের প্রজাতি রক্ষার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনের কথা তিনিই প্রথম বলেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত এই বিষয়ে কোন আইনের প্রচলন করেছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু অনুমান করা যায় যে চাণক্যের এই মন্ত্রণা তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। তাঁরই প্রচলিত কোন আইন তাঁর পৌত্র

অশোক শিলাস্তম্ভে উৎকীর্ণ করে তাঁর সাম্রাজ্যের নানা স্থানে প্রচার করেছিলেন। আজ আমরা নিঃসন্দেহে দাবী করতে পারি যে অরণ্য ও বন্য প্রাণী রক্ষার প্রয়োজনের কথা বিশ্বের মানুষকে প্রথম শুনিয়েছে ভারত।

আরও একটি কথা আমার মনকে নাড়া দিয়েছে মাঝে মাঝে। বনের পশু কি হিংস্র, না মানুষ তাদের হিংস্র করেছে! এ রকম কথা ভাববার একটি অকাট্য যুক্তি আছে আমার কাছে। সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকেই সব রকমের বন্য প্রাণী আছে অরণ্যে, কিন্তু পুরাকালের মুনি ঋষি ও তপস্বীরা নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে তপস্যা করতেন গভীর অরণ্যে ও পর্বত কন্দরে। মহাভারতের কালে গোমতী নদীর নিকটবর্তী নৈমিষারণ্য ছিল ঋষিদের বাসের জন্য পবিত্র স্থান। মহর্ষি মৈনিক এই বনে বাস করতেন এবং এঁর দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞে ভারতের সমস্ত ঋষি ও ব্রাহ্মণেরা একত্র হতেন পুরাণ পাঠ শ্রবণের জন্য। লোম-হর্ষণ ও উগ্রশ্রবা এই বনেই সমগ্র মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ পাঠ করেছিলেন সমবেত ঋষি ও ব্রাহ্মণদের সামনে। হিংস্র জন্তুর হাতে কারও প্রাণহানি হয়েছে বলে শোনা যায় না। উগ্রশ্রবার মৃত্যু হয়েছিল বলরামের হাতে। আজ আমরা যে সব অরণ্যে প্রবেশ করতে বন্দুক হাতেও ভয়ে কণ্টকিত হই, সেই সব অরণ্য অতিক্রম করতে বা আশ্রম নির্মাণ করে বসবাস করতে সেকালের মানুষ কুণ্ঠিত হত না। আমাদের বেদ পুরাণে বা রামায়ণ মহাভারতে কোন অরণ্যকে ভয়াবহ বলা হয় নি, বন্য প্রাণীর হাতে মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এমন কাহিনীরও বর্ণনা নেই। প্রসেনজিৎ মৃগয়ায় গিয়ে এক সিংহের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। কিন্তু এই মৃত্যুর একটা কারণ নির্দেশ করা হয়েছে। প্রসেনজিৎ অশুচি অবস্থায় ধারণ করেছিলেন সূর্যের দেওয়া স্যমন্তক মণি। এই মণি ধারণেরই অমোঘ নিয়মে তাঁর মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। অর্থাৎ এই কাহিনীতে সিংহের হিংস্রতা প্রকাশ পায় নি। মৃত্যুর কারণ

সেই স্যমন্তক মণি। এই মণির লোভেই ঋক্ষরাজ জাম্ববান সিংহকে বধ করেছিলেন।

বন্যপ্রাণী কবে থেকে হিংস্র হল সে ইতিহাস আমার জানা নেই। তবে আমার মন, কেন জানি না, মানুষকেই দায়ী করে। বনের সিংহ প্রসেনজিৎকে হত্যা করেছিল ঠিকই। প্রসেনজিৎ শিকারে গিয়ে সেই সিংহকে মারবার চেষ্টা করেছিলেন কিনা জানা নেই। এই ঘটনার কোন সাক্ষী ছিল না। প্রসেনজিতের মৃতদেহ ও সিংহের পদচিহ্ন দেখে কৃষ্ণ এই অনুমান করেছিলেন। এই ঘটনা ঘটেছিল দ্বারকার নিকটে। যাদবরা তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন দ্বারকা বা কুশস্থলীতে। সেকালের রৈবতক পাহাড় বর্তমানে গির্ণার নামে পরিচিত। বর্তমান কালে শুধু এই অঞ্চলের গির ফরেস্টেই সিংহের বাস।

জাম্ববান একটি সিংহ বধ করেছিলেন মণির লোভে। তারপর কে এই দেশের কত সিংহ মেরেছে তার হিসেব নেই। সাম্প্রতিক কালের কথা আমরা জানি। ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের সময়ে একজন আর্মি অফিসার এদেশের তিনশোটি সিংহ মেরেছিল, এর মধ্যে পঞ্চাশটি ছিল দিল্লীর নিকটে কোন অরণ্যে। বৃটিশ ক্যাভালরির একজন কর্ণেল কাথিয়াবাড়ে আশিটা সিংহ মেরেছিলেন, আর দশ দিনে গির ফরেস্টে মেরেছিলেন চোদ্দটা সিংহ। এইভাবে কে কত সিংহ মেরেছিলেন তার সঠিক হিসেব তো নেই। তবে দেখা যাচ্ছে যে দিল্লীর কাছাকাছি এখন আর সিংহ নেই এবং ভারতের একমাত্র অরণ্য গির ফরেস্টে এখন সিংহের সংখ্যা দুশোরও কম। ১৯৭৫ সালের গণনায় একশো আশিটি সিংহ পাওয়া গেছে। ১৯৬৮ সাল থেকে সিংহ আমাদের জাতীয় পশু বলে স্বীকৃত হয়েছে। এই পশু সংরক্ষণের জন্য গুজরাতের আটশো পঁয়তাল্লিশটি মালধারী পরিবারকে গির ফরেস্ট এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা তাদের গবাদি পশু রক্ষার জন্য সিংহ মারত। সিংহ বেরাল জাতের [illegible]

ভোজী পশু। সবচেয়ে শক্তিশালী বলে নাম পশুরাজ। সাধারণত আটাশ বছর বাঁচে, চিড়িয়াখানায় তার আয়ু বছর কয়েক বেশি। ওজন একশো আশি থেকে দুশোপঁচিশ কিলোগ্রাম। মানুষ খেয়ে সিংহ মানুষের সংখ্যা কমাতে পারে নি, কিন্তু মানুষ সিংহ মেরে তার বংশ প্রায় শেষ করে এনেছে। আইন করে এখন সিংহের বংশরক্ষা করা হচ্ছে। এখন মহারাষ্ট্রের বরিভ্‌লির ন্যাশনাল পার্কে পাঁচটি সিংহ রাখা হয়েছে সফরি পার্কের মধ্যে। কাঁচের মিনিবাসে বসে এই সিংহ দেখা যায়। এর আগে পাঁচটি সিংহ এনে রাখা হয়েছিল হায়দ্রাবাদের নেহরু জুলজিকাল পার্কে। ম্যাড্রাসে, ব্যাঙ্গালোরের নিকট বান্নের-ঘাট্টায় ও চণ্ডীগড়ের নিকটে বীর ঘাট ফরেস্টেও সিংহ রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে।

গণ্ডার নিরামিষাশী হয়েও মানুষের হাতে পরিত্রাণ পায় না। দিনে তার খাদ্য প্রায় একশো কেজি ঘাস পাতা। তার ওজনও কম নয়। আফ্রিকার একটা গণ্ডারের ওজন দুই থেকে চার টন, মানে পঞ্চাশ থেকে একশো মণ। প্রাণী হিংসা তার স্বভাব নয়। তবু তাদের নির্দয় ভাবে বধ করা হত। একশো বছর আগে চা বাগানের এক সাহেব এক দিনে একশোটা গুলি ছুঁড়ে পাঁচটা গণ্ডার মেরেছিলেন আর আহত করেছিলেন পঁচিশটাকে। কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র-নারায়ণ দুশো আটটা গণ্ডার শিকার করেছিলেন ছত্রিশ বছরে। নেপালের মহারাজা ও রাণারাও কম করে দুশো গণ্ডার শিকার করেছেন। এইভাবে এক খাঁড়ার ভারতীয় গণ্ডারও এখন কমে এসেছে। ১৯৭৩ সালে লোকসভায় যে হিসেব দেওয়া হয়েছিল তার থেকে জানা যায় যে গত কুড়ি বছরে আসামে এই সংখ্যা বেড়ে সাড়ে তিনশো থেকে সাতশো পাঁচে পৌঁছেছে; কিন্তু বাঙলায় তা এক বছরে কমে আশি থেকে বাহান্ন হয়েছে। ১৯৬৩ সালে নেপালে ছিল তিনশো গণ্ডার।

আর একটি নিরামিষভোজী জীব হাতির অবস্থাও কিছু ভাল

নয়। তার ওজন পাঁচ টনের মতো, দৈনিক খাদ্য সোয়া দুশো কেজি। মানুষের মতো তার আয়ু। বছর কয়েক আগ বাঙলার নটা হাতিকে 'রোগ' বলে ঘোষণা করা হয়। সেই পাগলা হাতি মারবার হুকুম পেয়ে সাতটিকে গুলি করে মারা হয়। দেখা যায় যে তার মধ্যে দুটি নিতান্তই নিরীহ ছিল। শিকারীরাই কোন সময়ে তাদের পা জখম করেছিল বলে তারা কষ্ট পাচ্ছিল। এ কথা জানবার পর আর দুটিকে মেরে ফেলা হয় নি।

বাঘের কথা বলছি সকলের শেষে। শৈশব থেকেই আমাদের মনে বাঘের নামে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বাঘ মানেই একটা ভীষণ হিংস্র জন্তু। সন্ধ্যে বেলায় ফেউ ডাকলেই সবাই বলত, বাঘ বেরিয়েছে। গরমের সময় বাঘ নদীতে জল খেতে আসত, তার পায়ের আবার চিহ্ন দেখা যেত সকাল বেলায়। কারও গোয়াল থেকে গরু বাছুর ধরে নিয়ে গেছে, কোন বাড়ির মানুষ অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছে। বাঘ বেরিয়েছে খবর পেলেই শিকারীরা বেরোত বাঘ শিকারে, সে বাঘ মারতেই হবে। বাঘ না মারা পর্যন্ত কারও চোখে ঘুম নেই, শান্তি নেই কারও মনে। ছেলেবেলায় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের গল্প শুনেছি। ১৮৭১ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে তিনি বাঘ মেরেছিলেন কম করেও তিনশো সত্তরটা, চারশো তিরিশটা বুনো মোষ, আর তিনশো চব্বিশটা বড়াসিঙ্গা হরিণ মেরেছিলেন। তাঁর দুশো আটটা গণ্ডার মারার কথা আগেই বলেছি। শুধু কুচবিহারের মহারাজা কেন, অন্যান্য রাজা মহারাজাদেরও এই রকম শিকারী নাম ছিল। ১৯৬৫ সালের একটা হিসাবে দেখা গেছে যে বাঘ শিকারের তালিকায় সরগুজার মহারাজার নাম সবার উপরে। তিনি মেরেছেন এগারোশো পঞ্চাশটা বাঘ, তার পরেই উদয়পুরের মহারাজা ফতে সিং ও কর্নেল কেসরি সিং-এর নাম। তাঁরা মেরেছিলেন এক এক হাজার বাঘ। গোয়ালিয়রের মহারাজা মাধো রাও সিন্ধিয়া আটশো, রেওয়ার মহারাজা গুলাব সিং ছশো ষোলটা

এবং ভিজিয়ানাগ্রামের রাজকুমার তিনশো তেইশটা। বাঘ শিকারে নেপালের রাজারাও পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁদের একজন সাড়ে পাঁচশো বাঘ মেরেছিলেন, আর একজন রাণা মেরেছিলেন চারশো তেত্রিশটা। তিনি তিন সপ্তাহের শিকারে বেরিয়ে একচল্লিশটা বাঘ আর চোদ্দটা গণ্ডার মেরেছিলেন এক জঙ্গলে আর অন্য জঙ্গলে আটষট্টি দিনের শিকারে একশো কুড়িটা বাঘ আর আটত্রিশটা গণ্ডার মেরেছিলেন। কর্ণেল জিম কর্বেট বাঘ শিকারের একটা হিসেব তৈরি করেছিলেন। তাতে দেখা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের পাঁচ বছর তিনশো তেত্রিশটা করে বাঘ মারা হয়েছে বছরে, যুদ্ধের ছ বছর মারা হয়েছে বছরে দুশো পঁয়তাল্লিশটা করে বাঘ এবং যুদ্ধোত্তর ন বছরে দুশো চুয়াত্তরটা করে বাঘ মারা হয়েছে বছরে। একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে পুরুষ ও অনেক সময়ে মেয়েরাও রক্তের লোভে সব সময়ে একটা না একটা ছুতো তৈরি রাখত—মানুষখেকো বাঘ কিংবা গরু বাছুর টেনে নিয়ে যাবে—এই রকমের কিছু।

বাঘ শিকারের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানার পরে এ কথা ভাবলে কি অন্যায় হবে যে মানুষ বাঘের চেয়েও হিংস্র। হাতি বা গণ্ডারের মতো বাঘ নিরামিষভোজী নয়, সে মাংসাশী, বনের পশু মেরে তাকে ক্ষুধা মেটাতে হয়। বনের উপকণ্ঠে লোকালয় থাকলে গবাদি পশুর খোঁজেও হয়তো আসে। কিন্তু মানুষ শুধু রক্তের লোভে বাঘ শিকার করে। মানুষের এই হিংস্র স্বভাবের কথা বাঘও জেনে ফেলেছে। তাই মানুষকে ভয় পায়, আত্মরক্ষার জন্যই সে অনেক সময়ে হিংস্র হয়ে ওঠে। আত্মরক্ষার জন্য কোন্ প্রাণী হিংস্র হয় না! কোন্ মা হিংস্র হয় না তার সন্তানকে রক্ষার জন্য!

হত্যার এই অভিযান থেকে পাখির মতো নরম ও কোমল প্রাণীও বাদ পড়ে নি। ১৯৩৮ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো রাজস্থানের কেওলাদেও খানায় একাই উনিশশো গুলি

ছুঁড়েছিলেন। সেবারে তাঁরা মেরেছিলেন চার হাজার সাতশো তেইশটা হাঁস জাতের পাখি।

এই প্রাণী হত্যার পিছনে যে আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না তা নয়। একটা যুগ এসেছিল যখন বাড়ি সাজাবার রেওয়াজ হয়েছিল দেওয়ালে জীবজন্তুর মাথা টাঙিয়ে, তাদের চামড়া দিয়ে বসবার আসন ঢেকে এবং ঘরে বা বারান্দায় মৃত জন্তুকে জীবন্তের মতো করে সাজিয়ে রেখে। ভারতে এত জন্তু এমন সহজে পাওয়া যায় জেনে বিদেশের শিকারীরা এসেছে। তারা অবাধে প্রাণী হত্যা করেছে সাহেবদের সঙ্গে। দেশীয় রাজারা সবাইকে সাহায্য করেছে নিজেদের খরচে। শোনা যায় যে ভারত স্বাধীন হবার আগেই এ দেশের অরণ্যের নব্বুই শতাংশ প্রাণী শেষ হয়ে গেছে। তাই বাকি দশ শতাংশ প্রাণী রক্ষার জন্য সমস্ত রাজ্যেই অভয়ারণ্য সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এদেশে এমন অনেক জীবজন্তু আছে যা অন্যত্র নেই। এই তালিকার প্রথমেই হল গির ফরেস্টের সিংহ, যার নাম এশিয়ান লায়ন। রেওয়ার সাদা বাঘ, কচ্ছের বুনো গাধা, আসামের সোনালী হনুমান এবং কালো হরিণ, বড়াসিঙ্গা চৌসিঙ্গা ও চিতল। এত রকমের হরিণ বিশ্বের আর কোথাও নেই। বড়াসিঙ্গাকে গোঁদও বলে, ইংরেজীতে বলে সোয়াম্প ডিয়ার। ব্রান্দারি এই জাতেই পড়ে। ভেদাল বা চৌসিঙ্গার চারটি শিং মাথার দুদিকে এক জোড়ার পিছনে আর এক জোড়া। কালো হরিণকে হর্ণা বা কালিয়ার বলে। চিলকারাও এক জাতের হরিণ, তার সোজা সিং। ইংরেজীতে একে গ্যাজেল বলে। তিব্বতী হরিণের নাম চিরু, আর চিতল হল স্পটেড ডিয়ার। গোরালের অনেক নাম—সারাও সেরো বা টাকিন, ইংরেজীতে কেউ গোট অ্যান্টিলোপ কেউ বা ডাস্কি ডিয়ার বলে। হাঙ্গুল কাশ্মীরের সোয়াম্প ডিয়ার। কাকার বা মুণ্ট্জাককে বার্কিং ডিয়ার বলে। সবচেয়ে বড় আকারের হরিণকে

বলে নীলগাই। হগ ডিয়ারের স্থানীয় নাম পারা, পিগ্মিরা মাউস ডিয়ারের নাম। সাম্বরও খুব বড় জাতের হরিণ। মণিপুরের হরিণকে বলে সাঙ্গনাই বা থামিন।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি প্রাণীর নাম উল্লেখ করা উচিত ঃ অনেক সময়েই আমরা এই সব নাম শুনি, কিন্তু তাদের পরিচয় জানি না। ভারল নীল ভেড়ার নাম, বুনো কুকুরকে বলে ঢোলে, গৌর হল বাইসন, ঘড়িয়াল বা গড়িয়াল কুমীর জাতের, লাঙ্গুর মানে কালো মুখের হনুমান, টাহর পাহাড়ী ছাগল—তার গায়ের লোম বড় বড়, ইংরেজীতে একে আইবেক্স্ বলে এবং উরিয়াল এক রকমের ভেড়া। বর্ণনা দিয়ে এই সব প্রাণীর পরিচয় দেওয়া কঠিন। রঙীন ছবি দেখে খানিকটা ধারণা করা যায়। ভারতের বিভিন্ন বনে এদের বাস, এক জায়গায় দেখতে হলে যেতে হয় চিড়িয়াখানায়।

পুরাকালের মানুষ অরণ্যকে ভয় পেত না, নির্ভয়ে যেত যে কোন অরণ্যে। সেখানকার শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ মনকে প্রসন্ন করত, চঞ্চল মন সমাহিত হত ধ্যানে। তাই মুনি ঋষিরা বনে বাস করতেন আশ্রম নির্মাণ করে। বন্য জন্তুর ভয় তাঁদের ছিল না, কোন জন্তুকে তাঁরা হিংস্র ভাবতেন না, জন্তুরাও নির্ভয়ে আসত মানুষের সামনে। সেদিনের মানুষ তাঁর স্বভাবের গুণেই অরণ্যকে অভয়ারণ্যে পরিণত করেছিলেন। এখন এই দেশের সরকার আইন প্রণয়ন করে বন্য-প্রাণী রক্ষার জন্য অরণ্যকে অভয়ারণ্য বলছেন এবং বিশেষ জন্তুর জন্য কোন কোন অভয়ারণ্যকে ন্যাশনাল পার্ক বলে ঘোষণা করছেন।

২৫

মোটা বইখানা হাতে নিয়ে আমি আমার ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলুম। কখন যে একখানা গাড়ি এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল তা জানতেই পারি নি। জানতে পারলুম মুক্তাউয়াকে দেখে। মুক্তাউয়া ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকেই বললেন: তুমি একা আছ বাঙালী দাদা?

বললুম: একা কোথায়!

কই, আর কাউকে তো দেখছি না!

হাতের বইখানা উঁচু করে বললুম: এটা কী?

এ তো একটা বই।

হেসে বললুম: খুব ভাল সঙ্গী, এর চেয়ে ভাল সঙ্গী হয় না।

আমার কথা শুনে আশ্চর্য হলেন মুক্তাউয়া। এমন ভাবে আমার মুখের দিকে তাকালেন যে বলতে বাধ্য হলুম: বই কখনও কারও উপরে রাগ করে না। ভাল লাগলে পড়, না লাগলে ফেলে দাও ছুঁড়ে। আর কোন সঙ্গীর সঙ্গে কি এ রকম আচরণ করা যায়!

মুক্তাউয়া তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্বরে অভিযোগ করলেন: আশ্চর্য মানুষ এরা। তোমাকে যে একা ফেলে চলে গেছে তা আমি জানলাম এইমাত্র। বিয়ে বাড়িতে না এলে আমি জানতেই পারতাম না।

আমি বললুম: মিস্টার চাঙ্গাপ্পা এখান থেকে বিয়ে বাড়িতে যান নি বুঝি!

বিয়ে বাড়িতে ওর কী কাজ আছে! কোথায় আড্ডা দিতে গিয়েছিল ওই জানে!

তারপরেই বললেন: তোমার গলা শুকিয়ে গেছে তো বাঙালী দাদা? চা কফি কিছুই তো পাও নি! চা খাবে নিশ্চয়ই?

হেসে বললুম : পেলে মন্দ হত না।

মামু বোধহয় ঘুমোচ্ছেন ?

বোধহয় তাই।

তোমাদের কোন কথা হয় নি তো ?

বললুম : না। বাড়ি এসেই উনি ঘুমোতে গেছেন।

ওঁকেও জাগিয়ে দিচ্ছি।

বলে মুক্তাউয়া বেরিয়ে গেলেন।

বেশিক্ষণ নয়, খুব অল্প সময় পরেই মুক্তাউয়া আবার ফিরে এলেন। তাঁর হাতে দু পেয়ালা গরম চা। ডান হাতের পেয়ালাটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে বসলেন চেয়ারে। বললেন : মামুকেও জাগিয়ে চা দিয়ে এলাম। মামু খুব খুশী।

বললুম : চা পেলে কে না খুশী হয় !

মুক্তাউয়া বললেন : এ বেলায় মাঠ্‌ঠা লস্‌সির চেয়ে চা পেলেই মামু বেশি খুশী হন নিজের দেশে। কিন্তু এরা তো এ সব বোঝে না। কথায় কথায় কফি, যেন কফি খাইয়েই স্বর্গসুখ দেওয়া যাবে।

কিন্তু বাড়িতে চা থাকে দেখছি !

বিশাখারা চা ভালবাসে, কফি খায় মুখ বদলের জন্যে।

বললুম : ঠিক আমাদেরই মতো।

চায়ে চুমুক দিয়ে মুক্তাউয়া বললেন : একা একা তোমার খুব খারাপ লাগছিল, তাই না বাঙালী দাদা ?

মাথা নেড়ে আমি বললুম : একটুও না।

কেন ?

একা থাকার অভ্যেস আমার আছে। আগে তো একাই ছিলুম। ছুটির পর লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়তুম। সময়ের হিসেব থাকত না বলে বুড়ো লাইব্রেরিয়ানের কাছে আমাকে খুব বকুনি খেতে হত।

সত্যি !

বললুম : এই দেখ না, মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমাকে এই বইখানা দিয়ে গিয়েছিলেন। দুপুর গড়িয়ে যে বিকেল হয়ে গেছে, আমি তা বুঝতেই পারি নি। তুমি না এলে এই বই নিয়েই আমার সন্ধ্যেটাও কেটে যেত।

ক্ষিধে পেলে ?

বলে মুক্তাউয়া ছেলেমানুষের মতো আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাই দেখে আমি হেসে বললুম : ক্ষিধের কথা আমার মনেই পড়ত না।

মুক্তাউয়া বললেন : বই আমার একটুও ভালো লাগে না। একা থাকতে আমি হাঁপিয়ে উঠি।

তারপর চায়ে কয়েকটা চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন : তাড়াতাড়ি চাটা শেষ করে নাও বাঙালী দাদা, এখুনি আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : আবার বিয়ে বাড়িতে !

বিয়ে বাড়ির নামে ভয় পেয়ে গেলে তো !

বলেই হেসে উঠলেন।

আমি বললুম : হাসছ কেন ?

হাসছি তোমার ভয় দেখে। আমরা কি এখানে কষ্ট দেবার জন্যে তোমাকে এনেছি ! কাল সকালেই তো আবার বিয়ে বাড়ি যেতে হবে !

তবে ?

মার্কারা শহরটা বুঝি দেখবে না ! দেশে ফিরে বলবে কী সবাইকে ?

বললুম : দেখলেই তো দেখা হয়ে যাবে। তার জন্যে তাড়া কিসের ?

হাসতে হাসতেই মুক্তাউয়া বললেন : বেশ বলেছ বাঙালী দাদা। দেখলেই যে দেখা হয়ে যাবে সে তো সবাই জানে। তবে

সবাই দেখে কেন! আর না দেখলে যে না দেখাই থেকে যাবে, তা একবারও ভাবছ না কেন?

বললুম: বিয়ের জন্যে সবাই ব্যস্ত আছেন তো, তাই এ সব কথা ভাবছি না।

আমি ভাবছি।

বলে মুক্তাউয়া চা শেষ করে পেয়ালাটা নামিয়ে রাখলেন। আর আমি চা শেষ করতেই বললেন: এবারে চটপট তৈরি হয়ে নাও। এখুনি বেরোতে হবে।

বলে পেয়ালা দুটো নিয়ে চলে গেলেন।

পরমুহূর্তেই আমি মুক্তাউয়ার কথা শুনতে পেলুম রাও সাহেবের সঙ্গে। বুঝতে পারলুম যে তাঁকেও বোধহয় বেরোবার জন্যে বলছেন। কিন্তু রাও সাহেব কী উত্তর দিলেন তা শুনতে পেলুম না।

ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে মুক্তাউয়া আমাকে ডেকে বললেন: চলে এস, আর দেরি কোরো না।

বাইরে বেরিয়ে দেখলুম যে মুক্তাউয়া একা এসেছেন তাঁদের বিদেশী গাড়িটা নিয়ে। সামনের আসনে আমাকে তুলে দিয়ে নিজে বসলেন স্টীয়ারিঙে। যাত্রার আগেই আমি প্রশ্ন করলুম: মামাবাবু যাবেন না?

মুক্তাউয়া সংক্ষেপে বললেন: না।

একটু বেড়িয়ে এলে তো তাঁর ভাল লাগত!

আরামটাই উনি বেশি ভালবাসেন।

বাড়ির কম্পাউণ্ড থেকে আমরা বাইরে নেমে এলুম, তারপর ডান দিকের পথ ধরে চললুম শহরের দিকে। এই দিক থেকেই আমরা এসেছিলুম। এই পথে কিছু দূর এগোলে আমরা শহরে পৌঁছে যাব।

মার্কারা শহরের দর্শনীয় স্থানের কথা আমরা তাপ্পির কাছে শুনেছিলুম। যতদূর মনে পড়ছে, তেমন কোন দর্শনীয় স্থান নেই।

পাহাড়ের মাথায় কুর্গের রাজাদের প্রাচীন দুর্গ আছে একটি, তার ভিতরে এখন সরকারী অফিস বসছে। আর একটা শিবের মন্দিরের কথাও শুনেছিলুম। দেখবার মতো আর কোন জায়গার কথা আমার মনে পড়ল না।

শহরের কাছাকাছি পৌঁছে মুক্তাউয়া বললেন: এ দিকটায় দেখবার কিছু নেই ভাবছ? কিন্তু পথের ধারের পাহাড়ের ওপরে একটু নজর রেখো। কুর্গের রাজাদের সমাধি দেখতে পাবে। উঠবে পাহাড়ে?

বললুম: সকালে আসবার সময় পাহাড়ের গায়ে দু-তিনটে মন্দিরের মতো দেখেছিলুম বলে মনে পড়ছে।

ঠিক বলেছ। তখন আমাদের মুখ তারই দিকে ছিল। যদি দেখতে চাও তো বল। গাড়ি নিয়ে ওপরে ওঠা যাবে।

বললুম: মরা মানুষের সমাধি দেখতে আমার ভাল লাগে না।

মুক্তাউয়া বললেন: তার স্থাপত্য কলাও এমন আকর্ষণীয় নয় যে ওপরে ওঠার মজুরি পোষাবে।

বলতে না বলতেই আমরা সেই পাহাড়ের ধার দিয়ে শহরে পৌঁছে গেলুম। এইটেই যে শহরের প্রধান রাজপথ তাতে সন্দেহ নেই। দু ধারেই দোকানপাট লোকজন ও ঝকঝকে নতুন গাড়ি যাতায়াত করছে। উটির মতো পুরনো বিদেশী গাড়ি এখানে একটিও দেখছি না। সবই হাল আমলের অ্যাম্বাসাডার ও প্রিমিয়ার গাড়ি, মাঝে মাঝে স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড বা গ্যাজেলও দেখছি। দু-একখানা বিদেশী গাড়িও মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে। শহরটা পুরনো হলেও এই গাড়িগুলো পুরনো নয়। গাড়ি দেখেই শহরবাসীর সমৃদ্ধির পরিচয় পাচ্ছি।

এইভাবেই আমরা ট্যাক্সি ও বাসের স্ট্যাণ্ড পেরিয়ে গেলুম। বাঁ হাতের পথে একটা বড় হোটেল দেখতে পেলুম, ছোট হোটেল রেস্তোরাঁও কয়েকটা পেরিয়ে এসেছি। এইখান থেকেই একটা পথ

নিচের সিনেমা হাউসের দিকে নেমে গেছে। মুক্তাউয়াই এই সব আমাকে চিনিয়ে দিয়ে বললেন: এখন আমরা শহরের অন্য প্রান্তের দিকে চলেছি।

কোথায় যাচ্ছি আমরা?

বলে আমি মুক্তাউয়ার মুখের দিকে তাকালুম।

মুক্তাউয়া হেসে বললেন: ভাবছেন, মাইসোরে ফিরে যাচ্ছি! না, তা নয়। আমরা এবারে ডান দিকের এই পাহাড়ে উঠব। এর ওপরে কুর্গের ফোর্ট ও রাজা'স সীট।

রাজা'স সীট!

রাজার সিংহাসন নয়, বসবার জায়গা! তোমার ভাল লাগবে সেই জায়গা।

সমতল রাজপথ ছেড়ে মুক্তাউয়া পাহাড়ে ওঠার পথ ধরলেন। কিছু দূর এগিয়ে বললেন: একা এলে এই ট্রাভলার্স বাংলোয় থাকতে হত, কিংবা নিচের কোন হোটেলে।

আমি বললুম: মার্কারায় একা আসার কথা আমি ভাবতেই পারতুম না।

কেন?

দক্ষিণ ভারতে আমরা দুটি পাহাড়ী শহরের নাম জানি—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুক্তাউয়া বললেন: উটি আর—

বললুম: কোডাই কানাল।

মুক্তাউয়া সহাস্যে বললেন: তবে তো অনেক জানো বাঙালী দাদা।

শুধু আমি নই। দক্ষিণ ভারতে যারা আসে, তাদের কেউই বোধহয় এর চেয়ে বেশি নাম জানে না। উটি দেখলে কোডাই কানাল দেখবার সুযোগ আর পায় না। মাইসোরে এসে মার্কারা দেখে গেছে, এমন লোকের নাম আমার জানা নেই।

মুক্তাউয়া এ কথা মেনে নিয়ে বললেন: কতকটা তাই।

ভারতের টুরিস্ট ম্যাপে বোধহয় মার্কারার নামই নেই। শ্রবণগোলা বেলুর হালেবিড অনেকেই দেখে, কিন্তু মার্কারার নামই জানে না।

গোঁ গোঁ শব্দ করে আমাদের গাড়ি উপরে উঠছিল। এইবারে একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং একটা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পেরিয়ে অন্য ধারে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা খুলে মুক্কাউয়া নেমে পড়লেন। আমিও নামলুম।

নেমেই আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। আমাদের গাড়ি এসে দুটো হাতির প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু হাতি দুটো একেবারেই নিশ্চল। গাড়ির শব্দে বা আমাদের দেখে একটুও বিচলিত হয় নি। যেমন তাকিয়ে ছিল, তেমনি তাকিয়ে রইল। এত কাছে আমাদের দেখেও তাদের শুঁড় বাড়িয়ে দিল না।

ভয়ে আমি খানিকটা সরে আসতেই মুক্কাউয়া হেসে উঠলেন। বললেন: হাতি দেখে ভয় পেয়ে গেলে বাঙালী দাদা! এই দেখ।

বলে এগিয়ে গিয়ে একটা হাতির গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

এইবারে আমি নিজের ভুল বুঝতে পারলুম। ও দুটো সত্যি হাতি নয়, পাথরের মতো কোন উপকরণে তৈরি প্রমাণ আকারের হাতি। গায়ের রঙও ঠিক হাতির মতো বলেই জীবন্ত বলে আমার ভুল হয়েছিল।

এইবারে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি চারি দিকে চেয়ে দেখলুম। প্রাঙ্গণের এক ধারে কিছু ঘর বাড়ি। কিন্তু লোকজন এখন দেখতে পাচ্ছি না। মুক্কাউয়া বললেন: এইটেই ছিল কুর্গের রাজাদের দুর্গ, এখানেই তাঁরা বাস করতেন।

এখন?

এখন তো এটা সরকারী দপ্তর হয়েছে। রাজা কোথায় থাকেন জানি না।

তাপ্পিব কথা আমার মনে পড়ল। সে বোধহয় আমাকে

বলেছিল যে রাজ্যচ্যুত হবার পরে তাঁরা কাশীবাসী হয়েছেন। রাজপরিবারের মানুষদের সম্বন্ধে এখন আর বোধহয় কারও কৌতূহল নেই। কিংবা অন্য কেউ হয়তো সব খবরই রাখেন।

ফোর্টের গেট দেখবে?

বলে মুক্তাউয়া আমাকে উল্টো দিকে টেনে নিয়ে গেলেন। সেদিকেও একটা পথ আছে। সেই পথে বাহিরে বেরিয়ে দেখলুম যে সে দিক থেকেও একটি পায়ে চলার উপযোগী পথ শহর থেকে উঠে এসেছে। কিন্তু এই খাড়া ও সঙ্কীর্ণ পথে গাড়ি চলাচল সম্ভব নয় বলেই আমরা ঘোরা পথে এখানে এসেছি। গেটের পাশেই একটা ছোট মন্দির, তার মধ্যে সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি। দেখেই বুঝতে পারলুম যে এই মন্দিরে এখনও নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। গণেশকে প্রণাম করে আমরা দুর্গের মধ্যে ফিরে এলুম।

গাড়িতে উঠে মুক্তাউয়া বললেন: এইবারে রাজা'স সীটে চল।

সেখানেও কিছু দেখবার আছে বুঝি?

মুক্তাউয়া বললেন: কুর্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য সেখান থেকেই সবচেয়ে ভাল দেখবে।

এই দুর্গ থেকে রাজা'স সীট বেশি দূরে নয়। খুব অল্প সময়েই আমরা সেখানে পৌঁছে গেলুম। পাহাড়ের একটা ন্যাড়া মাথায় খানিকটা সমতল ভূমি। সেই খোলামেলা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে মুক্তাউয়া নেমে পড়লেন দেখে আমিও নামলুম। তারপর তাঁরই সঙ্গে এগিয়ে গেলুম পাহাড়ের একেবারে ধারে। সেখান থেকে এই পাহাড় একটার পর আর একটা তরঙ্গের মতো নেমে সমতলভূমির সঙ্গে মিলে গেছে। সত্যিই এই দৃশ্যের যেন তুলনা নেই। আমি অভিভূত হয়ে গেলুম।

মুক্তাউয়া আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন: ভাল লাগছে না বাঙালী দাদা?

বললুম: খুব ভাল লাগছে।

তাহলে এসো, ঐ চাতালটার উপরে একটু বসি।

এখানে বসব আমরা!

কেন, তোমার কি ভয় করছে বাঙালী দাদা!

বলে মুক্তাউয়া আমার হাত ধরে সেই চাতালের কাছে টেনে এনে বসিয়ে দিলেন। নিজে বসলেন আমার পাশে।

দিনের আলো তখন নিবে আসছিল। আর একটু পরেই এই নির্জন পাহাড়ে সন্ধ্যা'র অন্ধকার নামবে সব কিছু আবৃত করে। কাছে বা দূরে কোন জনমানব দেখতে পাচ্ছি না। কোন শব্দ নেই এখানে, পৃথিবীর সর্বক্ষণব্যাপী কোলাহলের কোন প্রতিধ্বনি এখানে পৌঁছয় না। মুক্তাউয়ার অত্যন্ত সন্নিকটে বসে এক অভূতপূর্ব সঙ্কোচে আমি আড়ষ্ট হয়ে রইলুম।

মুক্তাউয়া অত্যন্ত সহজে বললেন: সত্যিই ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে।

বললুম: ভয় নয়, সঙ্কোচ।

সঙ্কোচ কিসের?

তোমাকে নয়, সঙ্কোচ সংস্কারের, সঙ্কোচ সমাজের।

তাকেই তো ভয় বলে বাঙালী দাদা! কিন্তু এখানে তো কেউ নেই, এখানে আমাদের ভয় করবে কেন?

আমি ভয়ে ভয়েই বললুম: মনকে এ ভাবে তৈরি করতে আজও আমরা অভ্যস্ত হই নি।

সহসা একটা শীতল বাতাস বয়ে গেল। আমার শরীর উঠল কেঁপে। একই সঙ্গে মুক্তাউয়ার শাড়ির আঁচল আমার গায়ে ঠেকল। আমি একটা মিষ্টি সৌরভ পেয়ে শিহরে উঠলুম। কিন্তু মুক্তাউয়ার চোখে মুখে আমি কোন ভাবান্তর দেখতে পেলুম না।

মুক্তাউয়া যেন আরও সহজ হয়েছেন, আরও স্বাভাবিক। এই স্বাধীনতায় তাঁর মন যেন অসীম আকাশের দিকে মেলে দিয়েছেন।

অনেকক্ষণ কোন কথা কইলেন না, তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি গান জান বাঙালী দাদা ?

মুক্তাউয়ার এই প্রশ্নে আমি চমকে উঠলুম। তাপ্তির কথা আবার আমার মনে এল। সেবারে মাইসোরের রিটায়ারিং রুমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে গুনগুন করে গান গাইছিল। উল্টো দিকের বারান্দায়, আর তার ঘরের দরজা ছিল খোলা। নিঃশব্দে আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। আমার কোন সঙ্কোচ হয় নি, দ্বিধা আসে নি মনে। তাপ্তিও আমাকে দেখে চমকে ওঠে নি। গান থামবার পরে আমি বলেছিলুম : ভারি মিষ্টি গলা তো আপনার !

তাপ্তি বলেছিল : মিষ্টি আমার গলা নয়, মিষ্টি গানের ভাব।

আমি তো মানে বুঝি নি, শুনেছি শুধু সুর।

তাপ্তি আমাকে গানের কথাগুলি আবার শুনিয়েছিল। আর তার মানে বলেছিল : আমার জীবন হোক বনফুলের মতো কুসুমিত। হে দেব, আমার মন তুমি এমনি করেই গড়ে তোল।

আমি তাকে এই গান আবার গাইতে বলেছিলুম। সে গেয়েছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলুম সেই গান। সেই গান আর সেই সুর এখনও আমার মনে আছে দেখে নিজেই বিস্মিত হলুম। গান জানি না এ কথা বলতে পারলুম না।

মুক্তাউয়া বলল : একটা গান গাও না বাঙালী দাদা।

তাপ্তির গানই আমি গুনগুন করে গাইলুম :

বন সুমদোলেন্না জীবনভু বিকাশি শুভন্তে,
মন ভানামুগোলিস্নু গুরুভে হে দেব।

আমি থামতেই মুক্তাউয়া পরম বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন : এ তো এ দেশের গান, এ গান তুমি কোথায় শিখলে ?

বললুম : কুর্গের একটি মেয়ের কাছে। সেবারে মাইসোরে সে আমাকে এই গান শুনিয়েছিল।

কী হল তারপর ?

তারপর আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি। আর কোনদিন বোধহয় দেখা হবে না।

কেন?

সে আর এ দেশে নেই।

মুক্তাউয়ার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল বলে মনে হল। অনেকক্ষণ আর কোন কথা কইলেন না। আমিও কী বলব, তা ভেবে পেলুম না।

এক সময়ে অন্ধকার নামল পাহাড় থেকে। অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেল। সময়ের কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলুম।

মুক্তাউয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: চল, শিবের মন্দিরে একটা প্রণাম করে আমরা ফিরে যাই।

২৫

গাড়ির মুখ ঘুরিয়েই মুক্তাউয়া বললেন : দেবীকে একটা প্রণাম কর বাঙালী দাদা !

বলে নিজেও স্টীয়ারিং ছেড়ে দু হাত জুড়ে নমস্কার করলেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : দেবী কোথায় ?

ঐ তো দেবী !

বলে মুক্তাউয়া পথের পাশে একটি অনাদৃত অন্ধকার ঘর দেখিয়ে বললেন : দেবী ঐ মন্দিরে আছেন।

যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে আমিও প্রণাম করলুম।

তারপর পাহাড় থেকে নেমে সদর রাস্তা ছেড়ে শহরেরই উপকণ্ঠে একটি গ্রামাঞ্চলে এসে আমরা গাড়ি থেকে নামলুম।

এই মন্দির দেবীর মন্দিরের মতো অনাদৃত নয়, একে উপেক্ষা করারও কোন উপায় নেই। উঁচু প্রাচীরে বেষ্টিত একটি মন্দিরে আছেন ওঙ্কারেশ্বর শিব। গেট দিয়ে ঢুকে আমরা একটি বাঁধানো সরোবরের ধারে পৌঁছলুম। এই সরোবরের মাঝখানে একটি মন্দিরের মতো আছে, কিন্তু শিব সেখানে নেই। চারি ধার ঘিরে যে পথ আছে, সেই পথে এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের সিঁড়ি। অনেকগুলো সিঁড়ি উঠবার পরে মন্দিরের প্রাঙ্গণ ও মন্দির। মন্দিরের মধ্যে অল্প বয়সের অনেক ছেলেমেয়ে ঘটা করে প্রণাম করছে। এই তরুণ ছেলেমেয়েদের ভক্তি আমার চোখে নতুন বলে মনে হল। এতদিন প্রায় সর্বত্রই আমি ভারতের মন্দির প্রাঙ্গণে বয়স্কদেরই দেখেছি পূজার্চনা করতে। তরুণেরা মন্দিরের স্থাপত্য কলা দেখে, দেখে বাহিরের রূপ। এইভাবে এই অবেলায় মন্দিরের মধ্যে বসে পূজা ও প্রণাম করতে তরুণদের আমি কোথাও দেখি নি। মুক্তাউয়াও

হাঁটু গেড়ে বসে মেঝেয় কপাল ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলেন। আমার মনে হল যে অন্য সময় হলে হয়তো শিবের পূজা দিতেন এই ছেলেমেয়েদের মতো। কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব নিয়ে আমি মন্দির থেকে বেরিয়ে এলুম।

মুক্তাউয়া গাড়িতে বসে বললেন: মার্কারায় আর কিছু দেখবার মতো নেই।

বললুম: তাহলে এবারে বাড়ি ফেরা যাক।

মুক্তাউয়া সকৌতুকে বললেন: আপনি ভারি লাজুক প্রকৃতির মানুষ। সারাক্ষণই বোধহয় সমাজ আর সংস্কারের কথা ভাবছেন!

সে কথা মনে রাখতে হয় বৈকি!

কিন্তু সমাজের কাছে আমরা কী পাই বলুন তো! সব কথা মানতে গেলে মনটা কি পদে পদে বাধা পায় না!

বললুম: তা পায়, কিন্তু না মানলে যে বিপদ বেশি!

মুক্তাউয়া বলে উঠলেন: তাহলে কি আমরা সমাজের ভয়েই নিজেদের ভালমন্দ লাগা বিসর্জন দেব!

তা বলছি না।

তবে?

সব দিক মানিয়ে চলাই ভাল। তা না হলে ভুল বোঝাবুঝি হয়।

মুক্তাউয়া হেসে বললেন: আপনি কি আমার স্বামীর কথা ভাবছেন! ভয় নেই, তিনি আমাকে কখনও ভুল বুঝবেন না। আর অন্যের ভুল বোঝা! আমার কী আসে যায় তাতে!

আপনার বদনামের ভয় নেই?

সুনামের লোভও নেই।

গাড়ির হেড লাইট জ্বেলে মুক্তাউয়া তখন সবেগে ফিরছিলেন। এই নির্জন পথ পেরিয়ে হোটেল কাবেরীর সামনে দিয়ে আমরা সদর রাজপথে উঠে পড়লুম। শহরের বাস ও ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড

এইখানেই। আমরা ডান দিকে মোড় নিয়ে শহরের অন্য প্রান্তের দিকে অগ্রসর হলুম। কেন জানি না, আমার মন একটা দুর্যোগের আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল যে কোন অপ্রীতিকর পরিবেশে পড়তে হবে আমাদের। কিন্তু মুক্তাউয়ার চোখে মুখে কোন দুর্ভাবনার আভাসও নেই।

শহর ছাড়িয়ে বাড়ি পৌঁছতে আমাদের বেশি সময় লাগে না। নির্বিঘ্নে আমরা পৌঁছে গেলুম। ভিতরে একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল এবং বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন কয়েকজন।

মিস্টার সোমান্নাকে চিনতে পেরে আমি উল্লসিত হয়ে উঠলুম, বললুম: এসেছেন আপনি! আজ সারাদিন আপনাকে দেখতে পাই নি!

কিন্তু মিস্টার সোমান্না আগের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন না, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

তার পরেই একজন নূতন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, বললেন: ইনিই আমাদের কর্ণেল সাহেব। এঁর কাছেই আপনি অরণ্যের কথা জানতে পারবেন। ভারতের সর্বত্র শিকারের জন্য এঁর নাম আছে।

কর্ণেল সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলেন মুক্তাউয়াকে। এইবারে আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। আমিও আমার ডান হাত এগিয়ে দিতেই সজোরে করমর্দন করে বললেন: আপনাকে কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে।

ঠিক একই সময়ে একই কথা এসেছিল আমার মনে। কিন্তু কোথায় তাঁকে দেখেছি সেই সূত্রটি মনে পড়ল না। তাই বললুম: কোথাও দেখেছি কি!

কর্ণেল সাহেব তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন: তাহলে আমারই ভুল হচ্ছে।

মুক্তাউয়া বললেন : আপনারা কথা বলুন, আমি আপনাদের জন্যে কফি তৈরি করে আনছি।

বলে ত্রস্তপদে ভিতরে চলে গেলেন। বাহিরের বারান্দাতেই আবার আমরা বসে পড়লুম।

কর্ণেল সাহেবকে অরণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করবার আগে আমি মিস্টার সোমান্নাকে বললুম : আমি খুব আশা করেছিলুম যে আপনাকে বিয়ে বাড়িতে দেখতে পাব।

মিস্টার সোমান্না বললেন : আমি তো বিয়ে বাড়িতেই ছিলাম!

কই, দেখতে পাই নি তো আপনাকে!

কনের বাড়ি এলেই দেখতে পেতেন। আমরা যে বরের মাসি, আর কনের পিসি।

সে কী রকম?

দুজনের সঙ্গে দু রকমের সম্বন্ধ, তাই দু দিকই রাখতে হয়

আমি বললুম : কাল কোন্ বাড়িতে থাকবেন?

দু বাড়িতেই।

একই সঙ্গে?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : সকাল বেলায় দু বাড়িতেই মূহূর্ত আছে, আর সন্ধ্যেবেলায় এক বাড়িতে দম্পতি মুহূর্ত।

তাহলে সকালবেলায় আপনি এক বাড়িতেই থাকবেন?

না, দুজনে দু বাড়িতে থাকব। সীতা থাকবে কনের বাড়িতে, আর আপনার খাতিরে আমি বরের বাড়িতে থাকব ঠিক হয়েছে।

বললুম : খুব ভাল কথা।

আর একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : আমাকে নিমন্ত্রণ!

মিস্টার সোমান্না বললেন : কালও আপনি আজকের মতো পোশাক পরে আসবেন।

কিন্তু আমার আজকের পোশাক তো আপনি দেখেন নি!

শুনেছি সবই। এমন দুর্দান্ত মানিয়েছিল আপনাকে যে মেয়েরা আপনার মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে নি, হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

বলে এমন ভাবে হাসলেন যে মনে হল এই ঘটনা নিয়ে অনেক মুখরোচক আলোচনা ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। তাই দৃঢ় স্বরে বললুম: আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন, সে পোশাক আমি আর পরতে পারব না।

কর্ণেল সাহেব বললেন: লজ্জা কিসের! এর আগে এ রকমের সৌভাগ্য আর একজনের হয়েছিল বৃন্দাবনে। তিনি এখনও অমর হয়ে আছেন। আপনিও যখন একই রকমের সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন—

সারা গা আমার যেন জ্বলে গেল। তবু আমি সংযত থেকে বললুম: আমার নিজের পোশাকে গেলে যদি আপনাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার অসুবিধা থাকে, তাহলে আমাকে বাদ দিন।

মিস্টার সোমান্না বললেন: রাগ করছেন কেন? বলে বিরুভুর সময়ে ঐ পোশাক যে পরতে হয়!

বললুম: আমাকে বাদ দিতে আপনাদের আপত্তি কিসের! মনে করুন, আমি আর এখানে নেই!

মিস্টার সোমান্না বললেন: কী আশ্চর্য! এই অনুষ্ঠান হয় যে অতিথির সম্মানে, মানে আপনাকে সম্মান দেখাবার জন্যেই এই অনুষ্ঠান।

আমি ক্ষুব্ধ স্বরে বললুম: সম্মান, না অপমান!

অপমান কিসের?

অপমান নয় কেন! সবাই আমাকে আপনার দেশের লোক ভেবে অনর্গল কথা বলে যাবেন, আর আমি শুধু বোকার মতো হাসব! আপনারা কোন প্রশ্ন করলেও আমি বুঝতে না পেরে হেসে যাব, এই তো!

এই কথা!

বলে মিস্টার সোমান্নাও হেসে বললেন : না না, সে ভয় নেই। আমি আপনার সঙ্গে থাকব।

বললুম : আজও তো একজন সঙ্গে ছিলেন। আমি জানি, চোরে চোরে সব মাসতুতো ভাই।

ঠিক এই সময়ে মুক্তাউয়া একখানা ট্রলি ঠেলে বাহিরে এলেন। তার ওপরে কফি এসেছে আমাদের জন্য। মুক্তাউয়া সবার হাতে কফি তুলে দিয়ে বললেন : অরণ্যের কথা হচ্ছে তো! মামুকে বলেছি, তিনিও আসছেন।

আমি বললুম : না, এখন আমাদের অনুষ্ঠানের কথা হচ্ছে। ওঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন কী একটা অনুষ্ঠানের।

মিস্টার সোমান্নার মুখের দিকে তাকালেন মুক্তাউয়া। তিনি বেশ সতর্ক ভাবে বললেন : কাল সকালে বলে বিরুড়ুর জন্যে ওঁকে আসতে বলছি।

মুক্তাউয়া প্রবলভাবে আপত্তি জানালেন : না না, ওসব অনুষ্ঠানে বাঙালী দাদাকে ডাকবার দরকার নেই। এসব সেকেলে ব্যাপারে তুমি যেও না বাঙালী দাদা।

আমি বললুম : এ কিসের অনুষ্ঠান তা তো আমি জানিই না।

মুক্তাউয়া বললেন : তোমাকে জানতেও হবে না।

তবু—

বিয়ে বাড়ি গিয়ে মাননীয় অতিথিরা বসবেন বাড়ির সামনে একখানা মাদুর বিছিয়ে। মাটিতে একসারি কলাগাছের কাণ্ড পোঁতা থাকবে, তার উপরের দিকের কাটা মাথা থাকবে ফুল দিয়ে সাজানো। অরুভা তোমার হাতে একটা দা দিয়ে বলবে, একটা একটা করে সব কটা গাছের কাণ্ড এক এক কোপে কাটো। আর এই হুকুম পেয়েই তুমি উঠে গিয়ে হেঁইও হেঁইও করে একটার পর একটা কলাগাছ কাটবে সবার চোখের সামনে।

তারপর ?

কোন ভদ্রলোক ঐ মোটা মোটা কলাগাছগুলো এক এক কোপে কাটতে পারে! একটা আটকে গেলে তোমার মান থাকবে কোথায়! যত সব দুরভিসন্ধি এদের পেটে।

বলে মুক্তাউয়া ভিতরে চলে গেলেন।

মিস্টার সোমান্নার মুখ ম্লান হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলুম না যে সত্যিই এঁরা আমার সম্মানের জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, না কোন দুরভিসন্ধি ছিল তার পিছনে! সকালবেলায় মিস্টার চাঙ্গাপ্পার চোখে আমি কৌতুক দেখেছি। মিস্টার সোমান্নার পরিকল্পনাও কৌতুকের জন্য হওয়া অসম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত আমি হয়তো এখানে একটা ভাঁড়ে রূপান্তরিত হয়ে যাব। মনে মনে মুক্তাউয়াকে আমি ধন্যবাদ দিলুম। কিন্তু পরিবেশটা যাতে নিরানন্দ না হয় তার জন্যে বললুম: আজ সকালে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমার কোমরে একখানা খোলা দা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, খুব ভয় পেয়েছিলুম আমি। এই সব অস্ত্র দেখলে ভয়ে আমার বুক গুড়গুড় করে।

বলে আমি জোর করে হেসে উঠলুম।

ঠিক এই সময়ে রাও সাহেব এসে আমাকে রক্ষা করলেন। বললেন: তোমাদের নাকি অরণ্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে!

তাড়াতাড়ি আমি বললুম: এই বারে শুরু হবে। বসুন আপনি।

বলে আমি একখানা চেয়ার তাঁকে এগিয়ে দিলুম। রাও সাহেব বসেই প্রশ্ন করলেন: দেশে এখন ন্যাশনাল পার্ক কটা?

বলে কর্নেল সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন।

কর্নেল সাহেব বললেন: এখনো নাম গোনা যাচ্ছে, এর পর আর যাবে না।

কেন?

যতগুলো পার্ক এখন আছে, প্রায় ততগুলোই নতুন হবে বলে স্থির হয়েছে।

কী রকম ?

দক্ষিণ থেকেই শুরু করি। দক্ষিণে এখন বাঁদীপুর, বায়েরঘাট্টা ও নাগরহোলে—এই তিনটে ন্যাশনাল পার্ক। স্থির হয়েছে যে মুডুমালাই ও পেরিয়ারও ন্যাশন্যাল পার্ক হবে, আর অন্ধ্র প্রদেশেও হবে একটা। উত্তরে ছিল কাজিরঙ্গা হাজারিবাগ পালামৌ সিমিলিপাল কান্‌হা শিবপুরী বান্ধবগড় বরিভ্‌লি নবেগাঁও পেঞ্চ তাড়োবা কর্বেট ও গির ফরেস্ট। নতুন হচ্ছে মানস সরিস্‌কা জয়সমন্দ জল্‌দাপাড়া রাজাজী স্যাঙ্কচুয়ারি। এ ছাড়াও সাদা বাঘের জন্যে মধ্যপ্রদেশে একটা, উড়িষ্যায় একটা, বিহারে আর একটা বঙ্গের নর্থ কানাড়া অঞ্চলেও একটা। কতগুলো হল ?

আমি হিসেব রাখছিলুম, বললুম: ষোলটা আছে, আরও হবে তেরোটা।

তার মানে গোটা ত্রিশেক ন্যাশনাল পার্ক হবে দেশে। এছাড়া প্রধান ওয়াইল্ড্‌ লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি, টাইগার রিজার্ভ, তারপর ছোটখাট স্যাঙ্কচুয়ারি। এর সংখ্যা গুণে শেষ করা যাবে না।

রাও সাহেব বললেন: দেশে টাইগার রিজার্ভ বোধহয় বেশি নেই।

কর্নেল সাহেব বললেন: তাও কম নয়।

বলে গুনতে লাগলেন: মানস পালামৌ সিমিলিপাল সুন্দরবন কান্‌হা মেলঘাট রণথম্বর ও কর্বেট।

আমি তৎপর ভাবে বললুম: নটা।

মিস্টার সোমান্না বললেন: পূর্ব ভারতের স্যাঙ্কচুয়ারির কথা আমরা শুনেছি। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের গল্প বলুন।

কর্নেল সাহেব বললেন: তাহলে কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করি।

সেই ভাল।

আজকাল ডাচিগামের নাম অনেকেই জানেন। তার কারণ এটি শ্রীনগরের খুব কাছে,—মাইল চোদ্দ দূরে। হরোয়ান পর্যন্ত

মোটর চলাচল করে। তারপরে ট্রেকিং। এখানে আছে কাশ্মীরী হরিণ হাঙ্গুল ও মাস্ক্ ডিয়ার, ভালুক আছে কালো ও ব্রাউন রঙের, স্নো লেপার্ডও দেখতে পাওয়া যায়। কাশ্মীরে আরও দুটো স্যাঙ্কচুয়ারি আছে—একটি আচ্ছাবলের কাছে, তার নাম ডেস্থু, কালো ভালুক মাস্ক্ ডিয়ার আর ফিসান্ট্স্ আছে। দ্বিতীয়টির নাম চুমানাই বেসিন, পাহালগাম থেকে আরু হয়ে যেতে হয়। ডাচিগামের সব পশু এখানেও আছে। ডাচিগামের সিজন সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর, কিন্তু আর দু জায়গায় গ্রীষ্মকাল ছাড়া যাওয়া যায় না।

কফির পেয়ালা শেষ করেই কর্নেল সাহেব তাঁর পকেট থেকে একটা বড় চুরট বার করে রাও সাহেবকে বললেন: যদি অনুমতি দেন—

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

বলে রাও সাহেব একটু পিছিয়ে বসলেন।

কর্নেল সাহেব চুরট ধরিয়ে বললেন: হিমাচল প্রদেশ ও হরিয়ানাতেও অনেকগুলো স্যাঙ্কচুয়ারি আছে। হিমাচল প্রদেশে কালাটপ-খাজিয়ার সিম্বলবারা ও সিয়া গমগুন। হরিয়ানায় কলেসর কলসিয়া শিকারগড় ও সুলতানপুর। এ সব বনের কথা বলে শেষ করা যাবে না, আর বনের পশুপাখির বিবরণ খুবই একঘেয়ে মনে হবে।

রাও সাহেব বললেন: কর্বেট ন্যাশনাল পার্কের খুব নাম শুনেছি।

কর্নেল সাহেব বললেন: সেইজন্যেই এটা ন্যাশনাল পার্ক। এর আয়তনও বেশ বড়, হিমালয়ের গায়ে সোয়া তিন শো বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এই অরণ্য। বনের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে রাম-গঙ্গা নদী। এক সময়ে বাঘের জন্যে এই বন বিখ্যাত ছিল, হাতিও ছিল। এখন চিতল জাতের হরিণই প্রধান। হগ ডিয়ার পিগ

লেপার্ডও আছে। রামগঙ্গা নদীতে কচ্ছপ ও নানা রকম পাখিও দেখতে পাওয়া যায়। রামনগর বা হল্‌দোয়ানি যে কোন স্টেশনে নেমে গাড়িতে এই বনে যেতে হয়। রাত্রিবাসের জন্যে অনেক রেস্ট হাউস আছে—কতগুলো বনের বাইরে আর কতগুলো ভেতরে। পথঘাট খুব ভাল। হাতিতে চড়ে বনে বেড়াবার ব্যবস্থাও আছে। যাঁরা নৈনিতাল বা রাণীখেতে বেড়াতে যান, তাঁরা ইচ্ছে করলে দু-একদিন বনের মধ্যে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে আসতে পারেন।

রাও সাহেব বললেন: উত্তর প্রদেশে বোধহয় এই একটাই বন।

কর্নেল সাহেব সকৌতুকে মাথা নেড়ে বললেন: আজ্ঞে না। এই রাজ্যেও স্যাঙ্কচুয়ারির সংখ্যা অন্য রাজ্যের তুলনায় কম নয়।

তারপর একটুখানি ভেবে বললেন: তা আট-দশটা হবে।—বাঙ্কাটোয়া চন্দ্রপ্রভা কিশনপুর মালান মালধান মোতিচুর নন্দাদেবী রাজাজী টাণ্ডা।

বলে থামলেন। আমি দেখলুম যে তিনি নটা নাম বলেছেন। বললুম: আমি আরও দুটো নাম শুনেছি। কেদারনাথ অঞ্চলের অভয়ারণ্যটি নাকি কর্বেটের মতোই বড়। আর একটি যমুনোত্রী অঞ্চলে, তার নাম গোবিন্দ পশু বিহার।

কর্নেল সাহেব বললেন: ও দিকটায় আমি যাই নি, আর আমার কাছে যে ম্যাপ আছে তাতে এই নাম দুটো নেই।

রাও সাহেব বললেন: এবারে তাহলে রাজস্থানের কথা বলুন।

কর্নেল সাহেব তৎক্ষণাৎ বললেন: রাজস্থানে কোন ন্যাশনাল পার্ক নেই। তবে ছোট বড় অভয়ারণ্য আছে অনেকগুলি। কেওলাদেও ঘানা আর সরিস্কা তো আপনার ঘরের কাছেই। তাছাড়া জয়সমন্দ কুম্ভলগড় রণথম্বর মাউণ্ট আবু—এসবও দূরে নয়।

আমি বললুম: আর নেই?

আরও আছে। দারা তাল ছাপার রামসাগর বনবিহার।

মরুভূমিতেও বন আছে ?

এ কথার উত্তর দিলেন রাও সাহেব। বললেন : রাজস্থানের সবটাই তো মরুভূমি নয়। আরাবল্লী পাহাড়ের দক্ষিণে তো সবই আপনাদের মতো। অরণ্যের বেশির ভাগই আরাবল্লীর পাহাড়ী এলাকায়।

আমি বললুম : রাজস্থানের পশুপাখির কথা কিছু বলুন।

এ কথার উত্তর দিলেন কর্নেল সাহেব, বললেন : তাহলে প্রথমেই সরিস্কার কথা বলতে হয়। এই বন আলোয়ারের কাছে, দিল্লী-জয়পুর রোডের ধারে। দুশোরও বেশি বর্গ কিলোমিটার এর আয়তন। এই বনে আছে বাঘ চিতা শুয়োর এবং নীলগাই সাম্বর ও চিতল জাতের হরিণ। টুরিস্ট রেস্টহাউস আছে সরিস্কায়। এর পর কেওলাদেও খানা ভরতপুরের কাছে জলচর পাখির জন্য বিখ্যাত। শুধু স্থানীয় পাখি নয়, শীতের সময় বহু পাখি আসে বিদেশ থেকে। পেইন্টেড স্টর্ক্ ওপন বিল স্পুন বিল সাদা আইবিস ডার্টার কর্মোরাণ্ট হেরন সেরাস ক্রেন, মাইগ্রেটরি পাখির মধ্যে গিজ্ ডাক আর ক্রেন। পেলিকানও দেখা যায়। সবচেয়ে বিস্ময়কর হল সাইবেরিয়ার ক্রেন।

পাখির কথা বলতে বলতে কর্নেল সাহেবের দু চোখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রাও সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন : খানায় আপনি পাখি শিকার করেন নি ?

রাও সাহেব একটু থমকে গিয়ে বললেন : অমন সুন্দর সব পাখি !

এইবারে আমি এক অদ্ভুত নিষ্ঠুরতার আভাস পেলুম কর্নেল সাহেবের চোখে মুখে। আর তখনই মনে হল যে তাঁকে আমি চিনেছি। মাইসোরের নানা জায়গায় এই রকমেরই দৃষ্টি নিয়ে তাপ্পিকে একজন লক্ষ্য করত। দৃষ্টিতে এই রকম নিষ্ঠুরতা দেখেই আমি তাকে ঘৃণা করেছিলুম। এই বারে আমি তাঁকে আরও ভাল

করে লক্ষ্য করলুম। কেন জানি না, আমার মনে হল যে আমি ভুল করছি না। কর্নেল সাহেবও আমাকে সন্দেহ করেছেন, কিন্তু পরক্ষণেই চেপে গেছেন সেই সন্দেহের কথা।

মিস্টার সোমান্নার বোধহয় এই আলোচনা ভাল লাগছিল না। তিনি নীরবেই ছিলেন। কর্নেল সাহেবও নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন: বনে শুয়োর আর কয়েক জাতের হরিণও আছে—নীল-গাই সাম্বর আর চিতল।

তারপর বললেন: রণথম্বরও ছোট নয়, এর আয়তন দেড়শো বর্গ কিলোমিটার। এটি উদয়পুরের দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের গায়ে। এখানে হরিণের সঙ্গে বাঘ ও চিতাও আছে। হরিণের মধ্যে নীল-গাই সাম্বর চিতল ও চিনকারা। হনুমানও আছে। ছোট ছোট লেকে কচ্ছপ ও ওয়াটার বার্ডও দেখতে পাওয়া যায়।

আমার দিকে চেয়ে বললেন: জয়পুর থেকে একশো মাইল দূরে, কিন্তু সোয়াই মাধোপুর রেল স্টেশন থেকে বেশি দূরে নয়। দারা কোটার কাছে, উদয়পুরের কাছে জয়সমন্দ ও কুম্ভলগড়, রামসাগর ও বনবিহার ঢোলপুরের কাছে, আর বিকানের রোডের ধারে রতনগড়ের কাছে তাল ছাপার। তাল ছাপারে শুধু কালো হরিণ। অন্য সব বনে বাঘ ভালুক ও নানা জাতের হরিণ।

রাও সাহেব বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ছিলেন। ভাবখানা এই রকম যে এ সমস্তই তাঁর দেখা বা জানা, কুর্গের একজন কর্নেলও তাঁর দেশের খবর রাখেন বলে মনে মনে খুশী হয়েছেন।

আমি বললুম: এবারে তাহলে গুজরাতের কথা বলুন।

কর্নেল সাহেব বললেন: গুজরাতে বেশি বন জঙ্গল নেই। গির ফরেস্টে শুধু এশিয়াটিক লায়ন আছে বলে অনেকের ধারণা; কিন্তু সেখানে অন্য পশু পাখিও আছে। তার মধ্যে প্রধান হল চিতা শুয়োর নীলগাই সাম্বর চিনকারা চিতল আর চৌশিঙ্গা। চৌশিঙ্গা সম্বন্ধে একটা মজার কথা হল যে শুধু পুরুষেরই চারটে শিং থাকে,

মেয়েদের থাকে না। সিংহ আর চৌশিঙ্গা হরিণ দেখবার জন্তেই গির ফরেস্টে যেতে হয়। অক্টোবর থেকে জুন পর্যন্ত যাওয়া চলে। জুনাগড় থেকে বাস যাতায়াত করে, সসাঙ্গিরের ট্রেনেও যাওয়া যায়। সসাঙ্গিরে ফরেস্ট বাংলো আছে।

বললুম : নল সরোবরের নাম আমি শুনেছি

কর্নেল সাহেব তৎক্ষণাৎ বললেন : ওটা পাখির অভয়ারণ্য। নানা জাতের পাখি আছে—পেলিকান ফ্লেমিঙ্গো, স্টর্ক হেরন ক্রেন গুজ প্রভৃতি পাখি। আমেদাবাদ থেকে চল্লিশ মাইল দূরে বলে অনেকেই আজকাল দেখে আসছেন। বল্লভীপুরের কাছে ভেলা-ভাডারে শুধু কালো হরিণ, আর পূর্ণায় নানা রকম জীবজন্তু।

আমার দিকে চেয়ে বললেন : যদি কখনও ওদিকে যান তো কচ্ছ এলাকায় বুনো গাধা দেখতে পাবেন। সেই অভয়ারণ্যের নামই ওয়াইল্ড্ অ্যাস্ স্যাঙ্কচুয়ারি।

কর্নেল সাহেবের দৃষ্টি এখন দরজার দিকে নিবদ্ধ। তিনি এমন ভাবে বসেছিলেন যে দরজার ফাঁক দিয়ে বাড়ির ভেতরেরও খানিকটা দেখা যায়, আবার ঘাড় ফেরালেই দেখা যাবে বাহিরটা। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি মুক্তাউয়াকে দেখতে পেলুম। তিনি বেরিয়ে আসছিলেন এবং কর্নেল সাহেবকেও লক্ষ্য করেছেন দেখলুম। শাড়ির আঁচলটা সামনের দিকে টেনে নিয়ে রাও সাহেবকে বললেন : আমি বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি মামু, সময় মতো তোমরা চলে এসো।

রাও সাহেব বললেন : আমাদের তো কোন কাজ নেই, আজ আমরা এখানেই থাকি না কেন!

মুক্তাউয়া বললেন : তোমাদের ডিনার তাহলে আমি পাঠিয়ে দেব।

বলে গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন।

রাও সাহেব বললেন : বলুন তারপরে।

কর্নেল সাহেব খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন, বললেন : এবারে কোন্ রাজ্যের কথা ?

আমি বললুম : মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের কথা বাকি আছে।

হুঁ।

বলে কর্নেল সাহেব চুরট টানলেন খানিকটা, তারপর বললেন : মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশ আর এই কর্নাটক রাজ্যেই সবচেয়ে বেশি ন্যাশনাল পার্ক আর অভয়ারণ্য। একদিন আমরা হিসেব করে দেখেছিলাম যে এই তিনটি রাজ্যে ন্যাশনাল পার্কের সংখ্যা দশ, আর ওয়াইল্ড্ লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি ত্রিশেরও বেশি। এদের নাম আর কোন্ অরণ্যে কী পশুপাখি আছে তা মনে রাখা সত্যিই সম্ভব নয়।

বললুম : কিছু বলুন।

কর্নেল সাহেব বললেন : মহারাষ্ট্রে ন্যাশনাল পার্ক চারটে— বরিভ্লি নবেগাঁও পেঞ্চ ও তাড়োবা। বরিভ্লি বম্বের কাছে এবং খুবই আকর্ষণীয় স্থান। এই অরণ্যেরই দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দু হাজার বছরের পুরনো কালহেরি কেভ্স্, তুলসি লেক ড্যাম ও ডিয়ার পার্ক। উত্তরে লায়ন সফরি। প্রথমে এর নাম হয়েছিল কৃষ্ণগিরি বা কালহেরি ন্যাশনাল পার্ক, তারপর কৃষ্ণগিরি উপবন। এখন এর নাম হয়েছে বরিভ্লি ন্যাশনাল পার্ক। বন খুব ছোট, বম্বে থেকে মাত্র বাইশ মাইল দূরে এই বন। পাহাড়ের ওপর থেকে আরব সাগর দেখা যায়। বনে বন্য জন্তু বেশি নেই। কখনও চিতা দেখা যায়, কখনও সাম্বর চৌশিঙ্গা মাউস ডিয়ার বা বুনো শুয়োর দেখা যায়। হনুমান অনেক, আর নানা রকমের পাখি। নবেগাঁও ও পেঞ্চ খুব পরিচিত নয়, কিন্তু তাড়োবার নাম আছে। একশো বর্গ কিলোমিটারের বেশি এই অরণ্যের আয়তন। চন্দ্রপুর রেল স্টেশনের কাছে এই অরণ্যে আছে চিতা গৌর শুয়োর নীলগাই সাম্বর চিতল ও হনুমান। তাড়োবা লেকে কুমীর ও পাখি আছে নানা জাতের।

মুক্তাউয়া চলে যাবার পর থেকেই মিস্টার সোমান্না উসখুস করছিলেন। কর্নেল সাহেব তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন: আমাদেরও বিয়ে বাড়ি যেতে হবে।

কর্নেল সাহেব বললেন: তাহলে আজ এই পর্যন্তই থাক।

রাও সাহেব বললেন: থাকবে কেন, বাকিটা সংক্ষেপে শেষ করুন।

আমি বললুম: সেই ভাল।

কর্নেল সাহেব বললেন: মধ্যপ্রদেশের তিনটি ন্যাশনাল পার্কের নাম কান্‌হা বান্ধবগড় ও শিবপুরী। কান্‌হা দুদিক থেকেই যাওয়া যায়—জবলপুর থেকে, আবার নাগপুর থেকেও। গোণ্ডিয়া স্টেশনে নেমেও যাওয়া যায়। চারটে রেস্টহাউস আছে কান্‌হায়। আর একটা কিস্‌লিতে। বনের দৃশ্য খুব সুন্দর। আড়াই শো বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এই অরণ্য। এই অরণ্যে এখন মাত্র একশোটি বড়াশিঙ্গা হরিণ আছে। বাঘ চিতা হায়না গৌর শুয়োর চিতল ও কালো হরিণও আছে। পাখির মধ্যে আছে কালো আইবিস ভালচার ও সার্পেণ্ট ঈগল। বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্ক পুরনো রেওয়া রাজ্যে। সাদা বাঘ একমাত্র এই বনেই দেখা যায়।

শুধু সাদা বাঘ? আর কোন জন্তু জানোয়ার নেই?

কর্নেল সাহেব বললেন: বনে আরও জন্তু আছে—বাঘ চিতা ভালুক গৌর শুয়োর সাম্বর চিতল কাকার এ সবও আছে। সাদা বাঘ দেখা যায় কচিৎ। শিবপুরী যেতে হয় গোয়ালিয়র থেকে। বাঘের জন্যে বিখ্যাত হলেও এই বনে সব রকমের হরিণ দেখতে পাওয়া যায়। বড়াশিঙ্গাও আছে। আর লেকে আছে নানা জাতের পাখি।

রাও সাহেব বললেন: শুধু পাখির অভয়ারণ্যও অনেক আছে শুনেছি।

কর্নেল সাহেব বললেন: আছে বৈকি। ওয়াটার বার্ড

স্যাঙ্কচুয়ারি প্রায় সব রাজ্যেই আছে। অন্ধ্রে আরেডু পেলিকান্রি, গুজরাতে নল সরোবর, আমাদের কর্নাটকে রঙ্গনাতিট্টু, তামিলনাড়ুতে ভেডালথাঙ্গান ও পয়েণ্ট ক্যালিমিয়ার, রাজস্থানে কেওলাদেও ঘানা, উড়িষ্যায় চিল্কা লেক। এ ছাড়াও পাখি আছে আসামের কাজিরঙ্গা ও মানসে, হরিয়ানার সুলতানপুরে, কেরালার পেরিয়ারে, মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে এবং মহারাষ্ট্রের বরিভ্লি ও তাড়োবায়। আর সমুদ্রের পাখি দেখতে হলে আপনাদের লাক্ষা দ্বীপে যেতে হবে, তার প্রধান শহর কাভারত্তি থেকে পনেরো মাইল দূরে পিতি দ্বীপে। সেখানে জনমানব নেই, শুধু পাখি আর তাদের ডিম।

এই সব কথার শেষ নেই ভেবে মিস্টার সোমান্না উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কর্নেল সাহেব হয়তো আরও কিছু বলতেন। কিন্তু আমরা নীরব রইলুম দেখে বললেন: আজ উঠি তাহলে।

বলে তিনি উঠে দাঁড়াতেই আমি উঠে পড়লুম এবং তাঁদের গাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলুম।

মিস্টার সোমান্না বললেন: কাল আবার দেখা হবে!

আমি হাসবার চেষ্টা করে বললুম: নিশ্চয়ই।

বাহিরে অন্ধকার তখন গভীর হয়েছে।

২৬

রাতে আমার ঘুম আসছিল না। কর্নেল সাহেবের মুখখানা আমার বারে বারে মনের সামনে ভেসে উঠছিল, আর আমি সেই মুখের সঙ্গে আর একটি মুখের মিল খুঁজছিলুম। সেই লোকটার কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। মাইসোরের রিটায়ারিং রুমে সেদিনও আমার ঘুম আসছিল না। ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় এসে পায়চারি করেছি অর্থহীন ভাবে। আশঙ্কা ছিল যে লোকটাকে বারান্দায় দেখতে পাব; কিন্তু কিছুই দেখতে পাই নি। আমার এই দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। সন্ধ্যা বেলায় আমরা যখন বেরোচ্ছিলুম, সেই লোকটা আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি দেখেছিলুম যে তাকে দেখতে পেয়েই তাপ্তি চমকে উঠল। আর কেউ দেখতে না পেলেও আমি তার ভয়ার্ত দৃষ্টি দেখেছি, দেখেছি তার দুর্ভাবনার ইঙ্গিত। শক্ত হয়ে তাপ্তি সোজা চলতে লাগল, কিছুতেই আর কোন দিকে তাকাল না। সারা রাস্তায় সে একটি কথাও বলে নি। প্রদর্শনীতে আমার কাছে ঘেঁষে চলেছে, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে চারিদিকে। আমিও রেখেছিলুম। সেই লোকটাকে আমরা দূরে দেখেছি। সে কাছে আসে নি, কথা কয় নি, কিন্তু নজর রেখেছিল আমাদের উপরে।

সকাল বেলায় নিচে নেমেই মনটা আমার বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। কঠিন তার মুখশ্রী, রুক্ষ বেশবাস, মাথার পাগড়িটাও নোংরা দেখাচ্ছিল। তার উদ্দেশ্য জানি না, কিন্তু সেটা যে ভাল নয় তা অনুমান করতে পেরেছিলুম। উদ্দেশ্য ভাল হলে এমন লুকোচুরির দরকার ছিল না, তাপ্তিও তাকে দেখে ভয় পেত না। একবার ভেবেছিলুম যে সেই লোকটাকেই চেপে ধরি, সে-ই বলুক তার উদ্দেশ্যের কথা। কিন্তু ভয় হয়েছিল, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে

পড়বে না তো! না না, তা কখনই হতে পারে না। তাপ্তির জীবনে এমন কোন দুর্ঘটনার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারব না। তবে কেন লোকটা আসে, কেন ভয় দেখায়, কেন পালিয়ে যায়!

পরদিন বৃন্দাবন গার্ডেনে আমি তার সব কথা জেনেছিলুম। সেই লোকটা সেখানেও তাকে অনুসরণ করেছিল বলেই জানতে পেরেছিলুম। তাকে দেখতে পেয়েই তাপ্তি বিদ্যুতের মতো চমকে উঠে মিলিয়ে গিয়েছিল। উত্তেজনায় আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। খানিকটা দূরে একটা গাছের আড়ালে সে সেই বিশ্রী লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। তাপ্তি যেন আগুনের শিখার মতো জ্বলছিল, আর সেই লোকটা পিছিয়ে গিয়েছিল ভয়ে। নিজেদের ভাষায় তাপ্তি তাকে কী বলছিল সে-ই জানে, আমি একটা ভীরু কাপুরুষকে দেখেছিলুম মাথা হেঁট করে চলে যেতে। তারপর তাপ্তি ফিরে এসেছিল। সেই পুরনো তাপ্তি। আগুনের শিখার মতো নয়, প্রদীপের মতো মিষ্টি ও মধুর। বিস্ময়ের আমার আর শেষ ছিল না।

এই ঘটনার পরেই তাপ্তি আমার কাছে তার দুর্ভাগ্যের কথা স্বীকার করেছিল। বলেছিল: আজ সারা দিন আপনি ওকে লক্ষ্য করেন নি, কিন্তু আমি করেছি। ওর মনে কোন দুরভিসন্ধি ছিল। আজ ও আপনাকেই খুঁজছিল। তাই ওকে একটু সাবধান করে এলাম।

তারপর বলেছিল: এখানে এসে আমি হোটেলে উঠেছিলাম। খবর নিয়ে সেও এসে সেই হোটেলে উঠল। ও জায়গাটা তেমন নিরাপদ নয় ভেবে আমি স্টেশনে চলে এলাম।

একটু থেমে বলল: ওকে আমি আগেই শেষ করে দিতে পারতাম। সে ইচ্ছাও একদিন খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। আমার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর ঠিক পরের ঘটনা। আমার কাছে এসেছিল সান্ত্বনা দিতে। সেই মুহূর্তে আমি তাকেই খুনী বলে সন্দেহ করেছিলাম। হাতে অস্ত্র থাকলে তখনই হয়তো শেষ করে দিতাম।

কিন্তু অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে আমার মত পাল্টে গেল। ভাবলাম, তাতে অনেক কেলেঙ্কারি হবে। লোকে আমার স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে এই হত্যাকে যুক্ত করে অনেক মুখরোচক কাহিনী রচনার সুযোগ পাবে। শাস্তিকে আমি ভয় পাই নি, আমি ভয় পেয়েছিলাম আমার স্বামীর বদনামের। তিনি দেবতার মতো উদার ছিলেন। তাঁর অপবাদ হলে সে পাপ আমাকে ফাঁসির পরেও পীড়া দিত। আর এই জন্যেই আমি এখনও ওকে সহ্য করি।

তাপ্তি আমাকে সেই লোকটার নাম বলে নি, তার পরিচয়ও আমি জানি না। কিন্তু আজ রাতে মার্কারার এই ঘরে নিদ্রাহীন চোখে জেগে থেকে আমার মনে হল যে কর্নেল সাহেবকে আমি চিনতে পেরেছি। অরণ্যের কথা শুনে শুনে আমি যেন এক পাকা শিকারীতে রূপান্তরিত হয়েছি। শিকারীর চোখ পশু চিনতে ভুল করে না। তাপ্তির অস্পষ্ট কাহিনী আমি মনের মতো করে চয়ন করে নিলুম।

ভোর বেলায় দরজার উপরে করাঘাত শুনেই বুঝতে পারলুম যে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমাকে জাগাতে এসেছেন। ভিতর থেকেই আমি চেঁচিয়ে বললুম : আমি জেগে আছি।

কিন্তু তাতে করাঘাত বন্ধ হল না দেখে এগিয়ে গিয়ে আমি দরজা খুলে দিলুম।

গুড মর্নিং সার।

বলে আমাকে এক পাশে ঠেলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। আমি তাঁর হাতে একটা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম দেখে আশ্চর্য হলুম। কিন্তু তিনি নির্বিকার ভাবে সেই ট্রে বেডসাইড টেবলে রেখে বললেন : মর্নিং টি।

তারপর একখানা চেয়ার টেনে এনে নিজেই চা তৈরি করতে বসলেন।

বিছানায় বসে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : ব্যাপার কী?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা ততক্ষণে এক পেয়ালা চা তৈরি করে আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন : মুক্তার হুকুম, আজ মুহূর্তের দিন সকাল থেকেই আপনাকে বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত থাকতে হবে।

ভয় পেয়ে বললুম : কলাগাছ কাটতে হবে নাকি?

কলাগাছ!

হ্যাঁ, মিস্টার সোমান্না কী একটা অনুষ্ঠানের নাম করেছিলেন—ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে এক সারি কলাগাছ কচুকাটা করতে হবে।

সোমান্না তাই বলেছিল নাকি! গ্র্যাণ্ড্ আইডিয়া!

বলেই মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হা-হা করে হেসে উঠলেন।

আমি ভয় পেয়ে গেলুম। মনে হল যে এ কথা না বললেই যেন ভাল হত। তাই মুক্তাউয়ার কথা বললুম : মিসেস চাঙ্গাপ্পা কী বলেছেন জানেন! এসব অসভ্য বর্বর প্রথা আমার জন্যে নয়! এই সাব্জেক্ট রিওপেন করলে আপনাকে বিপদে পড়তে হবে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তাঁর চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন : ভয় যখন আপনার যায় নি, তখন মনে হচ্ছে যে সাবজেক্টটা এখনও ওপেন আছে।

এখন দেখছি যে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছি। কিন্তু সে ভাব গোপন করে বললুম : আসল কথাটা বলুন তো! বিয়ে বাড়িতে ঝাঁটপাট দিতে হবে নাকি?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আর একবার হেসে উঠে বললেন : সে সব কিছুই নয়। মুক্তার হুকুম, আপনি সকাল থেকে বিয়ে বাড়ির সব কাজ নিজের লোকের মতো দেখবেন। তারপর বিকেল বেলায় বাঙালী বাবুটি সেজে আমাদের সঙ্গে বরযাত্রী যাবেন কনের বাড়িতে। সকাল বেলায় এ বাড়ির মুহূর্ত দেখবেন, আর সন্ধ্যে বেলায় ও বাড়ির দম্পতি মুহূর্ত। কেউ আপনাকে সম্মান দেখাবে না, কেউ কোন কাজ করতে বলবে না আপনাকে। আপনি নিজের

চোখে সব দেখবেন, আর দরকার হলে মানে জিজ্ঞেস করবেন—

কাকে ?

মুক্তাকে।

তাঁকে কোথায় পাব ?

তাঁকে না পেলেও তাঁর এই পরম অনুগত ভৃত্যটিকে সব সময়েই পাবেন।

বলে আবার হেসে উঠলেন।

এবারে বেশ প্রকৃতিস্থ হয়ে আমি বললুম : মামাবাবু যাবেন না ?

না।

কেন ?

তাঁকে জাগানো চলবে না। তিনি নিজে থেকে জাগবেন, ময়দানে যাবেন, কসরৎ করবেন, নাহাবেন। তারপর মর্নিং টি নয়, কফি নয়, এক লোটা লস্যি বা মাঠ্‌ঠা। সকালে এর বেশি কিছু নয়।

এবারে আমার হাসবার পালা। বললুম : আমরা চলে গেলে লস্যি বা মাঠ্‌ঠা তাঁকে কে তৈরি করে দেবে ?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : মামী স্বর্গবাসী হবার পরে মামু আর কাউকে এ কাজে বিশ্বাস করেন না, কারও হাতের তৈরি লস্যি খান না। তাঁর জন্যে ফ্রিজে যে এক হাঁড়ি দই রাখা আছে, তিনি তা জানেন। সময় মতো সেটা নিজেই চার্ন করে খেয়ে নেবেন।

বললুম : খুব ভালো ব্যবস্থা তো !

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : এ হল রাজস্থানী ব্যবস্থা। দুর্দশা হল বাঙালীদেরই। ভারতে শুধু এই জাতের সব লোকই কবিতা লিখতে পারে, কিন্তু স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পেট ভরতে পারে না।

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভান করলেন। তারপর চা শেষ করে চায়ের বাসন নিয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন : আপনি রেডি হলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

আমরা যখন বিয়ে বাড়িতে এসে উপস্থিত হলুম, ধোপার কাজ তখনও শেষ হয় নি। বাড়ির ভিতরে নেল্লাকি নাড়ুবরে থেকে কল্যাণ মণ্ডপ পর্যন্ত সে সাদা কাপড়ের চাঁদোয়া টাঙাচ্ছিল। একজন তাকে স্থানীয় ভাষায় তাড়া দিচ্ছিলেন। তাই দেখে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: আমরা সময় মতোই এসে গেছি।

আমি বললুম: এখানে আপনার কোন কাজ আছে বুঝি?

আজ তো আমারই সবচেয়ে বড় কাজ। শালার বিয়ে বলে কথা!

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমি বললুম: আমাকে বোঝাবার ভার তো আপনার ওপরে! একটু বুঝিয়ে বলুন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা যেন আঁৎকে উঠলেন ভয়ে, এমনি ভাব দেখিয়ে বললেন: সর্বনাশ! ভোরবেলার কথা আপনি এখনও মনে রেখেছেন নাকি! ঘুমের ঘোরে কী বলেছিলাম, আমার নিজেরই তো মনে নেই!

ঠিক এই সময়ে মুক্তাউয়া বেরিয়ে এসে আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন। বললেন: সাত সকালে ঘুম ভাঙিয়ে বাঙালী দাদাকে ধরে আনলে কেন! তোমার কি কোন আক্কেল কখনও হবে না!

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: আহা চটছ কেন! বাঙালী দাদা জেগেই ছিলেন, তাই দেখে ওঁকে মর্নিং টি দিতে গিয়েছিলাম। বাঙালী দাদা বললেন, আমার তো কোন কাজ নেই, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তাই না বাঙালী দাদা?

বলে আমাকেই সাক্ষী মানলেন।

কিন্তু মুক্তাউয়ার দৃষ্টিতে আমি অবিশ্বাস দেখলুম। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: সত্যি বাঙালী দাদা?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমাকে কোন উত্তর দেবার সময় না দিয়ে মুক্তাউয়াকে বললেন: আর যা বলেছেন, তা তোমাকে বলা যায় না

মুক্তাউয়া আমার মুখের দিকে তাকাতেই প্রশ্ন করলেন: মুক্তাকে বলব বাঙালী দাদা ?

বলেই আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে মুক্তাউয়ার খুব কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন: বাঙালী দাদা বললেন, মুক্তাকে দেখবার জন্যে মনটা ছটফট করছে।

কথাটা আমি শুনতে পেয়েছিলুম। কিন্তু প্রতিবাদ করার প্রয়োজন হল না। মুক্তাউয়াই গর্জন করে বললেন: বাঙালী দাদা এই কথা বলেছেন, না এ তোমার নিজের কথা ?

আরে চটছ কেন! সবই যখন বুঝতে পার—

বলতে বলতে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বাড়ির ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মুক্তাউয়া আমার কাছে এসে বললেন: খুব কষ্ট দিয়েছে তো তোমাকে ? লোকটা এই রকমের অসভ্য, আর রসিকতাগুলোও বর্বরের মতো। তুমি কিছু মনে কোরো না বাঙালী দাদা!

আমি তাড়াতাড়ি বললুম: না না, আমি কিছু মনে করব কেন!

মুক্তাউয়া বললেন: তোমরা এসেই যখন পড়েছ, তখন খাটিয়ে নেব ওকে। অরুভাকে বলে ওকেই চাঙ্গাডি করে দেব।

সে আবার কী ?

ওরই ওপরে আজকের সব কাজের দায়িত্ব থাকবে। বেশ হবে তাহলে!

বারান্দায় একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন: তুমি এইখানে বসে সব কাজ দেখ বাঙালী দাদা, সময় মতো তোমাকে ব্রেকফাস্টের জন্যে ডেকে নিয়ে যাব।

বলে মুক্তাউয়া ভিতরে চলে গেলেন।

আমি দেখতে পেলুম যে কল্যাণ মণ্ডপের সাদা কাপড়ের নিচে লাল কাপড় টাঙানো হচ্ছে। তারপরে চার কোণায় কলার ছড়া নারকেল শশা আর সুপুরির ফুল ঝোলানো হল। নাপিত এল কামানোর জন্যে। খুব ঘটা করে কামানো হয়। তার জন্যে অনেক

রকমের জিনিসপত্র এল। একখানা মাছুরের উপরে রাখা হল একটা তিনপায়া টুল্। এরই উপরে বসে বর কামাবে। কিন্তু তার আগেই আমাদের ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিতে হল। তারপরে আমরা মাঝের বড় ঘরে এসে সমবেত হলুম।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বর নিয়ে এই ঘরে এলেন। বরের গায়ে গত কালের মতো সাদা পোশাক। দেয়ালের প্রদীপ প্রণাম করবার পর উপস্থিত গুরুজনদের আশীর্বাদ নিল বর। তারপর বেরিয়ে গেল কামাবার জন্য।

এক ফাঁকে মুক্তাউয়া এসে আমাকে বললেন: দেখলে তো, কেমন ভিড়িয়ে দিয়েছি। কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না, বলছিল অরুভার লোক করুক, কিংবা কোন বন্ধু। কিন্তু ভগিনীপতি হয়ে শালার কাজ ও করবে না কেন!

বললুম: ঠিকই তো।

তারপরেই মুক্তাউয়া বললেন: মেয়ের বাড়িতেও এমনি উৎসব হচ্ছে।

কিসের উৎসব?

কনে এখন চুড়ি পরবে। বোজাকর্তী তাকে চুড়ি পরাতে নিয়ে যাবে সবার সামনে।

তারপর?

সুমঙ্গলীরা স্নান করাবে। নতুন কাপড় পরে কনে আসবে কল্যাণ মণ্ডপে। তারপরে হবে বাট্টে পাঠ। আমি যাই বাঙালী দাদা, আমার ভাইকেও তো স্নান করিয়ে কল্যাণ মণ্ডপে আনতে হবে বাট্টে পাটুর জন্যে।

বলেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বাট্টে পাটু যে গান তা কল্যাণ মণ্ডপে বসে জানলুম। কিন্তু এ গান মঙ্গল পাঠের মতো বড় নয়। অল্পক্ষণ গাইবার পরেই শেষ হয়ে গেল। তারপরেই মুহূর্ত। অনুমানে বুঝতে পারলুম যে

এ ব্যাপারটা আমাদের দেশের আশীর্বাদের মতো। শুধু ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ নয়, সবাইকে উপহার দিতে হয় এই সময়ে। প্রথমে মেয়েরা আশীর্বাদ করেন, তারপর ছেলেরা। সবার আগে মায়ের আশীর্বাদের কথা, কিন্তু তাঁর বদলে অন্য এক মহিলা সোনার মোহর দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মুক্তাউয়াকেও আমি আশীর্বাদ করতে দেখলুম।

ছেলের বাবা যখন আশীর্বাদ করতে উঠলেন, তখন আমি ঘেমে উঠলুম। শুধু আত্মীয়রাই তো নয়, বন্ধু বান্ধবরাও আশীর্বাদ করবেন। অলঙ্কার টাকা পয়সা জিনিসপত্র যার যা খুশি। আমার সঙ্গে কিছুই নেই, কিছুই আনি নি আমি। উপহারের কথাটা আমার জেনে নেওয়া উচিত ছিল। এখন তাহলে সবার সামনে অপদস্থ হতে হত না।

কিন্তু জনকয়েক আশীর্বাদ করবার পরেই আমি একটা কোম স্পর্শ অনুভব করলুম হাতে। মুখ ফিরিয়েই মুক্তাউয়াকে দেখলুম। ছোট একটা মুদ্রা আমার হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন: এই পানা দিয়ে আশীর্বাদ কোরো।

পরে জেনেছিলুম যে কুর্গের এক পানা আমাদের কুড়ি পয়সার সমান। এতেই নিয়ম রক্ষা হয়। নিয়ম রক্ষা করতে পেরে মুক্তাউয়াকে আমি মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিলুম।

আশীর্বাদের পর আবার গান হল। গানের পর ডাক পড়ল খাবার। আহারের পর মেয়েদের ভারি ব্যস্ত দেখলুম। পোলিয়া নামে তত্ত্ব যাবে কনের বাড়ি। অরুভার পরিবারের একজন সুমঙ্গলী এই তত্ত্ব নিয়ে যাবেন। গাড়ি এল কিন্তু তত্ত্ব দেখে আমি আশ্চর্য হলুম। সুন্দর কাজ করা একটি ঝুড়ি, তার মধ্যে চাল নারকেল গুড় পান সুপুরি ও একপাত্র দুধ। দম্পতি মুহূর্তের সময় কনে এই দুধ খাবে।

রাও সাহেব কখন এসেছিলেন আমি দেখতে পাই নি। এইবারে

তিনি কাছে এসে বললেন: বিকেলে তো আবার বেরোতে হবে! চল একটু বিশ্রাম করা যাক।

বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পাকে ডেকে আনলেন। আমরা ফিরে এলুম।

বিকেলে রাও সাহেব তাঁর রাজস্থানী পোশাক পরলেন। জরির আচকানের উপরে জরির টুপি, পায়ে জরির নাগরা। গোঁফে আতর মাখলেন। মিস্টার চাঙ্গাপ্পাও তাঁর নিজের দেশের পোশাক পরলেন। আমার এসব কিছুই নেই। সুট পরবার ইচ্ছা হল না। সুটকেসের নিচের দিকে একখানা ধুতি ও পাঞ্জাবি ছিল। তাই বার করে পরে নিলুম, আর পায়ে একজোড়া চটি। আমার মুখে গোঁফ নেই, মাথায় নেই পাগড়ি। নিজেকে অত্যন্ত বেমানান হচ্ছে ভেবে গরম চাদরখানা ভাঁজ করে কাঁধে ফেললুম। তবু একটু ভারিক্কি দেখাবে। তা না হলে এদের সঙ্গে বরযাত্রী মানাবে কেন!

আমার সাজ দেখে সবচেয়ে খুশী হলেন মুক্তাউয়া, বললেন: বাঙালী দাদাকে খুব ভাল মানিয়েছে।

সেন্টের শিশি এনে আমার গায়ে খানিকটা স্প্রে করে দিয়ে গেলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে আমরা যাত্রা করলুম। অনেকগুলো গাড়ি ছিল। যত ছেলে, মেয়েও তত। কনের জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্যে চাকররাও তৈরি হয়েছে। বরকে নিয়ে ঘোরানো হল খানিকক্ষণ— ঠাকুর ঘর থেকে মাঝের বড় ঘর, তারপরে যেখানে বলে বিরুড়ু হয়েছিল সেখানে। সব জায়গায় প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে হবে।

পুরাকালে বরযাত্রীদের অনেক সময় লাগত। যে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবে, সেখানেই দাঁড়াতে হত বলে বিরুড়ুর জন্যে। এখন শুধু কনের বাড়িতে। তারপর কিছু স্ত্রী-আচারও আছে। অল্প সময়েই আমরা কনের বাড়িতে পৌঁছে গেলুম।

সেখানে এক ঝুড়ি খৈ কলা আর নারকেল এল। একজন নারকেল ভাঙলেন। তারপর আমরা চা পেলুম।

বাড়ির মাঝের ঘরে হল দম্পতি মুহূর্ত। বর কনে পাশাপাশি বসল ছুটো তিনপায়ার টুলে। সবাই টাকাকড়ি ও উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বাইরে বাজনা বাজছিল, তার সঙ্গে গান। গান মানে কবিতার মতো সুর করে কিছু পাঠ। তাতে নাকি বিয়ের ঘটনাই বলতে হয়।

বরের বাবা আশীর্বাদ করলেন সবার শেষে। তাকে বলে পালায়া পালা। তারপরে সম্বন্ধ কোড়ুপো। এই অনুষ্ঠানে নাকি কনেকে বরের বাড়ির সব অধিকার দেওয়া হয়। ছু পক্ষের লোকেই নানা প্রশ্নোত্তর করে এই ব্যবস্থা স্থির করে দিলেন। কিন্তু দোভাষীর অভাবে আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না।

অনুষ্ঠানের শেষ নেই। একটার পর আর একটা। তার নানান খুঁটিনাটি নিয়ম। প্রত্যেকটি নিয়ম মানতে হবে। সেই সব ঠিক মতো হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য বুড়ো-বুড়িরা আছেন।

ভোজ খাবার পরে রাও সাহেব বললেন: বাড়ি ফিরবেন, না এখানেই থাকবেন?

বললুম: ফিরতে পারলে তো ভালই হত, কিন্তু বিয়ে কি শেষ হয়েছে!

রাও সাহেব বললেন: এইবারে বর কনে কী পেয়েছে তা দেখা হবে। তার সাক্ষী থাকতে তো চান না, তাহলে এই সময়েই কেটে পড়ি। আরও গান আছে, গানের পর বাসর।

বলে রাও সাহেব আমাকে যেন ভয় দেখালেন। আর কোথা থেকে একজনকে ধরে এনে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে বললেন। তাঁর সঙ্গে আমিও ফিরে এলুম।

২৭

আমার দু চোখ ভরে বোধহয় ঘুম নেমেছিল। ঘুমের ঘোরেই মনে হল যে কেউ আমায় ডাকছে। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়লুম, ঘরের বাতি না জ্বেলেই খুলে দিলুম দরজা। আর সামনে অপরূপ সাজে মুক্তাউয়াকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলুম।

ঘরের ভিতরে এসে মুক্তাউয়া বললেন: আমাকে না বলেই তুমি চলে এসেছিলে বাঙালী দাদা?

বললুম: আসবার সময় তোমাকে আমি দেখতে পাই নি যে!

মুক্তাউয়া আমার বিছানার এক পাশে বসে বললেন: তুমি চলে এসেছ, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় নি। তাই তোমাকে খুঁজে না পেয়ে আমিই চলে এলাম।

একা!

হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

বললুম: এই তো, আমি জেগেই আছি।

তবে অমন চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন?

বলে আমার একটা হাত ধরে পাশে বসিয়ে দিলেন।

অন্ধকারে সমস্ত শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। রাত কত হয়েছে জানি না। রাও সাহেব নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর মুক্তাউয়া একা এসেছেন আমার কাছে। আমি তাঁর দেহের উত্তাপ পাচ্ছি, শব্দ পাচ্ছি নিঃশ্বাসের। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকবার পর মুক্তাউয়া বললেন: আজ আমার কথা তোমার একবারও মনে হয় নি বাঙালী দাদা?

মনে হয়েছে বৈকি।

কিন্তু আমি তোমার কাছে একবারও আসতে পারি নি।

কেন ?

একটা না একটা কাজে আটকা পড়ে গিয়েছি। সীতারা হাসা-হাসি করেছে এই নিয়ে। কিন্তু ওরা আমার কথা বুঝবে কেন! ওরা ওরা—

কথাটা শেষ করতে পারলেন না মুক্তাউয়া। অন্ধকারেও মনে হল যে তাঁর দু চোখ বুঝি জলে ছলছল করছে।

সহসা এক অদ্ভুত ভয় আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। ঘর অন্ধকার, কিন্তু দরজা খোলা আছে। আর এই রাতে আমরা দুজনে পাশাপাশি বসে আছি এই ভাবে, কথা বলছি। আমাদের কথা শুনতে পেয়ে যদি রাও সাহেব এসে পড়েন, কিংবা মুক্তাউয়ার খোঁজে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা! অথবা এ বাড়ির কোন চাকর বা আর কেউ! কী ভাববে তারা! আমাকে কি নির্দোষ ভাববে! কোডাভাদের চরিত্র আমি জানি না। কিন্তু তাদের কোমরে একটা খোলা দা সারাক্ষণ ঝুলতে দেখি। বন্দুকও দেখি অনেকের হাতে। ভুল বুঝেও কেউ আমার উপরেই তার ব্যবহার তো করে বসবে না! ভয়ে হিম হয়ে গেল আমার দেহ। কোন রকমে বললুম : কাল তো তোমার কাজ নেই, কাল সকালে তোমার সঙ্গে অনেক কথা কইব।

মুক্তাউয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : তার তো অনেক দেরি!

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম : এখন আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

মুক্তাউয়া কোন কথা না বলে নিঃশব্দে কাটালেন খানিকক্ষণ। আর আমি কী করব তা ভেবে পেলুম না। উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দেব, না বাতিটা জ্বেলে দেব ঘরের! ঠিক এই ভাবে বসে থাকতে আমার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে উঠছিল।

এক সময়ে মুক্তাউয়া বললেন : আচ্ছা বাঙালী দাদা, তুমি তো প্রকৃতির রূপ দেখতে খুব ভালবাস, তাই না ?

বললুম : তা তো সবাই বাসে

আমার মনে হয়, তোমার চেয়ে বেশি আর কেউ ভালবাসে না।

আমি ঘেমে উঠছিলুম, বললুম : হয় তো তাই।

হয় তো কেন, নিশ্চয় বল।

ঠিক এই সময়ে আমি বাহিরে একখানা গাড়ির শব্দ পেয়ে লাফিয়ে উঠলুম। মুক্তাউয়া আমার হাত চেপে ধরে বললেন : যাচ্ছ কোথায় ?

নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিতে আমি এক মুহূর্ত দেরি করলুম না। বললুম : কে এলেন, দেখে আসি।

বলে আমি তৎক্ষণাৎ বাহিরে বেরিয়ে এলুম।

বারান্দার সামনে এসে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমেই মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : মুক্তা আপনার কাছে এসেছে না ?

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম : হ্যাঁ।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা সগৌরবে বলে উঠলেন : দেখলে তো সোমান্না, আমি তোমাদের ঠিক বলেছি কিনা। বাঙালী দাদা বলতে মুক্তাউয়া এখন অজ্ঞান।

বারান্দায় একটা বাতি জ্বলছিল। সেই আলোয় আমি মিস্টার সোমান্নার মুখখানা দেখতে পেলুম। চারিদিকের অন্ধকারের মতো সেই গম্ভীর মুখ থমথম করছে। গাড়ি চালাচ্ছিলেন কর্নেল সাহেব। তিনিও গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। দুজনের একজনও কোন কথা কইলেন না। আর আমিও একজন অপরাধীর মতো বলার মতো কোন কথা খুঁজে পেলুম না।

মুক্তাউয়াও বেরিয়ে এসেছিলেন। মিস্টার চাঙ্গাপ্পার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন : তুমি আমার একটা কথা রাখবে ?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বোধহয় এমন মোলায়েম অভ্যর্থনার আশা করেন নি। তাই আশ্চর্য হয়ে বললেন : তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি, আর একটা কথা রাখতে পারব না !

কাল ভোর বেলায় আমাদের তলা কাবেরী নিয়ে যাবে বল ?

তলা কাবেরী !

হ্যাঁ। বাঙালী দাদার খুব ভাল লাগবে।

কিন্তু বিয়ে বাড়িতে—

থাক বিয়ে বাড়ি।

নিদারুণ লজ্জিতভাবে আমি বললুম: সে কি ভাল দেখাবে!

মুক্তাউয়া আমাকে এক ধমক দিয়ে বললেন: সে ভাবনা তো তোমার নয় বাঙালী দাদা।

তারপর স্বামীর হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন: রাজী হতে তুমি এমন দেরি করছ কেন?

ফিরে যাবার জন্য কর্নেল সাহেব গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছিলেন। মিস্টার চাঙ্গাপ্পা তাঁর দিকে চেয়ে বললেন: এক সেকেণ্ড।

তারপর মিস্টার সোমান্নাকে বললেন: তুমি ওদের জানিয়ে দিও যে আমরা কাল ভোর বেলায় তলা কাবেরী যাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসে দেখা করব।

ওকে।

বলে গম্ভীর মুখে মিস্টার সোমান্না বেরিয়ে গেলেন গাড়ি নিয়ে। আর মুক্তাউয়া তাঁর স্বামীর হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন: এই জন্যেই তোমাকে এত ভালবাসি।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পাও হেসে বললেন: দেখছেন তো বাঙালী দাদা, সবই স্বার্থের সম্বন্ধ। রাজী না হলেই তালাক দিয়ে দিত।

তারপর বললেন: আর দেরি নয়, শুয়ে পড়ুন তাড়াতাড়ি। কালও আমাদের ভোরে উঠতে হবে।

বলে আমার ঘরের দরজায় পৌঁছে দিয়ে বলে গেলেন: আপনি সত্যিই ভাগ্যবান!

অন্ধকার কিছুটা স্বচ্ছ হবার পরই আমরা যাত্রা করলুম। মুক্তাউয়া আমাদের মর্নিং টি খাওয়ালেন, বললেন: ভাগমণ্ডলে ব্রেকফাস্ট পাওয়া যাবে।

মার্কারার পেট্রল পাম্পে ট্যাঙ্ক ভরে নেবার সময় আমি জিজ্ঞাসা করলুম : কতটা পথ আমাদের যেতে হবে?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : মাত্র পঁচিশ মাইল। পৌঁছতে এক ঘণ্টাও সময় লাগবে না।

তাহলে তো এই বেলাতেই ফিরে আসতে পারব!

এ কথার উত্তর মিস্টার চাঙ্গাপ্পা একটু কায়দা করে এড়িয়ে গেলেন। বললেন : জায়গাটা ভাল লাগলে তাড়াতাড়ি ফিরবেন কেন! পাহাড়ের নিচে রেস্টহাউস আছে, ওপরেও আছে রেস্টহাউস। ইচ্ছা করলে রাত্রিবাসও করতে পারবেন।

এটা মিস্টার চাঙ্গাপ্পার নিজের মত বলে আমার বিশ্বাস হল না। মনে হল যে তিনি মুক্তাউয়ার মর্জির কথা ভেবেই এই প্রস্তাব করলেন। কিন্তু মুক্তাউয়া কোন উত্তর দিলেন না।

মার্কারা শহরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আমরা মাইসোরের পথ না ধরে আরব সাগরের তীরে ম্যাঙ্গালোরের পথ ধরলুম। এই পথে মাইল দুয়েক যাবার পরেই বাঁ হাতে অন্য পথ আমাদের ধরতে হল। এখন আমরা ক্রমাগত নিচের দিকেই নেমে চলেছি।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে আছে প্রায় হাজার মাইল বিস্তৃত পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। এর প্রাচীন নাম সহ্যাদ্রি। উত্তরে পুষ্পগিরি, ব্রহ্মগিরি দক্ষিণে। ব্রহ্মগিরির এক অংশে দক্ষিণ ভারতের প্রিয় নদী কাবেরীর উৎস। আমরা সেই উৎস তলা কাবেরী দেখতে চলেছি।

শ্যামল অরণ্যময় পথে প্রভাতের আলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। দূরে দূরে এক-একখানি গ্রাম দেখতে পাচ্ছি, আর দু-একজন মানুষ। পাহাড়ের গায়ে কফির চাষ, তার ওপর ছায়া বিস্তারের জন্য এক রকমের বড় গাছ। এলাচের বাগানেও এই রকমের গাছ আছে, তাকে ছেঁটে কেটে যতটুকু দরকার ততটুকু ডালপালা রাখা হয়। রবারের বনও দেখতে পেয়েছি।

এমনি করে আমরা অনেক নিচে নেমে এলুম। অনেকটা পথও এলুম পেরিয়ে। হঠাৎ মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমাকে বললেন : পথের ধারে এই যে বাংলোটা দেখছেন, এইটেই ভাগমণ্ডলের ইনস্পেকসন বাংলো।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম : আমরা কি তাহলে—

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা গাড়ি না থামিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন : হ্যাঁ, আমরা একুশ মাইল পথ পেরিয়ে এসেছি। ভাগমণ্ডল শহরটা পেরিয়ে চার মাইল পথ পাহাড়ে উঠতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম : কত উঁচুতে এই তলা কাবেরী ?

কত উঁচু বল তো !

বলে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা মুক্তাউয়ার দিকে তাকালেন।

মুক্তাউয়া বললেন : ব্রহ্মগিরি পাহাড় পাঁচ হাজার ফুটের বেশী বলে শুনেছি। কিন্তু তলা কাবেরী তো পাহাড়ের চূড়ায় নয়, কিছু নিচে। চার হাজার দুশো ফুটের মতো হতে পারে।

আর এ জায়গার উচ্চতা ?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : তিন হাজার ফুটের কম।

তবে আমরা কতটা নেমে এসেছি ?

আপনি কি অঙ্কের পরীক্ষা নিচ্ছেন নাকি !

গাড়ি থেকেই দেখতে পেলুম যে ভাগমণ্ডল একটা ছোট শহর। বাড়ি ঘর দোকান পাট স্কুল ও কোন একটা ট্রেনিং সেণ্টারও আছে। বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে এই সেণ্টারের দোতলা বাড়ি। কিন্তু আমরা কোথাও দাঁড়ালুম না। শহর পেরিয়ে এসে মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : ভাগমণ্ডলও একটা তীর্থস্থান জানেন! তীর্থযাত্রী হলে এখানকার লক্ষ্মণ তীর্থে আপনাকে স্নান করতে হত। ত্রিবেণী সঙ্গম।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : তিনটে নদীর সঙ্গম !

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : কাবেরীর সঙ্গে এখানে আরও দুটো নদী মিলেছে—কণক আর সুজ্যোতি।

এক জায়গাতেই তিনটে নদী!

আপনাদের প্রয়াগে কটা নদী?

বললুম: শুধু গঙ্গা আর যমুনা, সরস্বতী মাটির নিচে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা হেসে বললেন: এখানেও তাই। কণক এসে কাবেরীতে মিলেছে, সুজ্যোতি মাটির নিচে। এ সব নিয়ে অনেক গল্প আছে, ওপরে কোন তীর্থযাত্রী পেলে জেনে নেবেন।

ভাগমণ্ডল থেকেও একটা পথ বাঁ দিকে ম্যাঙ্গালোরের দিকে গেছে। কিছু দূর এগিয়ে সেই পথ মার্কারা-ম্যাঙ্গালোর সড়কে মিলেছে। আমরা সে পথে না গিয়ে সোজা পথে নদীর পুল পেরিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলুম। অনেক দূর উঠে এক জায়গায় ভিউ পয়েন্ট দেখলুম। তার পরে পৌঁছে গেলুম কতকটা সমতল জায়গায়। পথের ধারে একটা আশ্রম তৈরি হয়েছে নতুন। তারই সোজাসুজি খানিকটা এগিয়েই পথের শেষ। এখান থেকে পাহাড়ের চূড়া আরও কয়েক শো'ফুট উঁচুতে।

ঐখানে গিয়ে আমরা গাড়ি থেকে নামলুম। তারপর কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে একটা কুণ্ডের বাঁধানো চত্বরে পৌঁছে গেলুম। এক কাঠার মতো মাপের একটি চতুষ্কোণ কুণ্ড, তার এক একটা ধার হাত বিশেক মতো মাপের। চারটি ধারই বাঁধানো এবং ধাপে ধাপে সিঁড়ি জল পর্যন্ত নেমে গেছে। তিনটি ধার রেলিঙ দিয়ে ঘেরা, মন্দিরের দিকটা খোলা।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মুক্তাউয়া আমাকে কাপড় গামছা নিতে বলেছিলেন। এখানে পৌঁছে আমরা সেই কাপড় গামছা হাতে নিয়েই গাড়ি থেকে নেমেছিলুম। মুক্তাউয়া বললেন: আগে আমরা এই কুণ্ডের জলে স্নান করব, তারপর অন্য কাজ।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা এ কাজে রাজী ছিলেন না, বললেন: আমি ঐ ছায়ায় বসে আছি, তোমরা পুণ্য সঞ্চয় কর। তাতেই আমি উৎরে যাব।

বলে একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে বসে পড়লেন।

মুক্তাউয়া বললেন : সেই ভাল। তুমি এখানেই বসে থাকো।

বলে আমাকে নিয়ে কুণ্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন।

এক জায়গায় আমি কয়েকজন যাত্রীকে স্নান করতে দেখলুম। স্ত্রীপুরুষ এক সঙ্গে স্নান করছে। কুণ্ডের বাঁ দিকে একটা লম্বা পাকা ঘর বোধহয় নতুন তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে মালপত্র রেখে যাত্রীদের বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। কাপড় বদলে ভিজে জামা কাপড় নিয়ে কয়েকজনকে বেরিয়ে আসতে দেখেই বুঝতে পারলুম যে স্নানের পরে এখানে কাপড় বদলাবার জন্য প্রয়োজনীয় আড়াল আছে। যাত্রীরা রেলিঙের ওপরে কাপড় শুকিয়ে নিচ্ছেন।

মুক্তাউয়াকে আমি বললুম : এই কুণ্ড থেকেই কি কাবেরীর উৎপত্তি হয়েছে?

মুক্তাউয়া হেসে বললেন : না।

তবে ;

স্নানের আগেই তা দেখতে চাও নাকি! তবে এসো আমার সঙ্গে।

বলে একটা ছোট মন্দিরের কাছে আমায় নিয়ে গেলেন। হাত দুই উঁচু একটা চালার মতো ঘর, একটা ছোট দরজার সামনে হেঁট হলে ভিতরটা দেখতে পাওয়া যায়। কাবেরীর মূর্তি বস্ত্র অলঙ্কার ও ফুল দিয়ে ঢাকা। এরই সামনে মন্দিরের ঠিক বাইরেই আর একটি চার কোনা ছোট কুণ্ড বোধহয় হাত খানেক লম্বা ও চওড়া। কুণ্ডের জল ঢাকা পড়েছে ফুল ও পাতায়। এই কুণ্ড দেখিয়ে মুক্তাউয়া বললেন : কাবেরীর উৎস হল এই কুণ্ডে। কিন্তু কোথা থেকে জল আসছে কেউ তা বলতে পারে না। এই জলই আবার বড় কুণ্ডে যাচ্ছে, কোথা দিয়ে যাচ্ছে তাও দেখতে পাওয়া যায় না।

বললুম : ভারি আশ্চর্য তো!

মুক্তাউয়া বললেন : তার চেয়েও আশ্চর্য হল যে এই বড় কুণ্ডের

জল কোন্ পথে নিচে নেমেছে তাও এখানে দেখতে পাওয়া যায় না। পাহাড় থেকে কোন জলধারা নিচে নামে নি, কোন্ সুড়ঙ্গ পথে জল নামছে তা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

তারপরেই বললেন: জলে নামতে তোমার ভয় করবে না তো?

ভয় কিসের!

মুক্তাউয়ার সুন্দর মুখ হাসিতে ভরে গেল। বললেন: কাল রাতে তো তোমার মুখে আমি ভয় দেখেছি! কেন ভয় পেয়েছিলে বল তো?

এ কথার উত্তর দিতে আমি পারলুম না। সত্য কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ মুক্তাউয়ার মতো মেয়েকে মিথ্যা বলাও চলে না। তাই বললুম: এসো, রোদ চড়া হবার আগেই স্নানটা আমরা সেরে নিই।

বলে জলে নামবার জন্য তৈরি হয়ে নিলুম। আর মুক্তাউয়া কোন কথা না বলেই জলে নেমে পড়লেন। এক কোমর জল। সেই জলে দাঁড়িয়ে খুব আনন্দ করে আমরা দুজনে স্নান করলুম। শীতল জল। কিন্তু শীতবোধ আমাদের হল না। অনেক ছেলেমানুষি করলেন মুক্তাউয়া। জলে নেমেই আমার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিয়েছিলেন মুক্তাউয়া। তারপরে তাঁর কাছাকাছি আসতেই জলে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। যেন আমাদের কত কালের পরিচয়, এমন ভাবে হাসিখুশির কল্লোলে নিমগ্ন হয়ে অনেকক্ষণ ধরে আমরা স্নান করলুম।

মুক্তাউয়া কাপড় বদলাতে আড়ালে চলে গেলেন, আর আমি সামনেই সেই কাজ সেরে নিলুম। ফিরে এসে মুক্তাউয়া বললেন: এইবারে শিবের মন্দিরে চল।

পাশাপাশি দুটি মন্দিরে আছেন গণেশ ও শিব। আর একটি ঘরে পূজারীর বাস। মুক্তাউয়া আজ বাঙালী মেয়ের মতো করে শাড়ি পরেছেন। গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করলেন অনেকক্ষণ

ধরে। তারপরে প্রসন্ন মনে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন: ভাল লাগছে না বাঙালী দাদা?

বললুম: খুব ভাল লাগছে।

মুক্তাউয়া এবারে মিস্টার চাঙ্গাপ্পার কাছে এসে বললেন: অনেকদিন পরে আজ খুব ভাল লাগছে আমার।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: ভাল জায়গায় এলে ভাল লাগবেই তো!

উঠবে ঐ পাহাড়ের মাথায়?

বলে মুক্তাউয়া ব্রহ্মগিরি শিখরের দিকে তাকালেন।

ভয় পেয়ে আমি বললুম: না না, আজ থাক।

মুক্তাউয়া খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন: ভয় পেয়েছে বাঙালী দাদা। তাহলে তো জোর করেই ধরে নিয়ে যেতে হয়, কী বল?

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: ঠিক বলেছ। তোমাদের ভিজে জামাকাপড় গাড়িতে রেখে ঐ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠি চল।

কিন্তু আমার মুখের দিকে চেয়ে মুক্তাউয়া বললেন: না না, ভয় দেখিও না বাঙালী দাদাকে। খালি পেটে তাঁকে অত পরিশ্রম করতে বোলো না।

ফেরার পথে জানতে পারলুম যে আশ্রমের কাছ থেকেই আর একটা পথ ঘুরে গেছে পাহাড়ের অন্য দিকে। একটা ছোট ফরেস্ট বাংলো আছে সেদিকে। চমৎকার জায়গা। এই সব সুন্দর জায়গায় এক রাত কাটাতে পারলে স্মৃতির ভাণ্ডারে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু আমরা সোজা নেমে এলুম ভাগমণ্ডলে। একটা দোকানে ঢুকে ব্রেকফাস্ট খেয়ে পুরনো পথ ধরেই ফিরে এলুম। আকাশের সূর্য তখনও মাথার উপরে উঠতে পারে নি।

২৮

মিস্টার চাঙ্গাপ্পার বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমেই আমি একটা ঝড়ের সঙ্কেত দেখলুম। বারান্দায় গম্ভীর মুখে বসে আছেন মুক্তাউয়ার বাবা, তাঁর পাশে রাও সাহেব। খানিকটা তফাতে মিস্টার সোমান্না ও কর্নেল সাহেব।

মুক্তাউয়া তাঁর বাবাকে দেখে কলহাস্যে উচ্ছলিত হয়ে উঠলেন। যা বললেন তার এক বর্ণও আমি বুঝতে পারলুম না। কিন্তু তাঁর বাবা গম্ভীর মুখে যা বললেন, তা শুনে মুক্তাউয়ার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন: বসুন।

মুক্তাউয়া ভিতরে চলে গেলেন। আর মিস্টার সোমান্না আমাকে তাঁর চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়ে মিস্টার চাঙ্গাপ্পার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি বসতেই মুক্তাউয়ার বাবা বললেন: আপনি কি এখান থেকে উটিতে ফিরবেন, না ম্যাড্রাসে?

বললুম: উটিতে আমার কোন কাজ নেই। আমি এখান থেকে সোজা কলকাতায় ফিরতে চাই।

এ কথার উত্তর দিলেন রাও সাহেব, বললেন: খুব ভাল কথা। আজ লাঞ্চের পর আমি ব্যাঙ্গালোরে যাচ্ছি ট্রেন ধরতে। আপনি কি আসবেন আমার সঙ্গে?

সবার মুখের দিকে চেয়ে আমার মনে হল যে এটা তাঁদের প্রশ্ন নয়, এ হল আদেশ, আমার উপরে এই আদেশ জারি করবার জন্যই এঁরা এখানে সমবেত হয়ে অপেক্ষা করছেন। গত রাত্রির কথাও আমার মনে পড়ে গেল। অনুমান করতে অসুবিধা হল না যে মিস্টার

সোমান্না ও কর্নেল সাহেবের মারফৎ একটা মুখরোচক ঘটনা এখানে চালু হয়ে গেছে এবং তারই একটা প্রতিকারের উপায় হিসেবে আমাকে আজই দুপুরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি তাই কোন দ্বিধা না করে বলে উঠলুম : এ তো খুব আনন্দের কথা। আপনার যদি কোন অসুবিধা না হয় তো এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আমি ভাবতেও পারি না।

খুশী হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মুক্তাউয়ার বাবা বললেন : তাহলে এই ব্যবস্থাই পাকা করছি।

বলে তিনি উঠে পড়লেন। মিস্টার সোমান্না অত্যন্ত মৃদু স্বরে কথা বলছিলেন মিস্টার চাঙ্গাপ্পার সঙ্গে, আর কর্নেল সাহেব নিঃশব্দে বসে ছিলেন। মুক্তাউয়ার বাবাকে উঠতে দেখে দুজনেই তাঁকে অনুসরণ করলেন। গত রাত্রির সেই গাড়িতেই তাঁরা এসেছিলেন, ফিরে গেলেন সেই গাড়িতে। মিস্টার চাঙ্গাপ্পাও বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

আমি বসে রইলুম রাও সাহেবের সামনে। তিনি একটু সহজ হবার চেষ্টা করে বললেন : তলা কাবেরীর তীর্থ কেমন লাগল ?

সংক্ষেপে বললুম : ভাল।

ভদ্রলোক বললেন : শুনেছি, কুর্গের সবচেয়ে বড় তীর্থ। তবে উৎসব হয় তুলা সংক্রান্তিতে।

এ কথার উত্তর আমি দিলুম না। আমার মন এখন অবসন্ন মনে হচ্ছে। নিজেকে অপমানিতও বোধ করছি।

তবু রাও সাহেব থামলেন না, বললেন : জায়গাটা নাকি খুব সুন্দর। এর পর এদেশে আসার সুযোগ হলে আমিও একবার ঘুরে আসব।

বুকে একটা যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল, বেদনায় টনটন করছিল গলা। এখান থেকে উঠে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু কতকটা জোর করেই আমি বসে রইলুম।

দুপুরের আহার আমার মুখে রুচল না। মুক্তাউয়া আমার সামনে বেরোলেন না, বিশাখা আমাদের পরিবেশন করে খাওয়ালেন।

আমি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাহিরের বারান্দায় বসে যাত্রার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। আমার মনে হচ্ছিল যে এর চেয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিলে আমার কম অপমান হত। এর জন্য হয়তো মুক্তাউয়াই দায়ী, কিন্তু আমার মন তাকে কোনমতেই দায়ী ভাবতে চাইল না। তার কথায় ও ব্যবহারে, তার দৃষ্টি ও আচরণে কোন অসঙ্গত ইঙ্গিত আমি দেখতে পাই নি। তার সামনে আমার ভয় করেছে ঠিকই, কিন্তু কোন সময়েই আমার মন অপবিত্র হয় নি। কোন্ যুক্তিতে আমি তাকে এই অপমানের জন্য দায়ী করব!

যথা সময়ে কর্নেল সাহেব এলেন মিস্টার সোমান্নাকে নিয়ে তাঁর অ্যামবাসাডার গাড়িতে। গাড়ি থেকে নেমেই মিস্টার সোমান্না বললেন: আপনি তৈরি আছেন?

আমি সংক্ষেপে বললুম: হ্যাঁ।

রাও সাহেব?

তাঁর কথা জানি নে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বেরিয়ে এসে বললেন: মামুকে তৈরি হতে বল।

এ বাড়ির আবহাওয়া এখন থমথম করছে। সহজ ভাবে কেউই কিছু করতে পারছেন না, কথা বলতেও পারছেন না সহজ ভাবে। কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পা আমার কাছে এসে বললেন: কলকাতায় আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করব বাঙালী দাদা, তোমার ঠিকানা আমাদের দিয়ে যাও।

বলে নিজের নোট বুকে আমার ঠিকানা টুকে নিলেন। তারপর কর্নেল সাহেবকে বারান্দায় উঠে আসতে দেখে আমার হাত ধরে বললেন: একটু ভেতরে আসবে?

কোন কথা না বলে আমি নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করে ভিতরে গেলুম। মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন: আড়ালে তোমাকে একটা কথা

বলব বাঙালী দাদা। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার, মুক্তার মনে কোন পাপ বোধ নেই, শিশুর মতো সরল তার মন। তাই সে যা করেছে, তা কিছু না বুঝেই করেছে। আমরা তোমাকে একটুও ভুল বুঝি নি।

এই মুহূর্তে মিস্টার চাঙ্গাপ্পাকে আমার অন্য মানুষ বলে মনে হল। সেই পরিহাসপ্রিয় উদ্দাম মানুষটার মন যে সমবেদনায় এমন কাতর হতে পারে, তার পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ের আমার সীমা রইল না। কিন্তু আমার মনের ভার তাতে একটুও নামল না। আমার দু চোখে জল ছলছল করে উঠল।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বলে উঠলেন: না বাঙালী দাদা, তোমার সেই হাসি মুখ দেখতে না পেলে আমরাও আর হাসতে পারব না!

আমার হাসি আসছিল না, তবু আমি হাসবার চেষ্টা করে বললুম: এই তো আমি হাসছি!

কিন্তু আমার হাসি যে কান্নার মতো দেখাচ্ছিল তা আমি বুঝতে পারছিলুম।

ঠিক এই সময়েই আমি রাও সাহেবকে দেখতে পেলুম। নিজের ঘর থেকে বেরিয়েই তিনি বললেন: মুক্তা কোথায়?

আমার মনে হল যে মুক্তাউয়ার কান্নার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। আমারও সজাগ দৃষ্টি তাকে অনেকক্ষণ থেকেই খুঁজছে। কিন্তু রাও সাহেবের মতো মুখ ফুটে আমি সে কথা বলতে পারি না। সে কথা আর এ বাড়িতে বলা সম্ভব নয়।

মুক্তাউয়াকে জোর করে সামনে টেনে আনলেন বিশাখা। মুক্তাউয়া দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। রাও সাহেব তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন: ছি মা মুক্তা, যাবার সময়ে কাঁদতে নেই এমন করে।

কিন্তু মিস্টার চাঙ্গাপ্পা এগিয়ে গিয়ে বললেন: এসো বাঙালী দাদা—

বলে আমাকে টেনে আনলেন সামনে।

স্বামীর কথা শুনেই মুক্তাউয়া সামলে নিলেন নিজেকে। তারপর চোখ তুলেই আমাকে দেখতে পেয়ে দু হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন: আমাদের ফেলে চলে যাচ্ছ বাঙালী দাদা।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। কোন রকমে বললুম: যেতে তো হবে ভাই।

সহসা মুক্তাউয়ার দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমাকে ছেড়ে দিয়ে তার বুকের ভিতর থেকে একটা রাখী বার করে আমার হাতে বেঁধে দিয়ে বললেন: ছোট বোনকে ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না বাঙালী দাদা, আবার আমাদের কাছে আসতে হবে।

আমি কোন কথা বলতে পারলুম না, আমার দৃষ্টি তখন জলে ঝাপসা হয়ে গেছে। মুক্তাউয়ার মাথায় একটুখানি হাত বুলিয়ে পালিয়ে গেলুম গাড়ির দিকে।

কিন্তু মুক্তাউয়া একেবারে সহজ হয়ে গেছেন। বারান্দায় বেরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন: না, কর্নেল সাহেবের গাড়িতে বাঙালী দাদা যাবেন না।

তারপর নিজের স্বামীকে বললেন: তুমি বাঙালী দাদাকে বাসে তুলে দিয়ে এসো।

কর্নেল সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। আর অসহায় ভাবে তাকালেন মিস্টার সোমান্না। মুক্তাউয়া আমার কাছে এসে বললেন: কর্নেল সাহেবকে তুমি চিনতে পারো নি বাঙালী দাদা, কিন্তু উনি তোমাকে চিনেছেন।

চিনতে পেরেছি এ কথা আমি আর বলতে পারলুম না। তাহলে তাপ্পির কথাও আমাকে বলতে হত। এঁরই জন্যে তাকে দেশ ছাড়তে হয়েছে, আর আমাকে রক্ষার কথা সেদিন তাপ্পিকেও ভাবতে হয়েছিল।

কর্নেল সাহেব মাথা নিচু করে তাঁর গাড়িতে গিয়ে বসলেন এবং

মিস্টার সোমান্নার দিকে একবার চেয়েই গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা বললেন : চলুন, আমি আপনাদের মাইসোরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

এই গল্প যদি আমার তৈরি গল্প হত তো এইখানেই তার শেষ হয়ে যেত। এর পরে আর কিছু বলার দরকার হত না। কিন্তু সত্যি গল্পে শেষের পরেও কিছু থাকে। সেই পরের কথা এবারে আমাকে লিখতে হবে।

মিস্টার চাঙ্গাপ্পা গাড়ি চালাচ্ছিলেন মিস্টার সোমান্নাকে পাশে নিয়ে। আমি বসেছিলুম পিছনে রাও সাহেবের সঙ্গে। মার্কারা ছাড়িয়ে আমরা কত দূর এসেছিলুম জানি না, হঠাৎ পাশ থেকে রাও সাহেব অত্যন্ত মৃদু স্বরে আমাকে বললেন : মুক্তার সম্বন্ধে একটা কথা আপনারা কেউ জানেন না।

আমি কোন প্রশ্ন করলুম না।

রাও সাহেব বললেন : মুক্তা আমার বোনের মেয়ে। মনটা তার মায়ের মতোই নরম হয়েছে, তাই রূঢ় কথায় তার নরম মনটা সব সময় ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই মন তারা কোথায় পেয়েছে জানেন?

জানি নে।

আমাদের মায়ের কাছে। তিনি ছিলেন বাঙালী—একেবারে খাঁটি বাঙলার মেয়ে। আমরাও তাঁর স্বভাবটা কিছু পেয়েছি, কিন্তু মুক্তার মতো খাঁটি হতে পারি নি।

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সেই দীর্ঘশ্বাসে আমি যেন একটা প্রচ্ছন্ন কান্নার শব্দ পেলুম।

॥ অরণ্য পর্ব সমাপ্ত ॥

রম্যাণি বীক্ষ্য

মানুষের নূতন দেশ দেখার বাসনা কতকটা নেশার মতো। কেউ সে সুযোগ পান, কেউ পান না, কিন্তু শখ সবারই সমান। যাঁরা ভ্রমণ করেন তাঁদের একটা সঙ্গীর দরকার, যে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য ভ্রমণ-কাহিনীই সবচেয়ে ভাল সঙ্গী। আর যাঁরা বাড়িতে বসে ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁদের কাছেও ভ্রমণ-কাহিনী অপরিহার্য। এঁদের সবার জন্য লেখা হয়েছে রম্যাণি বীক্ষ্য। পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ রচনা করে লেখক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী শুধু রবীন্দ্র-পুরস্কারেই সম্মানিত হন নি, গত কয়েক বৎসরে বাঙলার ভ্রমণ সাহিত্যকে অভাবনীয় রূপে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের একটা শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, নানা রম্যস্থান প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই অভিব্যক্তি এই রচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্যস্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক ভারত-দর্শনের কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, বর্তমানে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্যের পৌরাণিক বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্য ও তার কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ পাঠকের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু শুধু মাত্র ভ্রমণ বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে একটি জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনীও বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। ভ্রমণে যাঁরা উৎসাহী নন, জীবনে যাঁরা শুধু প্রাণরসেরই সন্ধানী, উপন্যাসের রসের আকর্ষণে তাঁরাও এই গ্রন্থের প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন। ভ্রমণ-রসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী তাঁর স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে এসেছেন। এই সময় প্ল্যাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতান ভাগ্নে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। মার্জিত রুচি ও শিক্ষায় তার আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। মামা-মামী তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানালেন, আর স্বাতির দৃষ্টিতে গোপাল আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। চলতি ট্রেনে তাকে উঠে পড়তে হল।

প্রথম গ্রন্থ অন্ধ্র পর্বে ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াড়া ও মঙ্গলগিরিতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে আমরা দুজনকে দেখি পাশাপাশি।

তামিল পর্বেও তারা একত্র আছে—মাদ্রাজ মহাবলীপুরম ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ও তানজোড়ে, ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি রামেশ্বর ও তিরুচেন্দুরে। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি

বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর **কেরল পর্বে** তাদের ঘরে ফেরার পালা। কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবেন্দ্রাম বর্কলা পেরিয়ার অভয়ারণ্য। যমজ শহর এর্নকুলম-কোচিন থেকে ত্রিচুর গুরুভায়ুর। সেখানে থেকে কালিকটে সমুদ্র দেখে নীলগিরি পাহাড়।

কর্ণাট পর্ব শুরু হয়েছে উটাকামণ্ডে। সেখান থেকে কর্ণাটক রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেকে তারা এল হায়দ্রাবাদে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি।

তারপর গোপালকে দেখা গেল দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রায় ভ্রমণরত। এই বিবরণ সঙ্কলিত হয়েছে **কালিন্দী পর্বে**। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত-পরিহাস-প্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদা বোধের আন্তরিক পরিচয়।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে মামী মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি রাজস্থান পর্বে। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমের পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল। তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের কথা আছে **সৌরাষ্ট্র পর্বে**। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্য স্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোমনাথের পথে তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি। পরবর্তী গ্রন্থ **কোঙ্কণ পর্বেও** তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক, সে তখন গোপালের সঙ্গে পুনা ও গোয়া ভ্রমণে ব্যস্ত। গুজরাতের আমেদাবাদ থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কোঙ্কণ উপকূলের কথা এই পর্বে বিবৃত হয়েছে।

তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা মাণ্ডু ইন্দোর ও উজ্জয়িনী, সাঁচী ভোপাল বিদিশা ও খাজুরাহো। এই কাহিনী পাওয়া যাবে **অবন্তী পর্বে**।

পরবর্তী তিনটি পর্বে মামা মামী ও স্বাতিরকথা স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে এসেছে মুহুর্মুহু। **উৎকল পর্বে** পুরীর সমুদ্রবেলায় ভুবনেশ্বর ও কোনারকে গোপাল ঋতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। **মগধ পর্বে** শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা। এবং সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে এক সঙ্গে, তারপর আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। আর **কোশল পর্বে** বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মুসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা।

হিমাচল পর্বে গোপাল আবার মামা মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীরে গেছেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ।

শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউস বোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। এক দিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্য দিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে তীর্থযাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাশ্মীর পর্বে এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

কামরূপ পর্বে সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও আহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর পাওয়া যাবে কিছু স্বল্প-পরিচিত অঞ্চলের বিচিত্র অধিবাসীদের আশ্চর্য পরিচয়।

এর পরে **গৌড় পর্বের** যবনিকা উঠেছে নাটকীয় পরিবেশে। মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপাল দার্জিলিঙের হাসপাতালে। দিল্লী থেকে স্বাতি এসছে উড়ো জাহাজে। তারপর দুজনে দেখেছে দার্জিলিঙ কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। হিমালয়ের প্রসঙ্গ অপরূপ বর্ণনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে এসেছে বাঙলাদেশের বিবরণ ; প্রাচীন ও আধুনিক গৌড়ের কথা সম্পূর্ণ হয়েছে মালদহে এসে।

ভাগীরথী পর্বে পশ্চিম বাঙলার কথা। রাজধানী কলকাতা যে কত বিচিত্র নিজের চোখে দুবেলা দেখেও তা জানা যায় না। আর কলকাতাই পশ্চিম বাঙলার সব নয়। বিস্মৃত-প্রায় তাম্রলিপ্ত সপ্তগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর, রাঢ় দেশ ও শান্তিনিকেতন, দীঘা গঙ্গাসাগর ও সুন্দরবন—সব দেখা হতে না হতেই মামা মামি এলেন দিল্লী থেকে। স্বাতি ও গোপাল তখন মন্ত্রোচ্চারণ শুনছে ... ও যদেতৎ হৃদয়ং তব...

এর পরে **হিমালয় পর্ব**। কাশ্মীর ও হিমাচলেই তো হিমালয়ের শেষ নয়, উত্তরাখণ্ড নেপাল সিকিম ও ভুটান ছাড়িয়ে অরুণাচলের শেষ প্রান্তে পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত এই হিমালয় তার বিশাল মহিমায় সুবিস্তৃত। উত্তরাখণ্ড হল হিমালয়ের হৃৎপিণ্ড। শত সহস্র যাত্রীর প্রণামে নন্দিত কেদার-বদরীর পথে এসেছে স্বাতি ও গোপাল।

মরুভারত পর্বে ভারতের বিখ্যাত থর মরুভূমি দেখছে স্বাতি ও গোপাল—বিকানের থেকে যোধপুর জয়সলমের, তারপরে আরব সাগরের তীরে মরুরাজ্য কচ্ছ। উদ্বাস্তু সিন্ধীরা সেখানে নূতন উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। এই পর্বে শুধু মরুবাসী রাজস্থানীর কথা নয়, কচ্ছী ও সিন্ধীদের কথাও জানা যাবে।

ভারতের পূর্ব প্রান্তের পরিচয় পাওয়া যাবে **প্রাচী পর্বে**। এক সময়ের অনাদৃত ও স্বল্প-পরিচিত রাজ্যগুলি দেখবার জন্য স্বাতি ও গোপাল এল আসামের গৌহাটি শহরে। অরুণাচল রাজ্যের সংবাদ আহরণ করে এগিয়ে গেল নাগাল্যাণ্ডে—ডিমাপুর থেকে কোহিমায়। সেখান থেকে মণিপুর রাজ্যের ইম্ফল ও মৈরাঙে, কাছাড়ের শিলচর থেকে মিজোরাম রাজ্যের আইজলে। তারপর ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগর আগরতলা ও উদয়পুরে ত্রিপুরা সুন্দরীর দর্শন করে ঘরে ফেরা। এই সব রমণীয় রাজ্যের শুধু বর্ণনা নয়, রাজ্যবাসীদেরও শিল্প-সংস্কৃতি ইতিহাস ও রাজনৈতিক চেতনার কথা পাওয়া যাবে এই পর্বে।

তারপর **কিষ্কিন্ধ্যা পর্বে** রামায়ণের যুগ শুরু করে বিস্মৃত হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগর ও তুঙ্গভদ্রা বাঁধের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গত হায়দ্রাবাদের গোলকুণ্ডা দুর্গ থেকে

বিদর, বিজাপুর ও গুলবর্গার ইতিহাস, বাদামী পট্টডকল ও আইহোলের গুহামন্দিরের পরিচয় এবং প্রাচীন বিদর্ভের পৌরাণিক কথাও আলোচিত হয়েছে।

অরণ্য পর্বে সমগ্র ভারতের অরণ্য অঞ্চলের কথা আলোচিত হয়েছে দক্ষিণ ভারতের অরণ্য ভ্রমণের পথে। নীলগিরি পাহাড়ের টোডা ও কুর্গের অধিবাসী কোডাভাদের জীবন চিত্র এই পর্বের বিশেষ আকর্ষণ।

তারপর নেপাল পর্ব নয়, নেপাল পর্ব তার আগের ঘটনা। মগধ পর্বের পর যে কথা লেখা হয় নি, সেই কথা বলা হয়েছে নেপাল পর্বেই। ব্যক্তিগত কারণে লেখক এই ভ্রমণের কথা গোপন রেখেছিলেন। এতে আছে আদি কবি বাল্মীকির নায়িকা সীতার জন্মস্থান জনকপুর ও গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী, আছে শৈবতীর্থ পশুপতি নাথ ও বৈষ্ণবতীর্থ মুক্তিনাথ এবং কাঠমাণ্ডু ও পোখরা উপত্যকার দর্শনীয় স্থানের সঙ্গে অপার মহিমান্বিত হিমালয়ের কথা।

এই গ্রন্থমালার সমাপ্তি ভুটান পর্বে। কলকাতা থেকে যাত্রা করে ভুটানের সীমান্ত শহর ফুন্‌ৎশোলিঙে পৌঁছবার আগে হিমালয়ের কোলে নেপাল ও ভুটানের মাঝে ভারতের রাজ্য সিকিমের যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারপর ভুটানের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সমস্ত শহর ও জং-এর কথা বলা হয়েছে। শুধু রাজধানী থিম্ফুর কথা নয়, পারো পুনাখা ওয়াংদিফোড্রং তংসা ও তাশিগঙের কথাও আছে সবিস্তারে। এরই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে ভ্রমণরত স্বাতি ও গোপালের মধুর সম্পর্কের কাহিনী।